স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

শঙ্খ ঘোষ

প্রিয়বরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
কালো মানুষ নীল চোখ
মাকাসিকোর ছায়া মানুষ
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কর্নেল সমগ্র ১ / ২ / ৩
কালো বাক্সের রহস্য
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
কাগজে রক্তের দাগ
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
অলীক মানুষ
জনপদ জনপথ
রহস্য রোমাঞ্চ
স্বপ্নের মতো
বনের আসর
হাট্টিম রহস্য
হাওয়া সাপ
গোপন সত্য
আনন্দমেলা
ভয়-ভুতুড়ে
শ্রেষ্ঠ গল্প
মায়ামৃদঙ্গ
বসন্ত তৃষ্ণা
নিশিলতা
বেদবতী
রূপবতী

প্রসঙ্গত

পাখি আর ঘোড়া থেকেই পক্ষিরাজের কল্পনা। উপন্যাস সেই পক্ষিরাজ। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাখি আর ঘোড়া বিষয়ে কিছু বিশেষ কথা বলার দরকার হতে পারে। এদেশে মুসলিম-সমাজেও একসময় বর্ণ-জাতপাত প্রথা ছিল। এখনও কিছু-কিছু আছে। বিশেষ করে রাঢ় বাংলার অন্তত তিনটি জেলা বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে উচ্চবর্ণের মুসলিমরা 'মিয়াঁ' নামে পরিচিত। ফার্সি 'মিয়ান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ মধ্য। সামাজিক অর্থ মধ্যবিত্ত। 'মিয়ান' শব্দ এদেশে হয়ে গেছে মিয়াঁ বা মিঞা। রাঢ়ে মুসলিম সমাজের এই বিশেষ শ্রেণীর ব্যাপক বিপর্যয়, পতন এবং ছত্রভঙ্গ দশা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও উপন্যাস বা গল্পে উল্লেখ করেছি। সমকালে এই শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান বর্তমান উপন্যাসটির পটভূমি। তবে মূলত এর বিষয় প্রেম। সহৃদয় পাঠক যেন এটিকে নিছক প্রেমের উপন্যাস গণ্য করেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রথম-প্রথম সে অত লক্ষ্য করেনি কেন তার সাইকেল এইখানে এসেই খুব অলস হয়ে যায়। লক্ষ্য করার পর সে একটু বিব্রত বোধ করেছিল। এইখানে রেবেকাদের বাড়ি।

অবশেষে একদিন বিকেলে সে সাইকেল থেকে নেমে ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, সালাম চাচাজি!

কে-এ-এ? মবিন খোন্দকার বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও জোরালো। তাঁর ভেতর এক পুরনো বাঘ আছে, যদিও কালক্রমে নখদন্তহীন আর স্থবির।

আমি সানু, চাচাজি!

তোমাকে আজকাল আর তত দেখতে পাইনে। কোথায় থাক হে তুমি? অ্যাঁ?

আমি রোজ এখান দিয়ে বাড়ি ফিরি। আপনাকে দেখতে পাই।

খোন্দকার অমায়িক অভিমানে বলেন, দেখতে পাও। অথচ কথা বল না। আজকাল সব্বাইকার খুব ডাঁট হয়েছে হে! তোমাকে অন্যরকম ভাবতাম। তা তুমিও—

সাইকেল বারান্দার নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে সানু ঝটপট উঠে যায়। হেঁট হয়ে তিনবার কদমবুসি করে। কখনও মবিন খোন্দকারকে সে কদমবুসি করেছিল কি? তার মনে পড়ে না।

বস। তিনি আঙুল তুলে বলেন, ওই চেয়ারটা নিয়ে এস। নাকি বলবে খুব বিজি? অ্যাঁ?

জি না। সানু দলিজঘরের ভেতর থেকে চেয়ার এনে মুখোমুখি বসে। একটু হাসে। আসলে আপনাকে ডিসটার্ব করার সাহস পাইনে।

খোন্দকারও একটু হাসেন। বাজে কথা! বল, এড়িয়ে চলি।

ছি ছি! এ কী বলছেন আপনি?

তিনি অন্তত এক মিনিট চুপ করে থাকেন। তারপর মুখটা এমনভাবে নামান যে তাঁর সাদা দাড়ি বুকের সঙ্গে সেঁটে যায় এবং চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আস্তে বলেন, আজ রুবিকে দেখতে এসেছিল।

তাঁর ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি ছিল। সানু বলে, তাই বুঝি?

চাষা! চাষা! একেবারে লাঙল ঠেলা চাষা!

জি ?

আদব-কায়দা জানে না। চিলমচি আর পানির জগ হাতে কালো দাঁড়িয়ে রইল। ওরা গেলাসের পানিতে হাত ধুল। ওই দেখ। বারান্দার নিচেটা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, পানিতে কাদা হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছ? ছ'জন লোকের হাত-পা ধোয়া পানি। শুধু একজন চিলমচির দিকে একবার তাকিয়েছিল। সে নাকি এক মৌলবিসাহেব। তবে সে-ও চাষা। খু-উ-ব কোরান-হাদিস আওড়াচ্ছিল। এদিকে কনে দেখতে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কনে দেখা কোরান হাদিসে জায়েজ? মৌলবি লাজবাব।

সানু তাকিয়ে থাকে। কী বলবে খুঁজে পায় না।

খোন্দকার হেসে হেসে বলেন, আবার প্যাণ্ট-শার্ট পরে এসেছে। একজনের পরনে টাই-স্যুট। সে নাকি আবগারি দারোগা। খু-উ-ব ইংলিশ ঝাড়ছিল। তামাশা হে!

ছেলেটা কী করে?

বললে তো বিজনেস-টিজনেস করে। টাউনে বাড়ি করেছে। আবগারি দারোগা তার বড় ভাই।

সে এসেছিল?

হ্যাঁঃ। খোন্দকার হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বলেন। স-ব ওই ফজু মিয়াঁর কাণ্ড। এই নিয়ে তিন-তিন বার আমাকে বেইজ্জত করল। বলে কী, হাওয়া বদলেছে। আমাকে হাওয়া দেখাচ্ছে! হাওয়া বদলায়। খানদানি ইজ্জত বদলায় না।

মামুজি এসেছেন বুঝি?

শুনছ কী তুমি? কতদিন পরে এলে। মবিন খোন্দকার হাঁক ছাড়েন, কালো-ও-ও!

কয়েকবার হাঁক-ডাকের পর দলিজ ঘরের ভেতরে কেউ আসে। বিকেলে ঘরের ভেতর ছায়া ঘন ছিল। সে আস্তে বলেছিল, কালোভাই মাঠে গেছে।

খোন্দকার কোমল কণ্ঠস্বরে বলেন, রুবি? শিগগির এক কাপ চা করে আন। এই দ্যাখ কে এসেছে!

সানু ঘরের ভেতর একবার দৃষ্টিপাত করেই মুখ ঘোরায়। রাস্তার ওপারে দাদাপীরের দরগায় পুরনো কাঠমল্লিকার দিকে তাকায়। বারো মাস ফুল ফোটে এমন এক বিস্ময়কর পুরানো গাছ। এখন শরৎকালে ফুলগুলি সাদা। গ্রীষ্মকালে ফুলগুলি ঈষৎ হলদে হয় এবং তখন অন্য সৌরভ। এতে কিছু অলৌকিকতা থাকা সম্ভব। কেন না সেই সৌরভ কিছু গোপন স্মৃতি টেনে আনে।

রেবেকা দরজায় এসে বলে, ভাল আছেন সার?

সানুকে বলতেই হয়, তুমি ভাল আছ রুবি ? কিন্তু সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। দুবছর আগে সে ওকে পড়াতে আসত। প্রাইভেট টিউটরের চোখ দিয়ে সে তার ছাত্রীকে দেখত। কিংবা হয়ত খুব কাছাকাছি থাকলে একরকম দেখা হয়। দূরত্ব অন্যরকম কিছু দেখিয়ে দেয়। দূরত্ব মনকে নির্ভীক আর দ্বিধাহীন করে।

মামুজি এসেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। রেবেকা মৃদু স্বরে বলে। আপনি আর আসেন না।

খোন্দকার তাড়া দেন। তোর সারকে আগে চা এনে দে। আমার জন্য —থাক। আজকাল আর তত চা খাইনে। বুঝলে সানু ? তুমি তো দেখেছ, জীবনে আমার দুটি মাত্র নেশা ছিল। চা আর সিগারেট। শেষে হাঁপের টান ধরল। তোরাব ডাক্তারকে তো জান ? কথায় কথায় মুখ খিস্তি করে। রেবেকা চলে গেছে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলেন, ক্লাস এইটে সিগারেট ধরিয়েছিল ওই তোরাব। এখন একাত্তরে পড়েছি। ঊনষাট বছর কেটে গেল। তোরাব বলে, কত লোক বুড়ো বয়সে বউকে তালাক দেয়। বলবে ক্রুয়েলটি। ঠিক আছে। জীবনে কখনও কখনও ক্রুয়েল হতে হয়। আমি তোমাকে সিগারেট ধরিয়েছিলাম বলছ। এখন আমিই বলছি সিগারেটকে তালাক দাও। ক্রুয়েল হও। তোরাব বলে কী জান ? ক্রুয়েলটি ইজ দি এসেন্স অব হিউম্যান লাইফ।

বাঁধানো সরু সরু দাঁত থেকে মবিন খোন্দকারের হাসি ছিটকে পড়ে। তারপর কাশতে থাকেন। সানু বলে, কোনও বড় ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল চাচাজি !

না হে ! তত কিছু নয়। কাল সন্ধ্যায় ঘাটবাজার থেকে আসার পথে হঠাৎ বৃষ্টি। ছাতা নিয়ে বেরোইনি। ভোরবেলা দেখি গা ব্যথা করছে। মসজিদে গেলাম না। এদিকে রুবিকে দেখতে আসবে। বাড়িতে সাজ-সাজ রব।

সানু আনমনে বলে, কী বলে গেলেন ওঁরা ?

খোন্দকার মুখ খোলার সময় রেবেকা এসে যায়। আব্বু, আম্মি সারকে ডাকছেন।

ও সানু ! যাও, যাও। ডিমের হালুয়া খেয়ে এস। খোন্দকার হাত বাড়িয়ে নকশাদার ছড়িটি গ্রহণ করেন। কেন না ঠিক সেই সময় মসজিদের মাইক গর্জন করে উঠেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে মবিন খোন্দকার বলেন, চলে যেও না। আসরের নামাজ সেরে আসি। কথা আছে। রুবি, চেয়ারদুটো ভেতরে ভরে দে। দরজা বন্ধ করতে ভুলিস নে যেন। আজকাল একটা এনামেলের বদনা বাইরে ফেলে রাখার জো নেই। কী অবস্থা ! ও সানু ! তোমার

সাইকেল !

জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এই পুরনো জীর্ণ বাড়ির ভেতর টিউশনি করতে ঢোকার সময় সানু একবার কাশত। এই কাশি একটা প্রথা। মেয়েরা কখন কী অবস্থায় থাকে। অবশ্য এ বাড়িতে দু'বছর আগে মেয়ের সংখ্যা ছিল তিন। রেবেকা, তার বড় বোন আফসানা আর তাদের মা রোকেয়া বেগম। পরে আফসানার বিয়ে হয় এবং তখনও সানু রেবেকার প্রাইভেট টিউটর। আফসানা টেনেটুনে বি. এ পাস করেছিল। এক শ্যামবর্ণ বেঁটে-খাটো গুঁফো সাব-রেজিস্ট্রার সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণা রূপসীকে তুলে নিয়ে যান। রোকেয়ার জামাই পছন্দ হয়নি। সানুর কাছে গোপনে দুঃখ করে বলতেন, ছবির আব্বা খানদান দেখলেন বাবা ! আমি কী বলব বল ? খালি খানদান আর খানদান। ভাইজান ভাল একটা ছেলে দেখেছিলেন। রেলে চাকরি করে। কিন্তু ওই খানদান ! শেখ শুনেই মিয়াঁ ভাইজানকে অপমানের চূড়ান্ত করেছিল। ভাইজানের মন দরিয়া, বাবা সানু ! পানিতে কোনও দাগ পড়ে না। তাই আসেন এখনও।

প্রথা অনুসারে সানু একটু কাশে। তারপর রেবেকার দিকে তাকায়। রেবেকা ভেতরের বারান্দা থেকে হালকা পায়ে নেমে উঠোনে হাঁটছিল। পরনে নীলচে শাড়ি, লম্বা-হাতা লাল ব্লাউজ। উঠোনের মাঝামাঝি গিয়ে তার খোঁপা খসে খসে যায় এবং তখনই সে পেছনে দু'হাত ঘুরিয়ে একটা সুন্দর পতনকে বাধা দেয়। সানু একটু অবাক হয়ে ভাবে, এই মেয়েটি তার ছাত্রী ছিল ! প্রায় দু'বছর পরে শরৎকালের বিকেল বেলায় ঘটনাটি তার বিস্ময়কর আর অবিশ্বাস্য মনে হয়। কেন মনে হয়, তা সে বুঝতে পারে না।

উঠোনের উলটোদিকে একতলা লম্বা ঘরের মাঝামাঝি বারান্দার একটা অর্ধবৃত্তাকার অংশ খোলা আকাশের তলায় বেরিয়ে এসেছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপর ওই অংশটার দু'ধারে দুটো বাঁকা লাল সিমেন্টের বেঞ্চ। পেছনে হেলান দিয়ে বসা যায়। মধ্যিখানে রোকেয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন। রেবেকা তাঁর পাশ কাটিয়ে উধাও হয়ে যায়। রোকেয়া ডাকেন, কে গো ? ও ! সানু ? এস।

সানু গিয়ে পায়ে তিনবার কদমবুসি করে। রোকেয়ার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে তার ওপর। বেঁচে থাক বাবা ! সুখে থাক। খোদা তোমার হায়াত দরাজ করুন।

সানু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ভাল আছেন চাচিজি ?

আমার আর ভাল-মন্দ বাবা ! দেখতেই পাচ্ছ কেমন আছি। ও মাসে চোখ অপারেশন করালাম। কী করে অপারেশন করল ! একটা চোখে এখনও নজর এল না। এখনও রুবি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনে। রোকেয়া ঘোরেন। এখানে এখনও রোদ। বারান্দায় চল।

পশ্চিম দিকের বিশাল শিরীষ গাছটা নেই দেখে সানু বলে, গাছটা ?

কেন ? ছবির বিয়ের সময় কাটা গেল না ? রোকেয়া আস্তে বলেন। ভাইজান বারণ করেছিলেন। মিয়াঁর জেদ। মেয়ের বিয়েতে খানা দেবে। পাঁচ-সাতশো লোক খাবে।

সানু হাসে। কাঠগোলায় জ্বালানি কাঠের অর্ডার দিলেই তো—

চওড়া বারান্দায় নতুন একটা ডাইনিং টেবিল আর চারটে চেয়ার। একটা চেয়ার টেনে বসে রোকেয়া বলেন, না। সেটা কথা নয়। আকবর হাজিকে চেন ? শেখপাড়ার আকবর গো ! তোমার চাচাজির কানে কবে থেকে ফুসমন্তর দিত জানি না বাবা ! তিন হাজার টাকা দাম দিতে চেয়েছিল। আমরা তিন মা-মেয়ে মিলে এক পার্টি, তোমার চাচাজি আরেক পার্টি। শেষে ছবির বিয়ের সময় রফা হল। গুঁড়িখানা আকবর দরাদরি করে এক হাজারে নিয়ে গেল। বাকি কাঠ—ওই দেখ, জ্বালানিঘরে এখনও মজুত। অত বড় একটা গাছ ! আমার শ্বশুরসাহেবের আব্বার হাতের গাছ !

গাছটা খুব সুন্দর ছিল।

ছিল। বাড়ির আবরু। পাঁচিল তুললেই কি আবরু হয় ? তুমি বল ?

ভীষণ ফাঁকা লাগছে, চাচিজি !

হুঁ। আগের মত নজর থাকলে তাকাতে কষ্ট হত। ও রুবি !

এই ঘরের শেষদিকে লাগোয়া টালির চালে ঢাকা রান্নাঘর থেকে রেবেকা দূরের কণ্ঠস্বরে সাড়া দেয়, চা করছি।

নাশতাগুলিন গরম করে প্লেটে সাজিয়ে আনবি যেন। কতদিন পরে তোর সার এল।

সানু একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, চাচাজি বলছিলেন রুবিকে আজ দেখতে এসেছিল ?

রোকেয়া দু'হাত নেড়ে বলে ওঠেন, ওসব আমি কিচ্ছু জানিনে বাবা। ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আর ভাইজানেরও লজ্জাসরম নেই। বারে বারে অপমান হতে আসেন।

মামুজি কোথায় গেছেন ?

কোথায় আর যাবেন ? তোরাব ডাক্তারের ডিস্পেনসারিতে, নয় তো গঙ্গার ধারে বসে আছেন।

রুবি পড়াশুনো বন্ধ করল কেন ?

রোকেয়া টেবিলে দুই কনুই রেখে একটু ঝুঁকে এলেন। সেই কথাটা বলার জন্যে তোমাকে ডাকা। জোহরের নামাজের পর থেকে মন খারাপ। অনর্থক একটা অশান্তি হল। ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ রুবি এসে বলল, সার এসেছে। অমনই—ও সামিরুন ! দ্যাখ, দ্যাখ ! কুকুর ঢুকেছে। সামিরুন !

অ্যাই হারামজাদি !

উঠোনে টিউবওয়েলের পাশে একটা শিউলি গাছ। তারপর পাঁচিল ঘেঁষে সারবন্দি জবা, গন্ধরাজ, হাসনুহেনার ঝাঁপালো শ্যামলতা। শেষদিকটায় বাঁকাচোরা একটা পেয়ারা গাছ। সানু দেখতে পায়, ফ্রকপরা এক বালিকা পেয়ারা গাছ থেকে সদ্য নেমে চুপিচুপি টিউবওয়েলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। সে চেরা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, ছেই ! ছেই ! ছেই !

কুকুরটা এই বারান্দার নিচে কিছু একটা শুঁকছিল। তাড়া খেয়ে সদর দরজার দিকে ছুটে যায়। তারপর ঘুরে আসে। আবার তাড়া খেয়ে খিড়কির দিকে ছুটে যায়। রোকেয়া তর্জন-গর্জন করেন। এই হারামজাদি মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এত করে বলা আছে, একটু নজর রাখবি। কাল দুপুরে চিলে ছোঁ মেরে একটা মুরগির বাচ্চা নিয়ে গেল। সেদিন কাজিদের বিল্লি এসে এক গেলাস দুধ বরবাদ করল। আসে কী করে ?

সামিরুন ফিরে এসে হাসতে হাসতে বলে, মাজি ! একেবারে গঙ্গা পার করে দিয়ে এলাম !

আবার হাসি হচ্ছে ? মুখ ভেঙে দেব। আসে কোন্ পথে ?

খিড়কির দুয়োর খোলা ছিল না ?

তেজ দেখছ ? কে খুলল ? খুলল কে ? বল্ কে খুলল ?

রেবেকা ট্রে হাতে আসতে আসতে বলে, আহ্ ! কী হুলস্থুল বাধাতে পারেন আম্মি ! একটু চুপ করুন তো ! এক্ষুনি আবার প্রেসার বেড়ে— সে থেমে যায়। টেবিলে ট্রে রেখে একটু হাসে। আচ্ছা আম্মি ! বাড়িতে কুকুর দেখলে আপনি রেগে যান কেন ? কলকাতায় খালা-আম্মির ফ্ল্যাটে দু-দুটো প্রকাণ্ড কুকুর। সার ! আপনি আম্মিকে জিজ্ঞেস করুন তো ?

সানু নিমেষে বুঝতে পারে, দু'বছর আগে যে-রেবেকাকে সে এ বাড়িতে দেখে গিয়েছিল, এই মেয়েটি সে নয়। একবার তাকে দেখে নিয়েই সে রোকেয়ার দিকে তাকায়। রোকেয়া একই কণ্ঠস্বরে বলেন, বাপ-বেটির শখ হয়েছে তো সেই কুকুর পোষো। মুরোদ দেখি ! মুখে তো খালি লম্বা-চওড়া কথা।

আম্মি ! আপনি বলেন চোখের অপারেশন ঠিক হয়নি। কিন্তু কুকুর, বেড়াল—আর চিলও বেশ দেখতে পান। রেবেকা দু-পা এগিয়ে পিছন থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। সানুর দিকে একবার দ্রুত তাকিয়ে নিয়ে ফের বলে, সারকে চা-নাশতা খেতে ডেকে এনে এ রকম করলে সার কী ভাববেন বলুন তো ?

তোর সার আমার পেটের ছেলের মত। সানু ! তুমি খাও বাবা। কান কোরো না !

সানু তিনটে প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলে, এত সব কী?

ওই তো একটুখানি করে সেমাই, ফিরনি আর ডিমের হালুয়া। খাও বাবা! দেখে জানটা ভরুক। রুবি! সে হারামজাদি কোথায় দ্যাখ তো মা!

রেবেকা চোখে হেসে বলে, ওই দেখ। থামে হেলান দিয়ে কাঁদছে।

সামিরুন চেরা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, কাঁদিনি মাজি! ছোট বুবু মিথ্যে বলছে!

রোকেয়া তিনটে প্লেট তুলে সানুর সামনে রাখেন। সানু বলে, না না চাচিজি! আমি অত কিছু খেতে পারিনে! আপনার খাতিরে এক চামচ করে মুখে দিচ্ছি। তবে চা-টা পুরো খাব। আমি জানি, চাচাজি খুব দামি চা খান।

রেবেকা বলে, এতদিন পরে গোপন কথাটা ফাঁস করা যায়। কী বলেন আম্মি? সার যতদিন আমাকে পড়াতে আসতেন, দু নম্বর চা দেওয়া হত। আজ খাবেন এক নম্বর চা। ওরিজিন্যাল।

শোন কথা! এতক্ষণে রোকেয়া বেগম হাসতে পারেন। তোমার ছাত্রীর কেমন মুখ ফুটে গেছে দেখছ তো সানু?

দেখছি।

এবার ওকেই জিজ্ঞেস কর পড়াশুনো কেন ছেড়ে দিল।

রেবেকা একটু সরে যায়। সামিরুন! রোদ পড়ে গেছে রে! কুলোটা নিয়ে আয়। দেখি শিউলির বোঁটাগুলো শুকিয়েছে নাকি। শুকোলে শিলে গুঁড়ো করে দিবি।

সামিরুন ছোট্ট মই বেয়ে রান্নাঘরের চালে উঠে কুলোটা নামিয়ে আনে। বারান্দার সামনের অর্ধবৃত্তাকার চত্বরের বেঞ্চিতে রাখে। রেবেকা সেখানে গিয়ে শিউলির বোঁটাগুলি পরীক্ষা করতে থাকে। রোকেয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলেন, দেখছ বাবা সানু?

সানু চায়ে চুমুক দিয়ে একটু হাসে। বলে, পোলাও-বিরিয়ানির জাফরান হবে।

আমার তাজ্জব লাগে বাবা! আমরাও ছোটবেলায় শিউলির বোঁটা ছাড়িয়ে শুকোতে দিতাম। কিন্তু বয়স থেমে থাকে না। বয়স, না নদীর স্রোত বলো?

সানু লক্ষ্য করে, রেবেকা শিউলির বোঁটাগুলিকে চিরে দিচ্ছে একটা একটা করে। উঠোনের দিকে ঘুরে বসে আছে সে। খোঁপাটা আবার খসে পড়ার জন্য কাঁপছে। তার ডান কানের ছোট্ট সোনার রিং দিনশেষের বাকি আলোটুকু শুষে নিচ্ছে।

রোকেয়া কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, সেই সময় সদর দরজার

সামনে বাঁকা একটুকরো লেজের মত পাঁচিল, যা বাড়ির ভেতরটা আবরুতে রাখে, সেই খানদানি প্রতীকের নেপথ্য থেকে মবিন খোন্দকারের সাড়া এল। প্রথমে কাশি। তারপর কথা। গফুরের ছেলে পালিয়ে যায়নি তো?

সানু বলে, পালায়নি চাচাজি! সে আপনার ওরিজিন্যাল চা খাচ্ছে।

খোন্দকার হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন। চত্বরের সামনে এসে মাথার টুপি খুলে পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকান। ছড়িতে ভর দিয়ে ধাপে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়ান। দুই বিল্লিতে কী খেলছিস রে? অ্যাঁ?

রেবেকা চুপ। সামিরুন বলে, জাফরান হবে বাবাজি! এখনও শুকোয়নি।

খোন্দকার তাদের পাশ কাটিয়ে বারান্দায় ওঠেন। একটা চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে বলেন, আক্কেল দেখেছ? ফ্যান বন্ধ করে বসে আছ। যা ভ্যাপসা গরম পড়েছে। গাছপালার পাতা নড়ে না।

তিনি দেওয়ালের সুইচবোর্ডে ফ্যানের সুইচ টিপে দেন। তারপর বসেন। একটু দেরি হয়ে গেল সানু! নামাজ বাদেই খামোকা তকরার! জানিস না, বুঝিস না! একপুরুষে লেখাপড়া শিখেছিস হারামজাদা! তোর বাবা ছেঁড়া গামছা পরে মুনিষ খাটতে যেত। আর তুই আমাকে—

রোকেয়া বলেন, মসজিদে তুমি যাও কেন? যাবে আর যার-তার সঙ্গে তকরার করে মেজাজ চড়িয়ে বাড়ি ফিরবে। ভাগ্যিস আজ সানু ছিল।

যাব না? মসজিদ কি কারও বাপের ঘর? খোদার ঘর।

রেবেকা হেসে ওঠে। আব্বু! খোদা কি ঘরে থাকেন? খোদা তো নিরাকার।

ওটা কথার কথা। মসজিদ নামাজ পড়ার ঘর। আর নামাজ সবখানে পড়া যায়।

রোকেয়া মেয়ের কথার তালে তাল মেলান। সেই তো বলছি!

বলছ। কিন্তু, জুম্মা, ইদ-বকরিদ? খোন্দকার প্রশ্নটা তুলেই রেবেকার দিকে ঘোরেন। ও রুবি! এবারে এক কাপ চা দে মা! গলা শুকিয়ে গেছে!

রেবেকা চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তারপর রোকেয়া মৃদুস্বরে বলেন, সানু জিজ্ঞেস করছিল, রুবি পড়াশুনো বন্ধ করল কেন? আমি বললাম রুবিই বলুক! অমনই রুবি শিউলির বোঁটা নিয়ে বসল।

হুঁ। সানু জিজ্ঞেস করতেই পারে। তারই হাতে গড়া মেয়ে। খোন্দকার আঙুলের গিরে গুনে বলেন, এইট, নাইন, টেন। এই হল গে তিন বছর। স্কুল ফাইনালে ছবি ধাক্কা খেয়েছিল। রুবি একেবারে ফার্স্ট ডিভিশন।

সানুর ক্রেডিট। তারপর সম্ভবত ভুলটা আমারই হয়েছিল। রং ডিসিশন। পরে পস্তে আর কী করব? আসলে আমি ভেবেছিলাম, ফার্স্ট ডিভিশনের জোরে টুয়েলভ পেরিয়ে যাবে। কলেজে ভর্তি করে দিয়ে আসব। ছবি ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করত। রুবিও করবে। তো খোদার মনে কী থাকে!

সানু বলে, ইলেভনে তো খারাপ করেনি। জয়ন্তীদির কাছে শুনেছি। তারপর কী হল?

মবিন খোন্দকার শ্বাস ছেড়ে বলেন, তোমাকে পেছনে লাগিয়ে রাখলে— হ্যাঁ। বললাম, রং ডিসিশন। টুয়েলভে—গতবছর পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলল, রুবি রোজ স্কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন হেডমিস্ট্রেসের চিঠি এসে হাজির। রুবি কেন স্কুলে যাচ্ছে না ইত্যাদি-প্রভৃতি।

সে কী!

খোন্দকার ফিসফিস করে বলেন, কালোকে পেছনে লাগালাম। দ্যাখ তো রুবি কোথায় যায়। কালো ওকে ফলো করে এসে বলল কী জানো? রেলের একটা কোয়ার্টারে ঢুকে গেল রুবি। মেয়ে বড় হয়েছে। গায়ে হাত তুলি কী করে? দুটি মাত্র মেয়ে। একটা ছেলে ছিল। অসময়ে খোদা তাকে তুলে নিলেন।

তারপর?

পরে খবর নিয়ে জানলাম ফজু মিয়ার চক্কর!

মামুজি রেলের অফিসার ছিলেন শুনেছি।

হ্যাঁঃ। স্টেশনমাস্টার তার চেনা লোক। রুবিকে কবে ফজু নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। ব্যাস। খোন্দকার কিছুক্ষণ খকখক করে কাশেন। তারপর বলেন, কিন্তু সেটা কথা নয়। কথাটা হল, রুবি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করল কেন? আইনত সাবালিকা। আমারা দু'জনে সাধাসাধি করে হাল ছেড়ে দিলাম।

রুবি কী বলল?

রোকেয়া বিষণ্ণ মুখে বললেন, শুধু একটা কথা বেরিয়েছিল মুখ থেকে। পড়াশুনো ভাল লাগে না।

খোন্দকার বলেন, আর সেই কথাটা সানুকে বল।

হুঁ। এক রাত্তিরে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে বলল, তোমরা যদি জোর কর আমি বিষ খাব।

সানু একটু চুপ করে থাকার পর বলে, স্কুলে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। সেখানে এমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে থাকবে—তা না হলে রুবির পড়াশুনোর ব্রেন তো শার্প ছিল। নিশ্চয় কিছু ঘটেছিল।

খোঁজখবর কি নিইনি ভাবছ? ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুটন্ধু—সবার কাছে।

কেউ কিছু জানে না। জানলে অন্তত একটা ইশারা তো পেতাম।

আশ্চর্য !

খোন্দকারের দাড়ি বুকে চেপে বসে। তিনি চশমার ওপর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাকে বললে বলতেও পারে। তোমার হাতে গড়া পুতুল সানু ! নাচলে তোমার হাতেই নাচবে।

সানু গম্ভীর মুখে বলে, রুবি একেবারে বদলে গেছে চাচাজি ! তা ছাড়া যদি কিছু ঘটেই থাকে, এতদিন পরে তা জেনে আর কী লাভ ? অবশ্যি সে যদি পড়াশুনো আবার চালিয়ে যেতে চায়, আলাদা কথা। ধরুন,—

সে থেমে যায়। রেবেকা চায়ের কাপ প্লেট আনছিল। টেবিলে রেখে সে বলে, আপনি যে গন্ধরাজের চারাটা এনে দিয়েছিলেন, ওই দেখুন সার ! কত্তো বড় হয়ে উঠেছে। আচ্ছা সার ! আমাকে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে দেবেন ?

তুমি বসো।

রেবেকা বসে না। থামে হেলান দিয়ে বলে, মামুজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম হিন্দুদের মধ্যে যাদের নিচুজাত বলা হয়, তাদের বাড়িতেও ফুলের গাছ থাকে। কিন্তু মুসলিমদের বাড়িতে—আজকাল অবশ্যি ফ্যাশান হয়েছে, অনেকে ফুলের টব রাখে দেখেছি—সে আর ক'জন ? মামুজি বললেন কী জানেন স্যার ? হিন্দুদের পুজোয় ফুল লাগে। তাই ফুলগাছ লাগানো ওদের নাকি ধর্মকর্ম।

তুমি গোলাপের কথা ভুলে যাচ্ছ রুবি। ফুলের রানী গোলাপ। গোলাপের একটা হিস্টোরিক্যাল—

সে তো বাদশা-টাদশাদের ব্যাপার। আমি একেবারে নিচের দিকের কথা বলছি।

রোকেয়া উঠে দাঁড়ান। ও সামিরুন ! আলোগুলিন জেবলে দে ! নামাজের অক্ত হল। আমাকে এক বদনা পানি দিয়ে যা। ওজু করব।

খোন্দকার ঘড়ি দেখে বলেন, এখনও বিশমিনিট দেরি আছে। আজান দিক !

তুমি আর মসজিদে যেও না।

খোন্দকার খুব হাসেন। একবেলা নামাজ কাজা করলেই বা কী ? পরে পুষিয়ে দেব। কতদিন পরে সানুকে বাগে পেয়েছি। কী হে ? তুমি এখনও খোদার রাস্তা ধরোনি ?

জি ?—

না। আমি তত মুসল্লি নই হে। তোমার বয়সে আমি ছিলাম বুনো ঘোড়া। আমার আব্বা তো আরও এককাঠি সরেস ছিলেন। রোজ দাড়ি-

গোঁফ চাঁছতেন। আর সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরেই—সে এক দিনকাল ছিল। দলিজঘরের বারান্দায় বসে আছেন। যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, সে কপালে হাত তুলে সালাম করে যাচ্ছে। খোন্দকার তারিয়ে তারিয়ে চা খান এবং বলেন, দের‍ু বলে একটা লোক ছিল। সে একদিন সালাম না করেই চলে গেল। আব্বা বললেন, কে গেল রে ওটা? না—দের‍ু। কী? শেখের ব্যাটার এত স্পর্ধা? ধরে নিয়ে আয় তো!

চাচাজি! এ তো হিন্দু কাস্ট সিস্টেমের মত! উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণ।

একজ্যাক্টলি। মিয়াঁ আর শেখ। ভদ্রলোক আর ছোটলোক। আশরাফ আর আতরাফ্।

কিন্তু এমনটা শুধু রাঢ় অঞ্চল ছাড়া কোথাও ছিল বলে জানি না।

হ্যাঁ। তুমি ঠিকই জেনেছ। তবে দেখ, হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান হয় না। বলবে, ইসলাম বলেছে, খোদার চোখে সব মানুষ সমান। খোদার চোখ আর মানুষের চোখ এক হল? ইকোয়ালিটিটা নামাজ পড়ার সময় ঠিক আছে। তারপর? ধানের আমন-আউস-বোরো আছে। সব আমগাছের আম কি একরকম টেস্ট? কোনওটা খাট্টা, কোনওটা মিঠে। কোনওটাতে আঁশ আছে, কোনওটাতে নেই।

সদর দরজার দিক থেকে কেউ বলে ওঠে, লজিকে ভুল হচ্ছে দুলাভাই।

মবিন খোন্দকার নড়ে বসেন। ওই এসে গেছে খানবাহাদুরের পোতা। রুবি, আর একটু কষ্ট কর মা! মেজাজ খারাপ করিয়ে তবে ছাড়বে।

ফয়েজুদ্দিন চত্বরের নিচে পেঁছে ভুরুর ওপর হাত রেখে বারান্দার মাথায় জ্বালানো জোরালো আলোর ছ'টা আড়াল করেন। বেলা না যেতেই এখনই আলোর ঘটা! ওটা সানু না?

জি মামুজি!

ফয়েজুদ্দিনের দেহটি লম্বা-চওড়া। মুখে মোগলাই গোঁফ। একমাথা ঝাঁকড়মাকড় কাঁচা-পাকা চুল। পরনে ঢিলে প্যান্ট-শার্ট। তিনি চত্বরে উঠলে সানু কদমবুসি করতে আসে। ফয়েজুদ্দিন তার দুই কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে বলেন, দাঁড়া! তোকে একটু দেখি। তারপর তার চিবুকে আঙুল ঠেকান। লে হালুয়া! তুই যা ছিলিস, তা-ই আছিস বাপ! মিরাক্‌ল! যাকগে মরুক গে! এখানেই বসা যাক। তোর মনে পড়ে রে? এইখানে বসে কত রাত অব্দি আমরা আড্ডা দিতাম! ছবি, রুবি, তুই, বোঁচার মা! আর কালো সিঁড়িতে বসে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়ত। ওঃ! মনে পড়লে বুকটা কেমন করে ওঠে!

এতক্ষণে মসজিদের মাইকে আজান শোনা যায়। রোকেয়া বারান্দার কোনায় ওজু করছিলেন। ওজু শেষ করে ঘরে ঢোকার সময় বলে যান, নিওর

পড়বে ভাইজান ! ঠাণ্ডা লাগবে।

সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কী ভয় তার ? বস্ সানু !

খোন্দকার শ্যালককে ডাকেন, ও ফজু ! এখানে এসো। অলরেডি চা বলে দিয়েছি রুবিকে।

সানুও বলে, বারান্দায় চলুন মামুজি !

ফয়েজুদ্দিন অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে বারন্দায় গিয়ে বসেন। বলেন, কাঁটালিয়াঘাটে মিটার-ফিটারের রেওয়াজ নেই। সারাদিন আলো জ্বালিয়ে রাখ না কেন, গড়পড়তা বিল আসবে। রুবি বলছিল, মাসে আঠার টাকা পড়ে। দুলাভাইয়ের বাড়িতে কতগুলো কত ওয়াটের বালব আছে হিসেব করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। উরেব্বাস ! আজ দুপুরবেলা দেখছি— যাক্ গে মরুক গে ! দুলাভাই মসজিদে গেলেন না যে ?

তুমি আমার লজিকে ভুল ধরছিলে। আগে সেই কথাটা হোক।

সানুকে পেয়েছি। মুড নষ্ট করতে চাইনে। মাত্র দুটো সেন্টেন্স বলছি। মানুষ হচ্ছে মানুষ এবং মানুষ ধানগাছ বা আঙুল বা আমগাছ নয়। ফয়েজুদ্দিন সানুর কাঁধে হাত রাখেন। তুই শেষ অব্দি সারই থেকে গেলি বাপ ?

আর কী করব ?

হ্যাঁ রে ! রোজ সাইকেলে চেপে পনেরো-পনেরো তিরিশ কিলোমিটার ? এখানকার স্কুলে তোকে নিলে না ? ডোনেশনের টাকা চাইছিল নাকি রে ?

টাকা ছাড়া আর টিচার হওয়া যায় না মামুজি !

ওখানে কত দিতে হয়েছে ?

তিরিশ হাজার। এখানে চাইছিল ষাট।

জমি বেচতে হল ?

সানু হাসবার চেষ্টা করে। মবিন খোন্দকার বলেন, আব্দুল গফুর কি জমি রেখে গিয়েছিল যে বেচবে ? সানুকে বিয়ে করতে হল।

ফয়েজুদ্দিন সানুর কাঁধ থেকে হাত তুলে নেন। আস্তে বলেন, বিয়েতে তুই পণ নিয়েছিস ?

বিশ্বাস করুন মামুজি ! আমি একটা পয়সা হাতে ছুঁইনি। চোখেও দেখিনি। কুতুবপুর স্কুলে তিরিশ হাজার ডোনেশন চেয়েছিল। আমার তখন সাংঘাতিক অবস্থা। শ্বশুরসাহেব কুতুবপুরের মানুষ। তাঁকে বলেছিলাম, চাকরি-বাকরি নেই। বিয়ে করে কী খাওয়াব আপনার মেয়েকে ? তারপর—

বুঝেছি। তা তোর বউয়ের এডুকেশন ? অন্যভাবে নিসনে বাপ ! জানতে ইচ্ছে করছে।

স্কুল ফাইনাল। প্রাইভেটে হায়ার এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখা যাক!

কাল দেখে আসব। কী নাম রে?

রেজিনা।

বাহ্। ভাল। খুব ভাল। দুলাভাই! আপনি আবার সিগারেট খাচ্ছেন?

খোন্দকারের কাশি এসে যায়। কাশি থামলে বলেন, তুমিই কাশিয়ে ছাড়লে। তোমাকে বলেছিলাম সিগারেট সম্পর্কে কোনও কথা বলবে না!

সহসা এই সময় সানুর চিন্তা আসে, রেবেকা চা আনতে যেন বড্ডবেশি দেরি করছে, কিংবা তার নিজের উইশফুল থিংকিং। নাকি দু-বছরের দূরত্ব থেকে ভেসে আসা রেবেকার ছেঁড়াখোঁড়া রঙবেরঙের কাগজকুচির মত এলোমেলো কিছু স্মৃতি তাকে নিয়ে এক ধরনের একটা খেলা খেলছে?

রেবেকার মুখে একটা স্বর্ণচাঁপা প্রার্থনার কি অন্য কোনও মানে করা যায়? দু-বছর পরে এই দিন-শেষের ধূসরতা প্রার্থনাটিকে কিছু অতিরিক্ত তাৎপর্য দিয়েছিল। সানুর এইসব চিন্তা আসে।

ফয়েজুদ্দিন তাঁর ভগ্নিপতির সঙ্গে রসিকতা করছিলেন। রেবেকা চা আনলে বলেন, দুলাভাই আর বেবির চক্রান্ত টের পাসনে রুবি?

কী চক্রান্ত মামুজি?

ধর, তুই যদি ছেলে হতিস, এতক্ষণ খেলার মাঠে নয় তো তরুণ সংঘে বসে মস্তানি করতিস। তুই মেয়ে। কাজেই তোকে চা করতে হবে! রান্নাবান্না ঘর গুছনো—

খোন্দকার বুঝতে পেরে থামিয়ে দেন। চক্রান্ত আমাদের না তোমার হে ফজুমিয়াঁ? তুমিই তো বারবার গরুখোঁজা করে কোত্থেকে সব উটকো লোক খুঁজে নিয়ে হাজির হচ্ছ। আমি কি কখনও তোমাকে বলেছি রুবির জন্য একটা ছেলে দেখে দাও?

রেবেকা দ্রুত সরে যায়। সানু তাকে লক্ষ্য করে। রেবেকা যে ঘরে গিয়ে ঢোকে, সেই ঘরে তাকে সানু পড়াত। রেবেকার ঘরটা কি তেমনই আছে? দেখতে ইচ্ছে করে!

টিভি-র শব্দ ভেসে আসে সেই ঘর থেকে। ফয়েজুদ্দিন একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। সামলে নিয়ে বলেন, আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারেননি দুলাভাই! আমি একটা রিয়্যালিটির প্রশ্ন তুলেছিলাম। আমার ছোট ফুফুজি স্কুল সাব-ইনস্পেক্ট্রেস ছিলেন থারটিজে! চিন্তা করুন! বড় ফুফুজি তো বিয়েই করেননি। নাইনটিন ফর্টি টু-তে ডিভিশনাল কমিশনার হলেন। ঘোড়ায় চেপে ট্যুরে যেতেন। আমার বয়স তখন সতের। ম্যাট্রিক পাস করেছি।

হ্যাত্তেরি! খালি বাকতাল্লা। তোমার কথাটা কী হে?

একটা হাওয়া উঠেছিল। ফর্টিসেভেনের পর হওয়া পুবে সরে গেল।

ফয়েজুদ্দিন হেসে ওঠেন। আপনি রাঢ়ের খান্দানির কথা বলেন। খান্দানি মড়মড় করে ভেঙেচুরে গেল। ছুটকো-ছাটকা সব খান্দান যারা মাটি কামড়ে পড়ে রইল, তাদের কী অবস্থা! এই কাঁটালিয়াঘাটের কথা চিন্তা করুন। ওলু মিয়াঁর পোতারা কেউ রিকশ চালায়, দর্জিগিরি করে। ফতেমিয়াঁর বাড়ির মেয়েরা বিড়ি বাঁধে। দুলাভাই! আপনি উঠতে-বসতে চাষা চাষা করেন। সেইসব চাষার ঘরে মিয়াঁরা মেয়ে দিতে পারলে বর্তে যায়। না-না। আমাকে কথাটা শেষ করতে দিন।

শেষ করা গেল না। কালো এসে যায়। প্রথামত সে একটু কেশেছিল। চত্বরের নিচে এসে বলে, মিয়াঁজি! কুলবেড়ের দেড়বিঘেয় পানি যেতে শেষরাত্তির হবে। হারামি ছৈরদ্দি পানি ঘুরিয়ে দিলে। আগে তারটা, তারপরে অন্য কেউ।

মবিন খোন্দকার গর্জন করতে গিয়ে কেশে ফেলেন। কাশি থামার পর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলেন, তুই রিভারলিফটিংয়ের মানুবাবুর কাছে গেলিনে কেন?

গিয়েছিলাম তো। মানুবাবু বললেন, ছৈরদ্দিকে কিছু বলা যাবে না। ওপর থেকে নাকি অডার আছে। কালো ক্লান্তভাবে ডাকে, অ সামিরুন! বিবিজিকে বলদিকিনি সকাল-সকাল দু-মুঠো খেয়ে হত্যে দিই গে। আমার টচবাত্তির ব্যাটারি নেই মিয়াঁজি! মাঠঘাট জায়গা।

এতক্ষণে সানু টের পায় হাসনুহেনার ঝাঁঝালো সুগন্ধ তাকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে। এই সময়ে কুলবেড়ের জমি রিভারলিফটিংয়ের মানুবাবু ছৈরদ্দি টর্চের ব্যাটারি—এইসব বিষয় তুচ্ছ হয়ে যায়। সে আস্তে ডাকে, মামুজি!

ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। খোন্দকার ঘরে ঢুকেছেন। কালো উঠোন দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে। ফ্রকপরা সামিরুনের ছায়াটা নাচতে নাচতে মিলিয়ে গেল। ফয়েজুদ্দিন আনমনে বললেন, উঁ?

অসাধারণ গন্ধ!

হুঁ। হাসনুহেনার গন্ধ। যার যা কাজ! এ কি কোনও নতুন কথা হল? নতুন কথা থাকলে বল্। শুনি।

সানু একটু পরে বলে, আপনার ভাগনি পড়াশুনো ছেড়ে দিল। ভাল ছাত্রী ছিল।

তা আমিই বা কী করব, তুই-ই বা কী করবি? ভাল লাগল না। ছেড়ে দিল।

কেন ভাল লাগল না, এটা কি প্রশ্ন নয় মামুজি ?

ফয়েজুদ্দিন ভুরু কুঁচকে তাকান। তারপর বলেন, তুই জাত-মাস্টার। পড়াশুনো নিয়ে মাথা ঘামাস। ভাল কথা। আবার ফুলের গন্ধ-টন্ধও শুঁকিস। তোর মধ্যে কিছু গণ্ডগোল আছে বাপ!

থাকতেই পারে। কিন্তু আমার অবাক লাগে মামুজি, আপনিই নাকি ভাগনির বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

হুঁ। তা একটু হয়েছি বটে! আমার বড্ড ভাবনা হয় রে! মেয়েটা হঠাৎ যেন একলা হয়ে গেছে। ওর এমন একজন সঙ্গী দরকার, যে ওকে বুঝবে। ওকে জানবে। তুই যদি—

আমি যদি? ও মামুজি! বলুন!

ফয়েজুদ্দিন ঠোঁটের কোনায় একটু হাসেন। তুই যদি আরও কিছুদিন কষ্ট করতে পারতিস!

বুঝতে পেরে সানুর বুক ধড়াস করে ওঠে। মুখ নামিয়ে বলে, আমার বাবা দর্জি ছিল। মা বোতামঘর সেলাই করত। খড়ের চালের ফুটো দিয়ে পানি ঝরত। ছেলেবেলা থেকে স্ট্রাগল করতে করতে, স্ট্রাগল করতে করতে— কিন্তু না মামুজি! আপনি রেলের অফিসার ছিলেন। কত জায়গা ঘুরেছেন। আপনি বলেছিলেন আপনার শরীরে রেলের চাকা ঘোরে এখনও। আপনি মাটিতে হাঁটা মানুষের কষ্ট কতখানি বোঝেন আমি জানি না।

হুঁ। বলে যা।

তা ছাড়া রুবিরও নিজস্ব মন আছে। ছিল।

ফয়েজুদ্দিন হো হো করে হাসেন। পদ্যে আছে, রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন। থাক্। ছেড়ে দে। কাল সকালে থাকবি তো?

এখন পুজোর ছুটি। নিবারণদার দুই ছেলেকে মর্নিংয়ে পড়াতে যাই। কাল যাব না।

আয়, টিভি দেখি।

আজ থাক মামুজি! রেজিনা একা আছে। গিয়েই ওকে পড়াতে বসতে হবে। দেরি হয়ে গেল।

কেন রে? নিজে থেকে পড়তে বসে না নাকি?

সানু উঠে দাঁড়িয়ে হাসে। শ্বশুরসাহেব একটা টিভি দিয়েছেন। সবসময় টিভি দেখে।

মোটরবাইক দেয়নি তোর শ্বশুর?

দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিইনি। ভয় করে। তাছাড়া সাইকেলে পথ চলার মধ্যে একটা সুখ আছে। বেশি স্পিড মানুষকে কিছু দেখতে দেয় না। আপনি ভালই জানেন। সানু ডাকে, চাচাজি! আমি উঠলাম।

খোন্দকার কালোর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, আচ্ছা-আ-আ। আবার এসো! ও ফজু! তুমি মেহেরবানি করে একটু দলিজ ঘরে যাও দিকি! সানুর সাইকেল আছে।...

এইখানে রেবেকাদের বাড়ি। এইখানে রাস্তার ওপর খানিকটা আলো তারপর বাঁক ঘুরেই অন্ধকার। পুজোর মুখে রাস্তায় মোরাম পড়েছিল। সানু ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে সাবধানে প্যাডেল করে। পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে ফয়েজুদ্দিনের চাপা কণ্ঠস্বর, 'তুই যদি আরও কিছুদিন কষ্ট করতে পারতিস!' ...'তুই যদি আরও কিছুদিন কষ্ট...' কষ্ট, কিছুদিন, তুই যদি, আরও...শব্দগুলি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। মীরপাড়ার বাঁকের মুখে এসে সে সাইকেল থেকে নামে। খানিকটা সংকীর্ণ রাস্তা এবং দুধারে পোড়ো ভিটে। এই সময় অন্য একটা কথা তার পিছু নেয়। 'আচ্ছা স্যার, আমাকে একটা স্বর্ণচাঁপা এনে দেবেন?' সানু একটু থামে। তারপর রেজিনার মুখটা মনে ভেসে ওঠে। সে ঘুম থেকে জেগে ওঠা চোখ দিয়ে গাছপালার আড়ালে একটা আলো দেখতে দেখতে হাঁটে। ওই অন্য আলোর নিচে অন্য একটা টিভির অ্যান্টেনা আছে। তার মনে পড়ে যায়।...

২

ঘাটবাজারে তোরাব ডাক্তারের ডিসপেন্সারি থেকে বাড়ি ফেরার সময় শর্টকাট করছিল রেবেকা। হঠাৎ একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি এসে যায়। খেলার মাঠ। তাই বৃষ্টি তাকে ইচ্ছেমত ভেজায়। ভিজতে তার নিজেরও ইচ্ছে এসে যায়। সকালবেলার নগ্ন নির্জন মাঠ। সেখানে তখন স্বাধীনতা ছিল।

মাঠের শেষ দিকটায় যেখানে একফালি পায়ে চলার পথ, সেখানে পৌঁছুনোর আগেই বৃষ্টিটা তাকে পিছনে ফেলে শেখপাড়ার দিকে চলে যায়। একটু দাঁড়িয়ে সে বৃষ্টিরেখাগুলি দেখে। দেখতে দেখতে আবার ঝলমলে রোদ। তারপর দূর থেকে একটা হাওয়া ছিনিয়ে আনে খোলের বোল, কয়েকটুকরো ভক্তিগীতির ছেঁড়াখোঁড়া কলি। কলোনিপাড়ার পিছনে সাধুবাবার আখড়ায় এসে হাওয়াটা মিস্টিক হয়ে উঠেছিল। রেবেকাকে ছুঁয়ে গেল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই দূরত্বকে একবার দেখে নেয়। তারপর শাড়ির তলা থেকে বগলদাবা হ্যান্ডব্যাগ বের করে আস্তেসুস্থে হেঁটে যায়।

কাজিপাড়ার ঘিঞ্জি গলিতে ঢোকার পর সে একটু অবাক হয়। বড্ড বেশি শর্টকাট করে ফেলেছে। আর কয়েকটা পুরনো ও নতুন বাড়ির পর দাদাপীরের দরগা এবং মোরামঢাকা রাস্তার ওধারে তাদের বাড়ি। জেলখানার মত উঁচু

পাঁচিল। ভেতরে থাকার সময় কিছু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে দেখলে গা ছমছম করে। কেন করে সে জানে না।

মাথার ওপর থেকে কেউ তাকে ডাকছিল, রুবি! রুবি! অ্যাই রুবি!

মুখ তুলে দোতলার ছাদে মিনিআপাকে দেখতে পায় রেবেকা। শাড়ি মেলে দিচ্ছিলেন মিনিআপা। রেবেকা বলে, কবে এলেন আপা?

এস। তবে বলব। নইলে আড়ি।

রেবেকা গেটের ভেতর ঝকঝকে নতুন গাড়িটা দেখতে পায়। একটু দ্বিধার সঙ্গে সে গেট খুলে ভেতরে ঢোকে। বোগেনভিলিয়ার একটা ঝুলেপড়া ডালের কাঁটা তার ভিজে খোঁপায় কী ভাবে আটকে যায়। কাঁটাটা সাবধানে ছাড়িয়ে সে বসার ঘরের সামনে দিয়ে খোলা দরজায় ঢোকে। বসার ঘরে কারা কথা বলছিল। সে ওদিকে তাকায়নি।

উঠোনে যেতেই সারা বাড়ি কলকলিয়ে ওঠে। একদঙ্গল নানাবয়সী মেয়ে অনেকরকম কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে, রুবি নাকি রে?···পথভুলে?···ওম্মা! দেখতে দেখতে তালের গাছ···এইসব।

বারান্দায় রঙিন মাদুর থেকে 'বড়মা', মিনিআপার দাদির মা তিনি, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। হাতে একটা কালো মসৃণ লাঠি। তাঁর ওঠার চেষ্টা দেখার মত দৃশ্য। রেবেকার মনে পড়ে যায় এবং হাসি চাপে। বৃদ্ধাকে ছোঁয়া চলবে না। ধরে ওঠানোর চেষ্টা করলেই চ্যাঁচামেচি করবেন, অ্যাই! অ্যাই! দিলি আমাকে না-পাক করে? হারামজাদি খবিস মেয়ে! এই শুচিবায়ু মেয়েদের একটা খেলার মাঠ।

মিনিআপা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন। রেবেকা বারান্দায় উঠলে তিনি বলেন, তুই ভিজেছিস দেখছি! কোথায় ভিজলি রে?

খেলার মাঠে। আপনি কবে এলেন আপা?

কাল রাত্তিরে। হাইওয়েতে রাস্তা অবরোধ। চারটে ঘণ্টা আটকে গেলাম। এই শেষ বাবা! মিনিআপা রেবেকাকে দেখতে দেখতে ফের বলেন, ভিজলি কেন?

ভিজে গেলাম। আব্বুর জন্য ঘাটবাজারে ওষুধ আনতে গিয়ে—

ওপরে আয়।

বারান্দায় দঙ্গলটি চুপ করে গেছে। রেবেকাকে দেখছে। রেবেকা বলে, আগে আব্বুর ওষুধ দিয়ে আসি আপা।

মিনিআপার মা শরিফা বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে বলেন, রুবি এ বাড়ি ঢুকেছিল জানলে খোন্দকারের বউ ওকে ঝাঁটাপেটা করবে। শরিফা হেসে ওঠেন। ও মিনি! তুমি জানো এক ডেসিমেল জায়গা নিয়ে দুই খালাতো ভাইয়ে তিনপুরুষ ধরে মামলা? মাঝখান থেকে মাটিটুকু পঞ্চায়েত লুটে

নিল। নে! এবারে কী নিয়ে লড়াই করবি কর!

নানাবয়সী মেয়েগুলি একসঙ্গে হেসে ওঠে। মিনিআপা রেবেকাকে কাঁধ আঁকড়ে দোতলায় নিয়ে যান। তারে ঝোলানো একটা তোয়ালে টেনে বলেন, মাথায় পানি বসবে। চুল মুছে নে। শাড়ি বদলাবি?

রেবেকা তাঁর খাতিরে চুল আলতোভাবে ঘষে নেয় শুধু। তারপর একটু হাসে। আপনি মুটকি হয়ে গেছেন আপা!

শাট আপ! চোখ দিসনে। হ্যাঁ রে, ছবির খবর কী?

নর্থবেঙ্গলে দুলাভাই বদলি হয়ে গেছেন। বকরিদে এসেছিল ছবি। সে ছবি আর নেই, আপা। কী ডাঁট আপনি ভাবতে পারবেন না। রেবেকা চোখে হেসে ফের আস্তে বলে, দুলাভাইকে কথা-কথায় ওঠ-বস করায়। উঃ! ছবিটা যে কী হয়ে গেছে।

কাচ্চা বাচ্চা হয়নি?

বেবেকা একটা আঙুল দেখায় শুধু। সে বারান্দার শেষদিকে রাখা প্যারাম্বুলেটারের। কাছে যায়। বলে, এটা কী আপা!

প্যারাম্বুলেটার সে কী রে? তুই প্যারাম্বুলেটার দেখিসনি? আমার এই এক ঝামেলা। এখানে আসা মানেই এটা আনো, ওটা আনো। আসলে কী হয় জানিস? হ্যাবিট। তুই বসবি, না দাঁড়িয়ে থাকবি? বস্ একটু।

রেবেকা বসে না। বলে, বনি আসেনি?

না রে? ওদের স্কুলে থেকে অন্টিরা স্টুডেন্টদের—কী যেন বলে, এনভাই-রনমেন্টাল ট্যুরে নিয়ে গেছেন। আজকাল কী সব হয়েছে বাবা? আমাদের সময়ে দিদিমণিরা গ্রামে সোশ্যাল ওয়ার্ক করাতে নিয়ে যেতেন। মিনি বেগম হেসে কুটিকুটি হন। গ্রামের মেয়েকে গ্রাম বোঝাতেন। একবার হুগলির ধনেখালিতে তাঁত বোঝাচ্ছেন, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। দিদিমণি তেড়ে আসতেই বললাম, আমাদের গ্রামে জোলাপাড়া আছে। একশখানা তাঁত আছে—ও! তুই আমার টনিকে দেখিসনি। দেখবি আয়।

ঘরের ভেতরে মেঝেয় দাঁড় করানো দোলনাতে একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছিল। রেবেকা বলে, ছেলে না মেয়ে?

মিনি বেগম রেবেকার চুল টেনে দিয়ে বলেন, নেকি! বলে ছেলে না মেয়ে? জামা দেখে বুঝতে পারছ না? ছমাস একুশদিন বয়স। সামলাতে অস্থির। ঘুমিয়ে আছে তা-ই। নৈলে এতক্ষণ কী করত তুই জানিস না। বাইয়ে আয়। একটু ঘুমোক। কাল রাস্তা অবরোধের সব ধকল টনির ওপর দিয়ে গেছে।

তারপর বারান্দায় এসে বলেন, এসে শুনলাম তুই পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিস। কেন রে? খালুজি ছাড়িয়ে দিয়েছেন, না তুই নিজে ছেড়েছিস।

আমি বিশ্বাস করিনি।

রেবেকা প্রশ্নটা এড়িয়ে বলে, দুলাভাই কোথায় আপা?

নিচে কোথাও আছে। তুই বলছিস না পড়াশুনো কেন ছাড়লি?

আপা! আব্বুর ওষুধ দিয়ে আবার আসব।

কী হয়েছে খালুজির?

কাশি, হাঁপের টান, ঘুসঘুসে জ্বর, সারা গায়ে ব্যথা। রেবেকা আবৃত্তির মত বলে যায়। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘোরে। আপা! মামুজি এসেছেন।

মিনি বেগম আস্তে বলেন, শুনেছি। আমি এসেছি জানলে ছুটে আসবে রুবি! শুনলাম কারা তোকে দেখতে এসেছিল?

রেবেকা ফিক করে হাসে। চাষারা! বলেই সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। মিনি বেগম রেলিঙের দিয়ে ঝুঁকে পড়েন। তাকে আরও একবার দেখবার জন্য কিংবা তার শেষ কথাটার মনে বুঝতে চাইছিলেন।

নিচের বারান্দায় 'বড়মা' উঠে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়ানো মানে কালো লাঠিটা মুঠোয় ধরে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। গাছের মত নিস্পন্দ। কখন আবার মানুষ হয়ে পা বাড়াবেন কেউ জানে না। তাঁর মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা থেকে সেই পা বাড়ানো পর্যন্ত দীর্ঘ আর অনিশ্চিত সময়টা হাবল কাজির মেয়েদের একটা খেলার ময়দান। পাঁচ মেয়ে তিন ছেলে। তিন মেয়ের বিয়ে হয়েছে। দুই ছেলে দুই বউ এনেছে। তাদেরও কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে। বাড়ি সারাক্ষণ কলকল করে। উঠোন জুড়ে মোরগ-মুরগির ঝাঁকও হইচইটা বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া দু-দুটো পণের টিভি নিচের ঘরে এবং ওপরের ঘরে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতায় কোমরবেঁধে লেগে যায়। বড়মা কানে কালা। তাঁর দুনিয়া শব্দহীন।

শরিফা রেবেকাকে আবার দেখতে পেয়ে বলেন, ও রুবি। চলে যাচ্ছিস কেন? কতদিন পরে এলি?

রেবেকা তার হ্যান্ডব্যাগ দেখিয়ে বলে, আব্বুর ওষুধ খালামা! পরে আসব।

আর আসবি! তোরা আর কতকাল পর হয়ে থাকবি বাবা? তোর আব্বা কখনও-সখনও আসতেন। আর আসেন না। ছবি মাঝে মাঝে আসত। সে-ও পরঘরি হয়ে গেল।

রেবেকার পেছনে শরিফা উঠোনে নামেন। সদর দরজার কাছে এসে চাপা গলায় বলেন, তোকে দেখতে এসেছিল। কারা রে?

চাষারা! বলেই রেবেকা বেরিয়ে যায়। সেই ঝুলে থাকা বোগেনভিলিয়ার ডালটা এড়িয়ে সাবধানে গেট ফাঁক করে গলিয়ে যায়। দাদাপীরের

দরগার পাশ দিয়ে যাবার সময় অভ্যাসবশত সে কপালে হাত ঠেকায়। সাদা কাঠমল্লিকার সাদা ফুলগুলি ভাল করে দেখার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবীতে বিস্ময়কর কত যে আছে! গ্রীষ্মকালে ফুলগুলি একটু হলুদ হয়ে যায় আর কী এক সৌরভ। ছেলেবেলায় এক দুপুরে ফুল কুড়তে এসে সে কোথাও দাদাপীরের খড়মের শব্দ শুনেছিল। ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছিল। চুপিচুপি ছবিকে সে-কথা বলতেই ছবি কেন কে জানে রেগেমেগে তার ফ্রক খামচে ধরেছিল। খালি মিথ্যে আর মিথ্যে! আমি সেদিন সন্ধ্যাবেলা আগরবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এলাম—একা! দাদাপীর শুধু তোকে দেখলেই খড়মপায়ে হেঁটে আসেন। আর আমি যে কত আগরবাতি জ্বালিয়ে ফতুর হয়ে গেলাম! আমার বেলা।

সত্যিই কি সে খড়মের শব্দ শুনেছিল? মনে পড়ে না। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে ছবিকে কথাটা বলা এবং ছবির রাগটা তার মনে থেকে গেছে। ভাঙা দেউড়ির পাশে আঁকাবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল কাঠমল্লিকার গাছটা নাকি দাদাপীরের নিজের হাতে লাগানো। ধসেপড়া নিচু পাঁচিলে ঘেরা দরগার ভেতরটা জঙ্গল হয়ে আছে। কালকাসুন্দে, আকন্দ, ফণিমনসা, শ্যাওড়া, কাঁটামাদার এইসব গাছগুলি সে চেনে। আরগুলি তার এখনও অচেনা। সোমলতার হলুদ ঝালরে ঢাকা সেই গাছটা কী গাছ? আচ্ছা সার, ওই যে মাজারের গা ঘেঁষে বেঁটে মত গাছটা—

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেবেকা। কতদিন পরে সার এসেছিলেন। সার বিয়ে করেছেন। বিয়ে করা মানেই তো একটা বউ থাকা! অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য লাগে। না সার, না! এটা ঠিক হয়নি, কিছুতেই ঠিক হয়নি। আপনি অন্যরকম এক মানুষ সার। সব মানুষ বিয়ে করবে। ছেলেপুলের বাবা হবে। ঘরসংসার নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। আপনি কি তাদের মতো? সার! আমি তো ভাবতেই পারিনি আপনি তাদের মতো। না, না! এটা ঠিক হয়নি। কিছুতেই ঠিক হয়নি। সার! আপনি—

অ্যাই রুবি। ওখানে কী করছিস?

রেবেকা চমকে উঠে তাকায়। মোরাম ঢাকা রাস্তায় মামুজিকে দেখতে পায়। সে ব্যস্তভাবে এগিয়ে যায়।

ফয়েজুদ্দিন ভাগনিকে দেখতে দেখতে বলেন, একেবারে শ্যাওড়াগাছের পেত্নী হয়ে গেছিস। গিয়েছিলি কোথায়?

ঘাটবাজারে। আব্বুর ওষুধ নিয়ে এলাম।

তা ওখানে কী করছিলি?

রেবেকা একটু হাসে। শর্টকাট করে কাজিপাড়া হয়ে এলাম।

হুঁ। ভিজেছিস মনে হচ্ছে?

একটুখানি।

একটুখানি ভিজলেই তোরা শুয়ে পড়িস। তোদের বংশের ধাত। আবার ছাতি নিতেও আলসেমি।

আপনি ছাতি নেননি। তার বেলা?

ফয়েজুদ্দিন তাঁর অট্টহাসিটি হাসেন। ওরে! আমি খানবাহাদুরের খান্দান। আমার দাদাজি খানবাহাদুর মহিউদ্দিন খান চৌধুরি লাটসাহেবের সঙ্গে বাঘ মারতে যেতেন। মহা ধড়িবাজ লোক। নিজের গুলিতে বাঘ মেরে লাটসাহেবকে বলতেন, ইওর এক্সেলেন্সি! দিস ইজ ইওর টাইগার! নাহ! রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প হয় না। রাতের আসরে হবে। সানু আসবে। ফয়েজুদ্দিন সদরদরজার ভেজানো কপাট ঠেলে আস্তে বলেন, সানুর বউ দেখতে গিয়েছিলাম।

রেবেকা দ্রুত বলে, মিনিআপা এসেছেন মামুজি!

বাহ্! খুব ভাল। দেখাসাক্ষাৎ হবে। তা সানুর বউ—

রেবেকা উঠোনে ছুটে যায়। আম্মি! ও আম্মি! ছাতির কথা মনে করিয়ে দেননি! ভিজে একসা হয়ে গেছি। এমন বাজে বৃষ্টি! কোনও মানে হয়!

রোকেয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু ঝাঁঝানো গলায় বলেন, কোথায় বৃষ্টি? ঝাঁ ঝাঁ রোদ। আড়াই ঘণ্টা লাগে? তখন থেকে পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! এক্ষুনি ভাবছিলাম সামিরুনকে পাঠাব।

রেবেকা হ্যান্ডব্যাগ থেকে প্রেসক্রিপশন আর ক্যাপসুল বের করতে করতে বলে, ডাক্তারচাচাজি বাড়ি ফেরার পথে আব্বুকে দেখে যাবেন। ততক্ষণ এই ক্যাপসুলটা খাওয়াতে হবে। আর আগের সিরাপটাই চালিয়ে যেতে বললেন। আর হ্যাঁ—ব্যথা কমানোর জন্য এই ট্যাবলেট। ট্যাবলেটটা খেয়েই অ্যান্টাসিড খেতে হবে। আনা আছে দেখুন। সে একটু হাসে। আমাকে ভিজিয়ে বৃষ্টিটা শেখপাড়ার দিকে পালিয়ে গেল আম্মি! এই দেখুন না আমার শাড়ির কী অবস্থা!

হায় আল্লা! তুইও ভিজলি? এবার দ্যাখ কী হয়। বাপ-বেটি বিছানায় আরাম করে শুয়ে থাকবি আর এই রোগা হাড়ে আমাকে খাটিয়ে মারবি। বোকা মেয়ে! রিকশো ছিল না ঘাটবাজারে?

ছিল তো! আমি কাজিপাড়া দিয়ে শর্টকার্ট করছিলাম। আম্মি! মিনিআপা এসেছে! কোথায় রাস্তা অবরোধ ছিল। গাড়ি চার ঘণ্টা আটকে—

থাম! শাড়ি বদলে তবে যা বলার বলবি। রোকেয়া ঘরে ঢোকার সময় স্বগতোক্তি করেন, মোটরগাড়ি দেখাতে আসে!

ফয়েজুদ্দিন টিউবওয়েলের জলে চপ্পল ধুচ্ছিলেন : মীরপাড়ার কাঁধ ছুঁয়ে গিয়েছিল বৃষ্টিটা। ভিজে মোরাম তার চপ্পল আর পা রাঙিয়ে দিয়েছিল। ধোয়ার পর বারান্দায় উঠে হাঁক দেন, সামিরুন! কোথা গেলি রে?

রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে সামিরুন। জি মামুজি!

পকেট থেকে একমুঠো লজেন্স বের করে ফয়েজুদ্দিন বলেন, এই নে! খবরদার! একসঙ্গে সব খেয়ে ফেলবিনে! পেটে কেঁচো হবে।

ডাল পুড়ে যাবে মামুজি! বলে সামিরুন রান্নাঘরে ফিরে যায়। তার মুখ হাসিতে ঝলমল করছিল।

ফয়েজুদ্দিন সবখানে এই হাসি বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। রিটায়ার করার পরও রেলগাড়ির গতি তাঁর শরীর থেকে আর মন থেকেও ফুরিয়ে যায়নি। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে আরও একখানে। নিজে হাসতে চান, অন্যের মুখেও হাসি দেখতে চান। এতক্ষণে ভিজে পায়ে একটু অন্যমনস্ক তিনি। শেষদিকের ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ঢোকার সময় বারান্দার লম্বা তার থেকে তোয়ালে টেনে নেন। বিছানায় বসে পা মুছে এবং লুঙ্গি, গেঞ্জি পরে দেয়ালে ঝোলানো ডিমালো আয়নায় গোঁফ দেখতে থাকেন। দাদাপীরের দরগার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর ভাগনির ছবিটি মনে ভেসে আসে। অমন করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিল রুবি?

রেবেকা ডাকছিল, আম্মি! আম্মি!

রোকেয়া স্বামীকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। কী হল? আসমান ফাড়ছিস কেন?

আমি চান করতে যাচ্ছি!

রোকেয়ার রুষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। চানই কর। এ জীবনে আর তোকে গোসল করতে হবে না—চান! চান শিখেছে!

কথা কানে গেলে ফয়েজুদ্দিন বেরিয়ে আসেন। বলেন, জল-পানির কাজিয়া! নেই কাজ তো খই ভাজ! অবশ্যি মধ্যিখানে একটা গোরু আছে।

রেবেকা কাঁধে তোয়ালে, এক হাতে সাবানকৌটো আর অন্যহাতে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ নিয়ে উঠোনে নেমে যায়। টিউবওয়েলের পাশে দলিজঘর সংলগ্ন স্যানিট্যারি ল্যাট্রিন এবং ছাদহীন গোসলখানা। টিনের কপাট একটু শব্দ করে মাত্র। রেবেকা মুছে যায় ফয়েজুদ্দিনের চোখ থেকে। কিন্তু মনে তার সেই ছবিটা—কিছুক্ষণ আগে যাকে দেখেছেন। দাদাপীরের দরগার পাশে কাঠ-মল্লিকা ফুলের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুলে কী আছে? কী থাকে? কী ছিল?

খোন্দকারের ঘরে ঢুকে যান ফয়েজুদ্দিন। রোকেয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি একটু বসুন ভাইজান! রান্নাঘরে যাই। মেয়েটা বড্ড নোংরা। কী করব? বোঁচার মা মরে গেল। কালো তার ভাইঝিটাকে এনে দিল। রাখলাম।

রোকেয়া বেরিয়ে গেলে ফয়েজুদ্দিন খোন্দকারের গলা ছুঁয়ে দেখে বলেন, জ্বর নেই মনে হচ্ছে! থার্মোমিটার নেই ঘরে?

খোন্দকার বলেন, আছে। ভোরে নাইনটি নাইন ছিল। এখন নরম্যাল টেম্পারেচার। শুধু কাশিটা বড্ড জ্বালাচ্ছে হে!

আজ ক'টা সিগারেট খাওয়া হল?

একটা। চা খাওয়ার পর—

রাতে তো হাঁপানির টান উঠেছিল!

ঠিক হাঁপানি নয়! পিঠে দু'দিক থেকে চেপে ধরার মত। একটা অ্যানালজেসিক খেয়েছিলাম। ভোরবেলা আবার সেইরকম চেপে ধরা। অ্যানালজেসিকে কাজ হল না। তবে ঘণ্টাখানেক পরে কমে গেল।

ডাক্তারসাহেব এক্সরে করাতে বলছেন না?

করিয়েছিলাম। লাংয়ের পেছনদিকটায় নাকি কফ জমে শক্ত হয়ে গেছে। স্মোকারস লাং কি অন্যরকম হবে?

খোন্দকার হাসবার চেষ্টা করেন। একটু চুপ করে থাকার পর ফয়েজুদ্দিন বলেন, সানুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর বউকে দেখে এলাম।

সানু দাওয়াত করেছিল। হঠাৎ করে বিয়ে। আর সেই সময় ছবি টাউনের নার্সিং হোমে ভর্তি। রুবি আর ওর মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত। লাল-মিয়াঁর বাড়িতে থেকে নার্সিংহোমে যাতায়াত করত। শেষে সিজারিয়ান অপারেশন করে—তো আমি বাড়ি ফেলে কী করে যাই? খোন্দকার কিছুক্ষণ কাশেন। কাশি থামার পর ফের বলেন, সানুর আব্বা আব্দুল গফুর আমার দাদিজির দিক থেকে দেখলে রিলেটিভ। তা সানু তো নিজে থেকে বউ দেখাতে আনবে? ভুলেই গেল। তবে কুতুবপুরে ওর শ্বশুরের খান্দানও মীর। গফুরও মীর ছিল। আই ফিল ফর সানু! বরাবরই একটু সফট কর্নার ছিল ছেলেটার ওপর। বুঝলে হে? নিজের চেষ্টায় বি এ পাশ করে প্রাইভেটে এম এ দিল। তারপর বি এডও করল। টেলেন্টেড।

ফয়েজুদ্দিন একটু হাসেন। বড়লোকের মেয়ে!

দেখতে কেমন?

দেখতে যা-ই হোক, খুব দেমাক! আর বয়স সানুর কাছাকাছি। দু'এক বছর বেশি হলেও অবাক হবার কিছু নেই। ব্ল্যাকমেল করেছে দুলাভাই! স্রেফ ব্ল্যাকমেল।

ইউ আর ড্যাম রাইট, ফজু! আমার কানে এসেছিল। তত খেয়াল করিনি। খোন্দকার আবার হাসবার চেষ্টা করেন। একটু পরে ফের বলেন, তবে সানু ঝড়-ঝাপটা খাওয়া ছেলে। মানিয়ে নিতে পেরেছে বৈকি। কী মনে হল?

পেরেছে। না পেরে উপায় কী? উঠোনে চিমনিভাটার ইটের পাঁজা দেখলাম। পাকা ঘর তুলবে।

ভালই তো!

হ্যাঁ ভালই।

খোন্দকার শ্যালকের পাঁজরে গুঁতো মেরে বলেন, তুমি একটা ওইরকম ছেলে খুঁজে পাচ্ছ না হে! দুনিয়াসুদ্ধ তোমার এত চেনা-জানা। বেছে-বেছে খালি চাষাভুষো—

দুলাভাই! বলছিলাম না হাওয়া ফর্টি সেভেনের পর পুবে সরে গেছে? ছুটকো-ছাটকা এখানে-ওখানে যারা সব পড়ে আছে, তারা—যাক গে মরুক গে! চাষাভুষো বলছেন আপনি? তাদের ঘর থেকে নতুন জেনারেশনে আই এ এস, আই পি এস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর—পার্লিটিসিয়ানদের কথা বাদ দিচ্ছি, মিনিস্টার, স্টেটমিনিস্টার, ডেপুটি মিনিস্টার পর্যন্ত—নাহ্‌, দুলাভাই! আপনার লজিকে ভুল আছে।

তুমি যাই বল হে! রক্ত বলে একটা জিনিস আছে। তুমি ফ্যানটা একটুখানি বাড়িয়ে দাও।

ফয়েজুদ্দিন উঠে গিয়ে ফ্যানের রেগুলেটর তিনে দিয়ে বলেন, এই থাক্‌। ওষুধের গরম না খান্দানির গরম দুলাভাই?

দুই-ই।

তবু তো আপনাদের এখানে ভোল্টেজ মোটামুটি ঠিক আছে। মোবারক-পুরে দেখে এলাম একশ ওয়াট বালব মিটমিটে লাল। পাখা ঘুরছে। কিন্তু হাওয়া নেই।

আগে কালীপুজোর পর এখানেও একই অবস্থা হত। গত দু'বছর থেকে অবস্থা একটু ভাল। তুমি তো দেখেছ।

মবিন খোন্দকারের কাশিটা আবার উঠল। ফয়েজুদ্দিন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ঘুরুন! পিঠটা মালিশ করে দিই।

খোন্দকার কাশতে কাশতে উঠে বসেন। হাত নাড়েন। ফয়েজুদ্দিন তাঁর পিঠে কয়েকটা বালিশ ডাঁই করে দিলে তিনি হেলান দিয়ে বসেন। কাশি থামার পর হঠাৎ শ্যালকের একটা হাত চেপে ধরে বলেন, ফজু মিয়াঁ!

বলুন দুলাভাই!

হায়াত-মউত খোদার হাতে। আব্বা আশি বছর বেঁচে ছিলেন। দাদাজি

এইট্টি সিক্স। কেমন কমে আসছে দেখছ? সেভেনটি ওয়ান পেরুব কি না গ্যারান্টি নেই হে!

আহ্! কী সব আবোল-তাবোল বলছেন?

ফজু মিয়াঁ! হঠাৎ একটা কিছু ঘটে গেলে—রুবি রইল। তোমার বোনের কথা চিন্তা করিনে।

দুলাভাই! আপনি বড্ড সেন্টিমেন্টাল!

তোমার হাত আমার হাতে। কসম খাও, রুবি যেন খান্দান পায়। না না ফজু! আমি আজরাইলের ডানার আওয়াজ পাই—কখন ও কাছে, কখনও দূরে। তুমি কসম খেয়ে বল ফজু মিয়াঁ—

ফয়েজুদ্দিন একটু হাসেন। আমার কসমের কি দাম আছে দুলাভাই? আমি এক উড়োপাখি।

আছে। আমি দাম দিচ্ছি। ফজু মিয়াঁ! আল্লার নামে কসম খাও, রুবি যেন—

শ্বাস ছেড়ে ফয়েজুদ্দিন বলেন, খেলাম।

না। তুমি পুরো সেন্‌টেন্সটা বলো। বলো, বলো. আল্লার কসম, রুবিকে খান্দান দেব।

যদি দিতে না পারি, তাহলে কী হবে দুলাভাই? আপনি আমাকে বড় বিপদে ফেললেন।

রুবি তোমার ফুফুজির মত আইবুড়ি থেকে যাবে। থাকবে······

তখন গোসলখানায় রেবেকা চুলে তোয়ালে জড়িয়ে সায়া পরছিল। তারপর হঠাৎ নিজর শরীরের নগ্নতা টের পায় এবং দ্রুত ব্রেসিয়ার টেনে নেয়। কোনা-কুনি একটা তারে ব্রেসিয়ার ব্লাউজ আর শাড়ি ঝুলছিল। আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘগুলি তাকে যেন দেখে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এরকম এক আশ্চর্য অনুভূতি। মেঘগুলি চলে গেলে আকাশ নির্লজ্জ নীল হয়ে তাকে দেখছে। দেখছে তাকে ঝাঁপিয়ে আসা শিউলির পাতা আর ফুলের কুঁড়িগুলি, যারা সন্ধ্যায় গন্ধ ছড়াবে বলে ওত পেতে আছে। দেখছে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলের একটা অংশ, যা খুবই পুরনো এক প্রহরী। এই ধরনের অনুভূতি তার নতুন—এই বোধটা আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত ছিল। এতদিন তবে কি শুধু তার মনই ছিল, শরীর ছিল, না? নাহ। ছিলই না। যা ছিল, তা একটা জৈব অস্তিত্ব মাত্র। তার বেশি বা কম কিছু নয়। একদিন স্কুল থেকে ফিরে সে নিজের শরীর থেকে রক্তঝরা দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ছবি গম্ভীর মুখে বলেছিল, অসুখবিসুখ হয় না? জ্বর, মাথাধরা, দাঁত থেকে রক্ত? ইশ! যেন বেহেশতের হুরি রে! হুরিদের অসুখবিসুখ হয় না। এসব কিচ্ছু হয় না। তুই কি নিজেকে হুরি ভাবছিস? এইসব কথায়

একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল, যা মেনে নেওয়া যায়। মেনে নিতে নিতে একটা অভ্যাস এসে গিয়েছিল। কিন্তু তার বাইরে অন্যরকম কিছু—এই যে তার নগ্নতার বোধ, এটা একেবারে নতুন। কলকাতায় তার খালাআম্মিদের বাথরুমে একটা আয়না আছে। সেটা তার মাথার একটু ওপরে হলেও সামান্য কাত হয়ে শরীরের খানিকটা দেখিয়ে দেয়। তবু তার কিছু মনে হয়নি। আজ হঠাৎ এমন মনে হল কেন যে জৈব অস্তিত্বের মধ্যে সে উনিশ বছর ধরে বসবাস করছে, তার এই নতুনতা পরদা হঠাৎ সরে গিয়ে অদেখা অজানা কিছু দেখে বা জেনে ফেলার মত। এতে বিস্ময় এল। রহস্য এল। রেবেকা আড়ষ্ট হাতে শাড়িটা পরে নিয়ে খুব আস্তে টিনের কপাট খোলে। মুখ বাড়িয়ে ডাকে, সামিরুন!

তার কণ্ঠস্বরেও কিছু নতুন ছিল কি? ঈষৎ বিপন্নতার কোনও সন্তর্পণ ধ্বনি! সামিরুন চেরা গলায় সাড়া দেয়, ছোটবুবু! তা হলে সেই সাপটা! সেই সাপটা! সে একটা চেলাকাঠ হাতে নিয়ে ছুটে আসে। এমন ঘটে যায় যে ফয়েজুদ্দিনও বেরিয়ে আসেন। রোকেয়া রান্নাঘর থেকে চেঁচামেচি করেন।

রেবেকা টিনের কপাট শব্দ করে খুলে বলে, থাপ্পড় খাবি বলে দিচ্ছি! ডাকছি কাপড়গুলো পানিকাচা করে রোদে মেলে দিতে, আর সাপ-সাপ করে চেঁচাচ্ছে!

ফয়েজুদ্দিন বলেন, তোদের বাড়িতে বাস্তুসাপ ছিল রে! এখন আছে কি না জানি না।

অপ্রস্তুত সামিরুন চেলাকাঠটা জ্বালানিঘরে রাখতে যায়। রোকেয়া বেরিয়ে এসে বলেন, মেয়েটার দোষ নেই। এমন করে ডাকল, যেন—তিনি ভাইজানকে বলেন, ছিল। কখনও কখনও বেরুত। একবার গোসলখানার কোনায় শুয়েছিল। আর একটু হলেই পা পড়ত। তখন পাঁচিলের তলায় ফাটল ছিল তো! রাজমিস্ত্রি ডেকে আবার সব ভেঙে চুরে নতুন করে সিমেন্ট দেওয়া হল। পাঁচিলের ওপর থেকে নিচে অব্দি নতুন পলেস্তারা করা হল। তবু যদি সাপ বেরয় তো রুবির জন্য বেরুবে। কী জঙ্গল করে রেখেছে দেখছেন? তার ওপর ওই হাসনুহেনা। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, হাসনুহেনা সাপ ডেকে আনে। তাই না ভাইজান?

ফয়েজুদ্দিনকে সাক্ষী মানা ভুল হয়েছিল। তিনি তাঁর অট্টহাসিটি হাসার পর বলেন, সাপের ঘ্রাণশক্তি নেই রে বুড়ি! সাপকে ফুল শোঁকা কী গু-গোবর শোঁকা, ফারাক বুঝবে না।

রোকেয়া রাগ করে বলেন, কোত্থেকে ভিজে বাড়ি এল। এসেই অসময়ে অতক্ষণ ধরে গোসল। আমার কী? একজন শুয়ে ধুঁকছেন। আরেকজন

শুয়ে থুকবে।

বুড়ি! আমিও গোসলটা সেরে নিই। আজ একটু সকাল-সকাল খাব। একটু হাত চালাতে হবে ভাই!

রান্না হয়ে গেছে। বেশিক্ষণ রান্নাঘরে থাকলে প্রেসার ওঠে। যা পারি রাঁধি।

কী রাঁধলি আজ? এবেলা কিন্তু গোসতো খাব না। পোস্ত পেলে দোওয়া করব।

রাত্তিরে আলু-পোস্ত করব।

রেবেকা তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল। শাড়িটা নতুন করে গুছিয়ে পরে বাইরে এল। রোদে দাঁড়িয়ে সে চুল ঝাড়তে থাকল। তার চুল ঝাড়ার একটা ছন্দ আছে, কেন না তার চুল খুব ঝাঁকালো এবং কোমর পেরিয়ে এক কালো প্রবাহ, যা হঠাৎ থমকে গেছে, যেন বা থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুবা তা মাটি ছুঁত এবং সৌন্দর্যের পবিত্রতা হারাত—এইরকম মনে হতে পারে, যদি এসব সময়ে কেউ তাকে দেখে। আসলে কোনও কোনও চুলে বিস্ময়কর সৌন্দর্য বিছিয়ে দেয় কোনও-কোনও মুখের অ্যানাটমি··· ।

তোরাব ডাক্তার বাড়ি ফেরার পথে খোন্দকারকে দেখে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে রেবেকা বেরিয়ে পড়ে। রোকেয়া এতক্ষণে খেতে বসেছিলেন। ডাইনিং টেবিলে তাঁর খেতে ভাল লাগে না। রান্নাঘরের মেঝেয় বসে বুকের কাছে থালা তুলে তিনি অনেক সময় নিয়ে খান। খাওয়ার সময় তাঁর চোখের পাতা আস্তে নামা-ওঠা করে। ফয়েজুদ্দিন খোন্দকারের ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলেন। রেবেকা সামিরুনকে চুপিচুপি বলে গিয়েছিল, সে মিনিআপাদের বাড়ি যাচ্ছে।

দাদাপীরের দরগার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে কাঠমল্লিকা ফুলের দিকে তাকায়নি। তার দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে এবং মন ছিল মিনিআপার দিকে। মিনিআপার মধ্যে তার ছেলেবেলার একটা দামি অংশ থেকে গেছে, তাঁর বিয়ে হওয়ায় পর একথা মনে হয়েছিল। তারপর থেকে মাঝেসাঝে একই কথা মনে হয়। ছবির বিয়েতে রেবেকা খুশি হয়েছিল। তার অনেক আগে যখন মিনিআপার বিয়ে হয়েছিল, তখন তার কান্না পেত। কত ছুটির দিনে, রেনিডেতে স্কুলের বইখাতা হাতে হাবল কাজির বাড়িতে সে অনায়াসে ঢুকে গেছে। মিনিআপার সঙ্গে লুডো খেলেছে। কখনও ক্যায়াম, কখনও উঠোনে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন। কাজি খালুজির বড় মেয়ের মধ্যে কী এক শক্তি ছিল তিনি অতবড় পরিবারকে চোখ রাঙিয়ে শাসনে রাখতেন।

গেট সাবধানে খুলে বোগেনভিলিয়ার সেই ঝুলেপড়া ডালটা সে চুপিচুপি ভেঙে দেয় এবং ভাঙার সময় কাজিখালুজি তাকে দেখতে পান। বসার ঘরের

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থামের আড়ালে তিনি দাঁত থেকে গোশতের কুঁচি ছাড়াচ্ছিলেন। অ্যাই! অ্যাই! কে গাছে হাত দেয় রে?

আমি খালুজি!

রুবি না?

জি।

তোকে যে চেনাই যায় না রে! আসিস না কেন? বাপ-মায়ের বারণ?

জি না। আমি আসি তো। সকালে এসেছিলাম।

সে তো মিনির খাতিরে। হাবলকাজি নেমে এসে গেটের দিকে যান। হাত কুটকুট করছিল রে? ডালটা ভেঙে ফেলে রাখলি। কার পায়ে কাঁটা ফুটবে! এত বড় হয়েছিস, খাসিয়ত গেল না। খালি ভাঙচুর তছনছ।

ডালটা কুড়িয়ে তিনি বাইরে ফেলে দেন। রেবেকা ব্যাখ্যা না করেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বড়মা বারান্দায় বসে গলানো ফ্যানসুদ্ধ ভাত-ডাল-তরকারি গিলছিলেন। ওতে মাংসের আঁশও থাকে। দু'হাতে ফুলকাঁসার জামবাটি তুলে ধরে একটি করে ঢোক গেলেন। পরের ঢোকটি জলের। গ্লাসও ফুলকাঁসার। কাজিবাড়িতে কাঁসার চলন নেই। শুধু এই বৃদ্ধার জন্য এই ব্যবস্থা। চিনেমাটির অনেক দামি পাত্র তাঁর হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।

উলটোদিকে উঁচু বারান্দাওয়ালা রান্নাঘর। বাড়ির দামাদ মিয়াঁরা এলে ডাইনিং টেবিল-চেয়ার পাতা হয়। তাঁরা চলে গেলে বারান্দার মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে গোল হয়ে বসে সবাই খাওয়াদাওয়া করে। তখনও মেয়েদের দঙ্গল হইহল্লা করে খাচ্ছিল। কেউ-কেউ ডাইনিং টেবিলে। রেবেকাকে দেখে হইচই একটু থামে। তারপর রেবেকা দোতলার বারান্দা থেকে মিনি বেগমের ডাক শুনতে পায়। সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যায়। মিনি টনিকে পায়চারি করতে করতে ভাত-ডাল নরম করে খাওয়াচ্ছিলেন। ভাতের বাটি একটা চেয়ারে ছিল। দোতলায় মাছির উপদ্রব নেই। তা ছাড়া ফ্যান ঘুরছিল। মিনি বলেন, একটু বস। খেয়েছিস?

ক-খ-ন!

তুই সকাল সকাল খাস। স্কুল-লাইফের হ্যাবিট। না?

রেবেকা টনির গাল ছুঁয়ে বলে, বনির চেয়ে সুন্দর হয়েছে আপা!

বনিকে তুই অনেকদিন দেখিসনি।

মনে তো আছে।

পাগলি! তুই আর কী এমন বেড়েছিস? তোকে দেখলে চেনা যায়! বনির জন্য একটাই চিন্তা। ফ্যাটি হয়ে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছিলাম। ডায়েট-কন্ট্রোল করে, শেষে তোর দুলাভাই একটা যোগব্যায়াম সেন্টারে আমাকে— মিনি হেসে কুটিকুটি হন। তারপর একটা সুইমিং ক্লাবে পর্যন্ত টেনে নিয়ে

গিয়েছিল। আদিখেত্যা! স্টুডেন্ট-লাইফে এই কাটালিয়াঘাট থেকে নবাবগঞ্জ টাউন দশ কিলোমিটার গঙ্গায় সুইমিং রেসে আমি ফাস্ট হয়েছিলাম। ওকে ট্রফিগুলো দেখলাম। কী বলল জানিস?

ঘরের ভেতর থেকে মোরশেদ বলেন, সব শুনছি কিন্তু!

রেবেকা পরদা সরিয়ে উঁকি মারে। সালাম দুলাভাই!

এসো। একটু আদর করি।

মিনি বলেন, যাবি নে রুবি! মানুষখেকো বাঘ।

কে বাঘ? রুবির জানা উচিত, আমিই বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছি।

ঘুমোচ্ছিলে যে? শিকারের গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল বুঝি? আয় রুবি, এখানে বস!

মোরশেদ বেরিয়ে এলেন। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। রেবেকাকে দেখে নিয়ে বলেন, বয়স থাকলে ইনশাল্লা এই মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যেতাম। আমি ধর্মত চার-চারটে বউ রাখতে পারি।

মিনি বাঁকামুখে একটু হাসেন। জানিস রুবি? টিপিক্যাল মুসলমান যেমন হয়। হিন্দুর মেয়ে দেখলেই নোলা দিয়ে পানি গড়ায়। পাত্তা না দিলেও ছোঁক-ছোঁক করে ঘোরে—তা সে খেঁদি-বুঁচি-পেঁচি যা-ই হোক।

এই! কী সব বলছ তুমি? বাপের বাড়িতে পেয়ে—

আমার বাপের বাড়িতে এসে তো তুমি সাচ্চা মুসলমান। শ্বশুরের সঙ্গে টুপি পরে নামাজ পড়তে যাও। ওই শোনো! জোহারের আজান দিচ্ছে টুপি পরো।

মোরশেদ একটা চেয়ার টেনে বসেন। এস রুবি! তোমার আপার মেজাজ কাল বিকেল থেকে খাপ্পা। রাস্তা অবরোধ তো আমি কী করব বলো? এদিকে, প্রায় দুশ কিলোমিটার ড্রাইভ করে আমার কী অবস্থা হয়, তুমি বোঝ।

রেবেকা রেলিং-এ হেলান দিয়ে বলে, দুলাভাই! খালা আম্মিদের বাড়ি যান না আপনি?

সময় পাইনে। ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়ি। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা বেজে যায়।

মিনি বলেন, শেষ চার-পাঁচ ঘণ্টা কোথায় থাকে জিজ্ঞেস কর রুবি! যা সব বন্ধু জুটিয়েছে, মডার্ন আমির-ওমরা। আবার মেয়েবন্ধুও আছে। কিন্তু তারা ওকে কী চোখে দ্যাখে, বুঝেও বোঝে না।

কী মুশকিল। বিজনেসের খাতিরে হাই সোসাইটিতে একটু মেলামেশা না করলে চলে? রুবি! তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি শোনো।

রুবি শুনবে না। হাই সোসাইটি দেখাচ্ছে! ও তুমি যতই মেশো, আড়ালে তুমি গরুখেকো নেড়ে। আমি বাবা হাড়ে-হাড়ে জানি।

মোরশেদ বিরক্ত হয়ে বলেন, বেশ তো! তোমার মুসলমানরা ক্লাব করে না কেন? তাদের সোসাইটি নেই কেন? কলকাতায় কম বিগ মুসলমান নেই? নন-বেঙ্গলিদের কালচার আলাদা। তাদের কথা ধরছি না। কিন্তু বাঙালি মুসলমান? পরস্পর পরস্পরের শত্রু। এদিকে টাই-সুট পরব। গাড়ি হাঁকাব। মেঝেতে কার্পেট মুড়ব। ওদিকে—ছাড়ো!

মিনি হেসে কুটিকুটি। আঁতে ঘা লেগেছে সায়েবের। ওকে এইজন্যই মাঝেমাঝে এখানে টেনে আনি। রাঢ়ের খান্দানি তো দেখেনি। কাঁটালিয়াঘাট তার লাস্ট পয়েন্ট। নেই-নেই করেও যেটুকু ছিটেফোঁটা আছে, তার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজতে গেলে চোখ টেরিয়ে যাবে। বল রুবি! যাবে না?

রেবেকা হেসে ফেলে। আপনি আব্বার টোনে কথা বলছেন আপা।

বলব না? নওয়াজ ফুফাজিদের বাড়ির বাউন্ডারিওয়াল দেখে এই ভদ্রলোক বলেছিল, রাজবাড়ি ছিল নাকি? আমি বললাম, আয়মাদার কথাটা বোঝো? বোঝে না। নানিজির মুখে শুনেছি, আম্মার বিয়েতে আড়াইশ বরযাত্রী গিয়েছিল। পঞ্চাশ-ষাট আয়মাদারের জন্য তক্তাপোষের ওপর জাজিম। আর বাদবাকিরা খলিয়ানে মাটির ওপর সতরঞ্চিতে বসে খেল। একতরফ বিরিয়ানি, অন্যতরফ ভীষণ ঝাল গোশতের সুরুয়া।

মোরশেদের হাতে পাইপ ছিল। তামাক ভরতে ভরতে বলেন, প্রোটেস্ট করেনি তারা?

কেন করবে! যখনকার যা রীতি। বিরিয়ানি খাওয়া মুখ তো নয়। খেতে দিলেও কি খেতে পারত?

শ্বশুর সায়েব দুঃখ করে বলছিলেন, এখন শেখপাড়া তাঁকে দেখে সালাম দেয় না। বদলা নেওয়ার পালা।

ভোটকুড়ুনিদের আস্কারা। বলে মিনি টনির মুখ মুছিয়ে দেন। তারপর রেবেকার সামনে তুলে ধরেন। দেখ তো বাবুসোনা চিনতে পার নাকি। তোমার এক আন্টি গো! দেখ দেখ! কেমন সু-উ-ন্দর এক আন্টি। না বাবুছোনা?

ভাগ্যিস বাচ্চাটা মুখ ঘুরিয়ে মায়ের ব্লাউজ আঁকড়ে ধরে। কাচ্চাবাচ্চা কোলে নিতে রেবেকার অস্বস্তি হয়। ছবি তার মেয়েকে কোলে দিতে এলে ভয়ে পালিয়ে যেত। সে বলে, ক'দিন আছেন আপা?

লাইটার জেলে পাইপ ধরিয়ে মোরশেদ বলেন, পরশু আর্লি মর্নিংয়ে স্টার্ট করব।

মিনি বলেন, তালা দিয়ে এসেছি ফ্ল্যাটে। আজকাল ফ্ল্যাটবাড়িতে খুব ডাকাতি হচ্ছে রে! ওগো, তুমি টনিকে একটু ধরো। আমি রুবির সঙ্গে আড্ডা দিই।

আমার মুখে জলন্ত পাইপ। তোমার খুদে আয়মাদার পাইপ দেখলেই হাত বাড়ায়।

মিনি গ্রাহ্য করেন না। জোর করে স্বামীর উরুতে বসিয়ে দেন তারপর ডাকেন, আয় রুবি!

রেবেকা হঠাৎ নড়ে ওঠে। এই রে! দেরি করে ফেললাম। তোরাব ডাক্তারকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। আব্বুর কাশিটা কমছে না। হাঁপের টান। একশ দু ডিগ্রি জ্বর। পরে আসব আপা!

মিনিকে অবাক করে সে ছুটে সিঁড়ির দিকে যায়। তরতরিয়ে নেমে বেরিয়ে যায় কাজিবাড়ি থেকে। বাইরে গিয়ে জোরে শ্বাস ছাড়ে। কী যে মনখারাপের দিন একটার পর একটা। কেন তার চেনাজানা মানুষজন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল? খুব আশা করে এসেছিল, মিনিআপার সঙ্গে লুডো বা ক্যারাম খেলবে। রোদ কমে গেলে উঠোনে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন। বাড়ি ফেরার সময় ইচ্ছে করেই বড়মাকে কদমবুসির একটু ভঙ্গি করবে এবং একশ দু'বছরের বৃদ্ধা না না না না আর্তনাদ করবেন। দিলি তো ছুঁয়ে না-পাক করে? হারামজাদি খবিস কাঁহেকা!

তার পৃথিবীতে কেন মানুজন ক্রমশ নিরানন্দ আর পাষাণ-পাথর কথাবার্তা? মামুজিকেও এখন কেন এক নিষ্ঠুর দৈত্য মনে হয়? কোথা? থেকে কাদের ডেকে নিয়ে আসেন, আর তারা—সত্যিই তারা তাকে শস্যক্ষেত্রের মত জরিপ করতে চায়।

বাড়ি ফিরে রেবেকা দেখে, বারান্দার সামনে অর্ধবৃত্তাকার চত্বরে বসে সামিরুন রোদে-দেওয়া আচার পাহারা দিচ্ছে। সে ঠোঁট ফাঁক করা মাত্র রেবেকা চোখ টেপে। চত্বর ঘুরে বারান্দায় ওঠে। তারপর ভেজানো দরজা খুলে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। ফ্যানের সুইচ টিপে একটা জানালা খোলে। লালমাটির বাঁজা ডাঙার ওপর কয়েকটা খয়াটে তালগাছ।

হঠাৎ ক্লান্ত সে, শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে যায় কী এক অলসতায়। সার! আমি জানি, আপনি আমাকে কোনওদিনই একটা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে দেবেন না। কোনওদিনই না। কেন না, আপনিও অন্যরকম হয়ে গেছেন।…

৩

অ্যালার্ম আর বাজে না কেন না রেজিনার বারণ। তবু ঘুম প্রায় ঠিক সময়ে ভেঙে যায় সানুর। কোনও দিন দু-চার মিনিট বেশি বা কম। ঘুম ভাঙার পর সে পাশের টেবিলের দিকে তাকায়। ছোট্ট পুরনো ঘড়ি বলে, সানু ওঠ! কিন্তু কোনও কোনও দিন ওঠা সহজ হয় না। রেজিনা পাশ ফিরে তাকে আঁকড়ে

ধরে থাকে। সানুর বাহুতে তার শ্বাসপ্রশ্বাস এবং ঈষৎ কটু গন্ধ, রেজিনার চুল গলা বুকের বিদেশী পারফিউম সত্ত্বেও। সহসা তার নগ্ন স্তনের কোমলতা সানুর শরীরকে ঈষৎ জৈব করে ফেলে। একটু দ্বিধা, তারপর সে জৈবতাকে পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে নিজেকে আলাদা করে নেয়। উঠে বসার পর পায়ের দিকে কুঁকড়ে পড়ে থাকা বেডকভারটা টেনে সে রেজিনার বুকঅব্দি ঢেকে দেয়। আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় যায়।

মাটির বাড়ি মাটির পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় ঝাঁপালো বোগেনভিলিয়ার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে যায়, এর সঙ্গী রেবেকাদের বাড়িতে আছে। একসঙ্গে দুটো চারা কিনে এনেছিল রথের মেলা থেকে। তারপর কতগুলি বর্ষা কেটে গেল মনে নেই। বোগেনভিলিয়া বাড়তে বাড়তে স্যানিটারি ল্যাট্রিন আর ছোট্ট বাথরুম, এ বাড়িতে ইটের ঘর বলতে এটুকুই—যা তার শ্বশুর-সাহেবের নিজের তদারক ও টাকাকড়ি দিয়ে তৈরি, তার ছাদে মাথা কুটতে গেছে। ঈষৎ অন্যমনস্ক সে, বাথরুমের কাজ সেরে এবং তাড়াতাড়ি দাঁত ব্রাশ করে বেরিয়ে আসে। রেজিনার বাপের বাড়ি থেকে পাঠানো 'দাসী-বাঁদি মায়মুনা তখনও খিড়কির ওদিকে ডোবার পাড়ে ঝোপঝাড়ে কোথাও বসে আছে। কেন না, খিড়কির দরজাটা ভেজানো।

কেরোসিন কুকার জেবলে সানু কেটলি চাপায়। চা-বিস্কুট খাওয়ার আগেই মায়মুনা এসে যায়। ওই দ্যাখো! একটুকুন তর সয় না মিয়াঁর। আমি তো তকেতকে থাকি ভাই! সেই আজান শুনে উঠেছি। ঘাটে একদণ্ড দেরি করিয়ে দিলে। আবার কে? খোকামিয়াঁর বউ। কবে দালান দিচ্ছ তোমরা, কার টাকায় দিচ্ছ—ঝাঁটা মারো, চোখ টাটাচ্ছে সবার। টাটাক।

চা খেয়ে সানু প্যান্টশার্ট পরে সাইকেল বের করে আনে পাশের ঘর থেকে। আস্তে বলে, নানি! থলে দাও।

হাটবাজারে নাকি বড়ে-বড়ো খয়রা ওঠে। আজ এনোদিকি ভাই। মায়মুনা নড়ে ওঠে। ওই দ্যাখ! ভুলেই গেছি। সর্ষের তেল ফুরিয়েছে।

নিবারণবাবুর বাড়ি টিউশনি সেরে বাজার করে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশটা বেজে যায় সানুর। ফিরে দেখবে, তখনও রেজিনা শুয়ে আছে। কেন শুয়ে থাকে? রাতে কি তার ঘুম হয় না? সানু বুঝতে পারে না।

শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। মীরপাড়ার খন্ডহর আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাটির বা ইটের বাড়ির মাঝখান দিয়ে এই সংকীর্ণ রাস্তা জলকাদা প্যাচপেচে হয়ে আছে। এই পাড়াটা নিচু। রেবেকাদের পাড়ার মাটি উঁচু। তাই জল গড়িয়ে এসে সদর রাস্তার মোরামকেও পাঁক করে দিয়েছে। লালরঙের পাঁক। বাবুপাড়ার মোড়ের ট্যাপ কলে ভিড় ছিল। সাইকেলের চাকা জ্যাম। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে হল।

কী অবস্থা! নিবারণ রায় সানুর সাইকেল দেখে খুব হাসেন। খুব জব্দ হয়েছে। হও মাস্টার, আরও জব্দ হও। ভোলা চক্কোত্তি আলম মির্জারাও হোক। তবে ওদের গায়ে গণ্ডারের চামড়া। সেদিন বললাম, ক'হাঁপ্তা মোরাম দিয়েছ হে? বলে, রাস্তার দু'ধারে ড্রেন নেই। মাটি ধুয়ে এসে মোরামে পড়ছে তো কী করা যাবে! ও ঘুঁতু! মাস্টারের সাইকেলকে চান করিয়ে আন!

ঘুঁতু এলে সাইকেল থেকে থলে খুলে নেয় সানু। পা ধুতে হবে নিবারণদা!

তোমার ছাত্তরদুটোকে বলো, ভেতরে গিয়ে টিউবওয়েল টিপে দিক।

ও বাড়িতে সানুর গতিবিধি অবাধ। কারণ সে এ বাড়িতেও 'সার।' দুই ছাত্তর নান্তু-মান্তু এক বছরের ছোট-বড়। ক্লাস এইটে পড়ে। পালাক্রমে টিউবওয়েলের হাতল টানে তারা। তাদের মা দোতলার বারান্দা থেকে বলেন, কাল কী হয়েছিল সানু? এলে না যে!

হঠাৎ বাড়িতে কুটুম্ব এসেছিল বউদি! একা মানুষ। জানেন তো—

তোমার গাধা। তুমি পিটিয়ে ঘোড়া করো। সকালে কী অনাছিষ্টি বাধিয়েছিল জান?

দুই ভাই একসঙ্গে চেঁচায়, না স্যার! না স্যার! আমরা না।

রাধারানি নেমে এসে চাপা গলায় বলেন, একে তো বছরের পর বছর কুরু-পাণ্ডবের লড়াই চলেছে। সাতগণ্ডা মামলা ঝুলছে। আর এই দুই গাধা না বাঁদর কোন্ ফাঁকে ছাদে উঠে ঘুড়ি উড়িয়েছে। সেই ঘুড়ি গিয়ে আটকেছে ওদের অ্যান্টেনায়। রাধারানি পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তর্জনী তোলেন। তাই নিয়ে সাত-সকালে আরেক কুরুক্ষেত্র। মুখ দিয়ে যা এল তা-ই!

নান্তু-মান্তু হাঁউমাউ করে ওঠে, শ্যামলের ঘুড়ি! শ্যামলের ঘুড়ি!

চুপ! শ্যামলকে ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে দিলি কেন! রাধারানি আরও, আস্তে বলেন, গালমন্দ অকথা-কুকথা তো এ বাড়ি আসা অব্দি শুনে আসছি। কান করিনে। কিন্তু বলে কী জান? বাড়িতে মোছলমান ঢোকায়। তোরা ঢোকাস না? রাতদুপুর অব্দি কাদের নিয়ে মদ-মাতালের আসর বসে জানি না? বটঠাকুর আলমমির্জার ছেলের বিয়েতে খেয়ে আসেনি?

সানু একটু হাসে। জ্ঞাতিশত্রু সবচেয়ে বড় শত্রু বউদি! আমার বাবা অত শান্ত গোবেচারা মানুষ ছিলেন। খুড়তুতো ভাইয়ের একটা খারাপ কথায় স্ট্রোক হয়ে—বোবার শত্রু নেই অনেক ঠেকে বুঝেছি। আমি এ বাড়ি পড়াতে না এলেও কি খারাপ কথার অভাব হত? আচ্ছা বউদি, একটা স্বর্ণচাঁপার চারা কোথায় পাওয়া যাবে বলুন তো?

স্বর্ণচাঁপার একটা গাছ ছিল। তুমি দেখে থাকবে। সেবারকার ঝড়ে গোড়াসুদ্ধু ভেঙে মরে গেল। ওই দেখ, একটা কাঁটালিচাঁপা আছে। তলা খুঁজলে চারা পেতেও পার।

নাঃ। স্বর্ণচাঁপা। বউদি! আপনার বাড়ির সেই গন্ধরাজটা এখন বিশাল হয়েছে। অবিশ্বাস্য!

তাই বুঝি? তা তুমি টাউনে নার্সারিতে গেলে পেতে পার। কেন? রথের মেলার সময় মনে পড়েনি?

সানু কিছু বলে না। পাশেই খামারবাড়ির খলিয়ান। সেদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে নান্তু-মান্তুর পড়ার ঘরে যায়। ঘুঁতু সাইকেলটা স্নান করিয়ে খলিয়ানের মাঝখানে দাঁড় করাচ্ছিল। কালো মুখের সাদা দাঁতগুলি সারকে একবার দেখায় সে। খলিয়ান পিটিয়ে শক্ত করে গোবরজলের আস্তর দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন পরেই আগাম ফলনের ধান উঠবে। এঁরা ভুঁইহার ব্রাহ্মণ। স্থানীয় লোকে বলে পাছিমে বামুন। গরু-মোষ পোষেন। নিবারণ রায়ের বাবাকে ছেলেবেলায় গরুর গাড়ি হাঁকাতে দেখেছে সানু! তরুণ 'আবর' বলদকে গাড়ি টানার দীক্ষা দিতেন নিজের হাতে। একটা ইংরেজি বইয়ে সে অস্ট্রেলিয়ায় হর্সব্রেকিং বিষয়ে গল্প পড়েছিল। এটা বুলব্রেকিং। রাস্তায় ভিড় ও হইহট্টগোল হয়। পুনঃপুনঃ সতর্কতা ঘোষণা করা হয়।

পড়ানোর সময় তার জন্য কেনা আলাদা কাপ-প্লেটে চা নিয়ে আসেন রাধারানি। কিছুক্ষণ চৌকাঠের কাছে কপাটে হেলান দিয়ে কথাবার্তা বলেন। আজ প্লেটে নারকেলনাড়ু ছিল। সানু! তোমার বউয়ের জন্য নাড়ু দেব। নিয়ে যেও। একদিনও তো দেখাতে আনলে না কেমন বউ পেয়েছ! কেন? পরদা মানে বুঝি?

না, না। সে-সব নয় বউদি! সানু হাসে। বাড়িতেও আমাকে টিউশনি করতে হয়। খুব ফাঁকিবাজ মেয়ে।

পড়াশুনো কদ্দুর?

স্কুল ফাইনাল। তবে রেজাল্ট ভাল নয়। ভাবছি পরমেশ্বরীতে ইলেভেনে ভর্তি করে দেওয়া যায় কি না। নতুন হেডমিস্ট্রেস এসেছেন। খুব কড়া। অ্যাডমিশন টেস্ট না করিয়ে নাকি নিতে চান না।

তুমি নগেনকে ধরো! এক কথায় হয়ে যাবে। কালীপুজোর পর স্কুল খুলবে। কালীপুজো তো এসে গেল!

এই থেকে কাঁটালিয়াঘাটের কালীপুজোর সঙ্গে রাধারানির বাপের গাঁয়ের কালীপুজোর তুলনা এসে গেল। হুঁ! বলে আঠারপাড়া গ্রাম—উঁহুঁ, গ্রামনগরী! রাধারানি ব্যাঙ্গবিদ্রূপ করেন। এখানে হয় সতেরখানা ঠাকুর। আর বকড়াপাসিতে সাঁইত্রিশখানা। তোমার দিব্যি সানু! আগের দিনে

নরবলি হত। এখনও মোষবলি হয়—তবে সেটা দুর্গাপুজোয়। এরা গঙ্গার ধারে বাজি পোড়ায়। ছাত থেকে দেখেছি। বড়কাপাসিতে তোমাকে দু'কানে তুলো গুঁজতে হবে। চোখে কালো চশমা না পরলে—আকাশ জ্বলে যায় সানু!

নান্তু! ও কী করছ খাতায়? অঙ্কটা এমন কিছু কঠিন নয়। মান্তুর হল! কই দেখি।

ছেলেবেলায় শুনতাম, লোকেরা গাল দিত কাঁটালিয়াঘাটের মড়া বলে। সেই মড়ার জায়গা সেই শ্মশান-মশান আমার ভাগ্যে ছিল। একেবারে বাড়ির পাশেই ছিল। তোমার দাদা তো ব্যোমভোলা শিবঠাকুরটি। নান্তু-মান্তু বড় হোক। তারপর দেখবে যেদিকে দু'চোখ যায়—

কোন কোন সময় সানু সহসা এইভাবে বুঝতে পারে, কোনও মানুষই সুখী নয়। প্রত্যেকের মধ্যে রাখা আছে একেকরকম দুঃখের ঝাঁপি। ঝাঁপি খুলে কিছু আরাম পেতে চায়। বাইরে থেকে দেখলে পরে যা সমানুপাতিক, মসৃণ আর উজ্জ্বল মনে হয়, তা ভেতর থেকে দেখলে অসমানুপাতিক, রুক্ষ আর নিষ্প্রভ। কাঁটালিয়াঘাটকে বাইরে থেকে যেমন দেখা যায়। বোঝা যায় না তার ভেতর কত খণ্ডহর, নোনাধরা ইট, এঁদো ডোবার শ্যাওলাঢাকা আবিল জল, খাটা পায়খানার দুর্গন্ধ, নির্জন ঝোপে ঢাকা মাটি কিসের জোরে ঘন ঘাসে ঢাকা—এইসব। প্রকৃতি এগুলি আড়ালে রাখতে চায়। আর মানুষও তো প্রকৃতির একটা অংশ। মানুষেরও এই স্বভাব। খুশি-খুশি মুখ নিয়ে ঘোরো। বিদেশি পারফিউম ছড়াও শরীরে। ফুলের গাছ পোঁতো উঠোনে। স্বর্ণচাঁপার জন্য প্রতীক্ষা করো। প্রতীক্ষা করতে করতে শেষে ভুলে যাও। আমি জানি, আর তোমার মনে পড়বে না তুমি কী চেয়েছিলে।

বাহ্! ওয়েলডান মাই বয়! এবার এই দু'নম্বরটা দেখো। চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। মান্তু! তুমি তিন নম্বরটা।

জান সানু? আমি এত করে বলছি, এই ভিটে ছেড়ে ঘাটবাজারের দিকে বেশি নয়, অন্তত পাঁচ কাঠা জায়গা কোনো। একতলাই হোক না। দোতলার ভিতে একতলা উঠুক আগে। ভারি আমার দোতলা রে! কোন্ আদ্যিকালের মাল-মশলা। কড়িকাঠ থেকে রাতবিরেতে ঝরঝর করে চুনবালি খসে পড়ে। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তা ছাড়া বলতে নেই—একটা অপঘাত তো হয়েছিল? বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি স্বচক্ষে দেখেছি!

নিবারণ রায়ের প্রথম স্ত্রীর বাচ্চা হয়েই মারা পড়ত। শেষে মনের দুঃখে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে নিজেকে শাশুড়ির গঞ্জনা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তার বছরতিনেক পরে রাধারানি এ বাড়ির বউ হয়ে আসেন। ভানু বাগদির মা মীরপাড়ায় মাছ বেচতে যেত। ঘাটবাজারে বিক্রি না-হওয়া ঝড়তিপড়তি চুনো

মাছগুলি ফেরার পথে অগত্যা ধারে বেচতে হলে গফুর দর্জির বাড়ি তার বিশ্বাসযোগ্য ছিল। উঠোনে বসে ছোট রায়বাড়ির গপ্পগুলি সে বলত। ছেলের এত সাধ? ছেলে নিবি? তো এই নে—দুবছরে দুটো গো! বামুন-দিদির মুখে এখন কী হাসি, কী হাসি! আর কেমন দেখ, সতীলক্ষ্মী মেয়েটাকে উঠতে-বসতে দুবেলা—ভগোমান তুলে নিলেন! তবে এই বউটি মন্দ নয়কো। হেসেখেলে থাকে। একটু বেশি বকবক করে এই যা! কিন্তু দেখ, একজনের সুখ অপরজন দেখতে পারে না।

কুতুবপুর স্কুলের মৌলবিসাহেব এক টিফিনপিরিয়ডে বেহেশতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। হিন্দু সারেরা জানতে চেয়েছিলেন, কৌতূহল কিংবা কৌতুকে। সানু এক ফাঁকে বলে উঠেছিল, শুধু সুখ কি সুখ মৌলবিসাহেব? যদি দুঃখই না থাকে, কী করে তখন মানুষ বুঝবে এটা সুখ? আমার ধারণা, বেহেশতেও কিছু দুঃখ থাকে। মৌলবিসাহেব রেগে আগুন হয়ে বলেন, তুমি জাহেল—মুর্খ! তুমি নামাজ পড় না। রোজা রাখ না। তুমি বেহেশতের সুখের স্বাদ কী করে বুঝবে? অন্য সারেরা বলেন, না মৌলবিসায়েব! সানু একটা পয়েণ্ট তুলেছে। পণ্ডিতমশাই কী বলেন এ বিষয়ে? গঙ্গাধর ভট্টাচার্য গম্ভীরমুখে বলেন, তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। অর্থাৎ কি না আনন্দ থেকে ভূতগণ—এই ভূত সেই ভূত নয়—জন্মগ্রহণ করে। আনন্দ দ্বারাই বাঁচে এবং শেষে আনন্দে প্রতিগমনপূর্বক প্রবেশ করে। কারণ আনন্দই ব্রহ্ম। এটা কিন্তু গোড়ার কথা। পরে বললাম। বুঝুন তাহলে! মৌল-বিসাহেব কিছু বলার আগেই ইতিহাসের সার বলেন, এই ভূত সেই ভূত নয়, বললেন পণ্ডিতমশাই! কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই ভূত সেই ভূতই বটে। মানুষ নয়। সানু ইজ হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট কারেক্ট। আনন্দ যে সত্যিই আনন্দ, বুঝব কিসে? দুঃখটার খুব দরকার ছিল। কেন? ওই যে শ্লোকটা আছে পণ্ডিতমশাই! চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ—না কী যেন? না না! শাস্ত্রটাস্ত্র গোলমেলে ব্যাপার। কারণ মানুষই শাস্ত্র রচনা করেছে এবং মানুষের মধ্যে গোলমাল আছে বলেই শাস্ত্রে তার খানিকটা ছাপ পড়েছে। আনন্দ থাকলে দুঃখের থাকা স্বতঃসিদ্ধ। এই সময় টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়ে যায় এবং ঘণ্টা বেজেছিল। সানু ইতিহাসের স্যারকে বলেছিল, কিন্তু অমরদা, আমার মনে হয় এর বাইরে একটা ব্যাপার আছে। দুঃখ জীবনকে যতখানি এক্সপ্রেস করতে পারে, মিনিংফুল করে, আনন্দ কি তা পারে? করিডরে এইসব কথা হয় এবং অমর সিংহরায় তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, এত কমবয়সে তুমি দুঃখ দুঃখ কর কেন হে ছোকরা? কতটুকু দুঃখ তুমি দেখেছ? দেখ, দুঃখটুঃখকে যারা ফিলজফাইজ করে, তারা যেমন গাড়ল, আনন্দকে যারা

ফিলজফাইজ করে, তারা তেমনই গর্দভ। দুটোই রিয়্যালিটি। একই জিনিসের দু'পিঠ। এ নিয়ে উচ্চবাচ্য কিসের হে ?···

রাধারানি কাগজে মুড়ে নারকেলের নাড়ু নিয়ে আসেন। কালীপুজোর দিন বউকে সঙ্গে নিয়ে আসবে যেন। ছাতে উঠে বাজি পোড়ানো দেখব। হিন্দু-মোছলমান কি কারও গায়ে লেখা থাকে ? তবে ভাই, তোমাকে আমি মোছলমান গণ্য করি না। তোমার গলায় পৈতে দিলেই কার বাবার সাধ্যি চেনে তুমি মোছলমান ?

এই কথাগুলি আজীবন শোনা। বিয়ের পর বউ আর শ্যালিকাদের নিয়ে সানু টাউনে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। না—নিজে দেখতে যায়নি, ওদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। দোতলার ব্যালকনিতে সিট। তখনও ম্যাটিনি শো শেষ হয়নি। একদঙ্গল পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ভাব হতে বেশি সময় লাগে না। হঠাৎ রেজিনা বলল, আমি পানি খাব। অমনই সেই মেয়েগুলির কী আর্তনাদ ! এম্মা ! এরা মুচুলমান !

রেজিনার বড় বোন বি এ পাশ। মাদ্রাসার প্রাইমারি সেকশন মক্তবের টিচার। বি টি পড়ছে। রেগেমেগে খুব ইংরেজি ঝাড়তে গেল। সানু থামিয়ে দিয়েছিল। আপা ! ওঁরা কি ভুল বললেন বলুন ? আপনারা মুসলমান নন ? হ্যাঁ—উচ্চারণটা ওঁরা বিকৃত করেছেন তা ঠিক। কিন্তু আপনার ইংলিশ কি ঠেকাতে পারবে আপনি মুসলমান নন ? হিন্দু মেয়েগুলি, তারা নতুন প্রজন্মের সচ্ছল—উনোজমিতে দু-দুবার দুনো ফসল ফলানো কৃষক পরিবারের মেয়ে, সম্ভবত ইংরেজি শুনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সরে গিয়েছিল নিরাপদ দূরত্বে।···

দু'ঘণ্টার রোদ মোরামকে ঈষৎ শক্ত করতে পেরেছে। ঘাটবাজারে যাবার পথে পিচ পাওয়া যায়, যদিও খানাখন্দ হয়ে আছে এবং সেগুলি জলপূর্ণ তখনও। খয়রামাছ ওঠে বলেছিল মায়মুনা নানি। কোথায় খয়রামাছ ?

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে সর্ষের তেল কিনে ত্রিনয়নী দৈব ঔষধালয় পেরিয়ে গিয়ে সানু তোরাব ডাক্তারের লায়লা ফার্মেসির সামনে রেবেকার মুখোমুখি হয়। রেবেকা দেখেও না দেখার ভঙ্গিতে পা বাড়িয়েছিল। সানু ডাকে, রুবি !

তখন রেবেকা ঘোরে। তার হাতে ছাতি ছিল ! বাজার করলেন স্যার ?

তোমার আব্বুর অসুখ বেড়েছে নাকি ?

জি। গত রাত থেকে—

সানু একটু হাসে। তুমি জি-টি বললে অদ্ভুত লাগে রুবি।

আজ্ঞে বলব ? বেশ। বলব।

চলো ! কথা বলতে বলতে যাই।

আমাকে শিগগির যেতে হবে স্যার! শর্টকার্ট করব কাজিপাড়া দিয়ে।

আমিও শর্টকাট করি।

কাজিপাড়ার রাস্তায় প্রচুর কাদা স্যার! এই দেখুন। পা ধুয়ে তবে—

তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ কেন রুবি?

স্যার! আমি কেন অ্যাভয়েড করব আপনাকে? পারি? বরং আপনিই তো আমাকে—

না। সানু শিক্ষকের কণ্ঠস্বরে বলে, নেভার। চাচাজি হঠাৎ আমাকে টিউশনি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চাচাজি একটা এক্সপ্ল্যানেশন দিয়েছেন অবশ্যি। তবে ছাড়ানোর সময় হয় তো ওঁর অন্য চিন্তা ছিল। সম্ভবত আমার ধারণা ভুল নয়।

রুবি হেসে ওঠে। স্যার। আপনি কিন্তু ঝগড়ার টোনে কথা বলছেন। লোক জড়ো হবে।

সানু আস্তে বলে, সরি রুবি! তোমার সঙ্গে আমার কিসের ঝগড়া হতে পারে? তুমি আমার ছাত্রী ছিলে।

ছিলাম। এখন তো আর নই স্যার!

নও। তবু আমাকে তুমি স্যার বল। বলছ। তাই না?

ভিড়ের মধ্যে তারা একলা ছিল। ভিড়ে কত মানুষ কত মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। তর্ক করছে। কী নিয়ে হাসাহাসি করছে। সানু সাইকেল পিচ রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে বলে, চলো! তোমার শর্টকাটে ডিসট্যান্স তত কিছু কমবে না। আমারও তাড়া আছে।

রেবেকা একটু বিব্রত বোধ করছিল। সহসা স্মার্ট হয়ে ওঠে। স্যার! আপনি কিন্তু ছাতি নেননি। বৃষ্টি এলে আমি আপনার মাথা বাঁচাতে পারব না। ছাতিটা ছোট্ট।

সানু এই কথায় জোরে হেসে ওঠে। অর্থাৎ তুমি যেহেতু আর আমার ছাত্রী নও, আমার জন্য নিজেকে স্যাক্রিফায়েস করতে পারবে না। এই তো?

না স্যার! আজ যদি ভিজি, আম্মি বলেছেন, আস্ত ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেবেন। কাল সকালে খুব ভিজেছিলাম। তারপর একঘণ্টা ধরে চান করলাম। আব্বুর অসুখ তো বৃষ্টিতে ভিজেই বেড়ে গেছে।

মামুজি চলে গেছেন?

না। যাবেন কী করে? আব্বুর যা অবস্থা।

তুমি সিরিয়াসলি বলছ, না জোক করছ রুবি?

না স্যার! জোক করতে পারি আপনার সঙ্গে?

পিচরাস্তার এখানে দু'ধারে ঠাসাঠাসি দোকানপাট। একটার পর একটা বাম্প। বছর দশেক আগেও এখানে দু'ধারে ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্বরলিপিবৎ

শ্রেণীবদ্ধ উঁচু-উঁচু গাছ ছিল। নির্জনতা ছিল। গাছগুলি একটার পর একটা শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং ক্রমে পূর্ত দপ্তরের লোকেরা গায়ে রঙিন নম্বর এঁকে যেত। জনৈক আগসওয়াল সম্পর্কে জনরব, তিনি একরকম লাক্ষাপোকা ছড়িয়েছিলেন এবং ক্রমশ পোকাগুলি গাছ থেকে গাছে সংক্রামিত হয়। গাছ-গুলি নিষ্পত্র কঙ্কাল হতে থাকে। আবছা ধরনের রাজনীতির প্রাদুর্ভাব শেষাবধি সেই ভদ্রলোককে ভয় পাইয়ে দেয়। তিনি কেটে পড়ার পর টেন্ডার-জেতা কন্ট্রাক্টাররা কঙ্কালগুলি তুলে নিয়ে যায়। 'পরিবেশ' কথাটি তখনও খবরের কাগজের বিষয় ছিল না। কিন্তু 'বনমহোৎসব', 'বনসৃজন প্রকল্প' এগুলি কাঁটালিয়াঘাট অঞ্চলে জুলাই মাসের সরকারি পালাপার্বণ এবং আরও বিশ-পঁচিশ বছরের পুরনো। ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল, ক্লাব, আঞ্চলিক পাঠাগার আর পঞ্চায়েত যাতে সাজো-সাজো রব তোলে, এইমত যোগসাজশ ছিল। বনদপ্তর কলোনিপাড়ার কাছে একর তিনেক ভেস্টেড মাটি কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে গাছপালায় সূতিকাগার করেছে। কিন্তু সেটা সান্ত্বনা নয় তাদের কাছে, যারা স্টেশন রোডের বৃক্ষগুলিকে স্মরণ করে এবং ব্যথিত হয়। সকলেই কি হয়? কেউ-কেউ হয়। ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্বরলিপির পাতা খুঁজতে গিয়ে জোরে শ্বাস ছাড়ে।

স্যার! স্যার!

উঁ?

ট্রাকটা আপনার প্যান্ট নোংরা করে দিয়ে গেল।

সানু মুখ তুলে তাকায়। রেবেকা একটু দূরে সরে গেছে। তারপর সানু নিজের প্যান্টটা দেখে নেয়। একটু পরে তার গম্ভীর মুখে হাসি ফোটে। তুমি নিজেকে বাঁচাতে শিখেছ। আমি শিখিনি।

আপনি কিছু ভাবছিলেন! তাই না স্যার?

এ বেলা সময় হবে না। বিকেলে চাচাজিকে দেখে আসব। মামুজিকে বোলো। কেমন?

এরপর কিছুক্ষণ নির্জনতা। স্টেশন রোড স্টেশনের দিকে ঘুরে গেছে। পিচ রাস্তা চওড়া হয়ে সোজা চলে গেছে রেল ব্রিজের তলা দিয়ে কুতুবপুরের দিকে। বাঁদিকে পঞ্চায়েতি মোরাম। আঞ্চলিক টার্মে এটা 'তেমাথা'। মধ্যিখানে চৌকো উঁচু বেদির ওপর কালো হয়ে 'বিদ্রোহী কবি' দাঁড়িয়ে আছেন। আর কয়েকজন রিকশওয়ালা। তারাও প্রতিমূর্তির মত নিস্পন্দ ছিল।

স্যার! নজরুল-জয়ন্তীতে আপনাকে দেখিনি। ছিলেন না?

সানু জোরে হেসে ওঠে। আরে! সেদিন কুতুবপুর স্কুলেও নজরুল-জয়ন্তী ছিল। তুমি কবিতা পড়নি?

পড়তে হয়েছিল। আব্বু প্রেসিডেন্ট ছিলেন সভায়। একটু পরে রেবেকা ফের বলে, আমি জানতাম না আপনার বিয়ে হয়েছে কুতুবপুরে।

চাকরি বলো! চাকরি বললে ফুল এক্সপ্ল্যানেশন পাওয়া যাবে।

বিয়ের সঙ্গে চাকরির সম্পর্কে কী স্যার?

ছিল। তুমি বুঝবে না। রুবি, তুমি পড়াশুনো ছাড়লে কেন?

বললে আপনিও বুঝবেন না স্যার!

বুঝব না কেন? যদি বুঝিয়ে বল—

যা আমি নিজেই বুঝিনি, তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয়। ছবি বলত, আমি খুব মিথ্যুক। জানেন স্যার? একবার আমি দাদাপীরের দরগায় খড়মের শব্দ শুনেছিলাম। ছবি আমার চুল খামচে ধরে—সে কী রাগ স্যার! রেবেকা খুব হাসে। ছবির আগরবাতি-মানতের গল্পটা বলতে থাকে সে।

সানু হঠাৎ ঘড়ি দেখে বলে, এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার রুবি!

কী সার?

যখন এই সাইকেলটা ছিল না, তখন ডিসট্যান্সের বোধটা ছিল না। ঘাটবাজারে তোমাকে তখন বলছিলাম, শর্টকাটে ততবেশি ডিসট্যান্স কমবে না। কিন্তু এখন হাটতে হাঁটতে দেখছি তোমাদের দরগাপাড়া ঘাটবাজার থেকে সত্যিই বেশ দূরে। আশ্চর্য!

আপনি সাইকেলে চাপুন স্যার। আমি এটুকু পথ দু-তিনমিনিটেই পেরিয়ে যাব।

তোমার একটা সাইকেল ছিল। কী হল সেটা?

আপনি ভুলে গেছেন স্যার! ক্লাশ টেনের সময় চেনে কাপড় জড়িয়ে—শেষে আব্বু সাইকেলটা কালোভাইকে দিলেন। কালোভাই ব্যাকসিটে আব্বুকে বসিয়ে ঘাটবাজারে নিয়ে যেত। এখন আর আব্বু ব্যাকসিটে বসতে পারেন না। সাইকেলটা কালোভাই দখল করে নিয়েছে! তবে স্যার, হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে।

রুবি! কিছু মনে কর না। একটু দেরি হয়ে গেল! আসলে ডিসট্যান্সটার কথা আমার মাথায় ছিল না। আমি যাই। কেমন?

আমি তো বলছি আপনি—

সানু সাইকেলে চেপে বলে, ওবেলা চাচাজিকে দেখতে যাব। মামুজিকে বোলো যেন!

রেবেকা একটু দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখছিল, বাঁকের মুখে একবার মুখ ঘুরিয়ে সানু দেখত পায়। এভাবে মুখ ঘোরানোর জন্য তার সাইকেল একটু টাল খেয়েছিল। রেবেকাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় আজ

তার সাইকেল অলস হয়ে পড়েনি। বাড়িটা তার চোখের কোনা দিয়ে পিছলে গিয়েছিল।

মীরপাড়ায় ঢোকার সময় তার চিন্তা হয়, এ কি তার পালিয়ে আসা? রেবেকাকে মাঝপথে ফেলে রেখে এভাবে চলে আসা উচিত ছিল না। মোটেও উচিত ছিল না। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। খুবই অন্যায়!

রেজিনা উঠে পড়েছে। ম্যাক্সি পরে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছে। সানুর সাইকেলের অবস্থা দেখে এবং প্যান্টের কাদা দেখে সে বলে, আছাড় খেয়েছিলে? বাজারের থলেটা দেখ তো নানি! কাদা লেগে থাকলে সব সারগাদায় ফেলে দিয় এস! মীরপাড়ার গু-মুত ধোয়া পানির কাদা।

সানু থলেটা হ্যাণ্ডেল থেকে বের করে মায়মুনাকে দেয়। তার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সে সাইকেলটা টিউবওয়েলেয় কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে আসে।

সে বারান্দায় ওঠার সময় রোজিনা বলে, দাঁড়াও! লুঙ্গি এনে দিচ্ছি বাথরুমে গিয়ে কাপড় বদলে এসো আগে। সাবান দিয়ে রগড়ে হাত-পা ধোবে। নানি! থলেটা দেখি!

মায়মুনা ফোগলা মুখে হাসে। না গো, না! থলে পোস্কের আছে। পথটুকুন নাবাল মাটি! পানি বর্ষালে কাদা হবে না?

সানু লুঙ্গি হাতে নিয়ে বলে, দেখো নানি! কাগজে নারকেলের নাড়ু মোড়া আছে।

সে বাথরুমে লুঙ্গি রেখে এসে বালতিতে টিউবওয়েলের জল ভরে। সাইকেল ধুতে থাকে। রেজিনা বলে, রাজমিস্ত্রি এসেছিল। বলে গেল, এখন ভিতখোঁড়া ঠিক হবে না। কালীপুজোটা যাক। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে আব্বাকে জানিয়ে রেখো। আব্বা এসে দাঁড়িয়ে থেকে সব কাজ করাবেন।

সানু চুপচাপ সাইকেল সাফ করে বাথরুমে ঢোকে। প্যান্ট-শার্ট ওয়াশিং পাউডারে ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় উঠে বলে, নিরাণদার বউ তোমার জন্য নারকেলনাড়ু দিলেন। কালীপুজোর দিন যেতে বললেন তোমাকে নিয়ে! ছাতে উঠে বাজি পোড়ানো দেখার নিমন্ত্রণ—বউদি খুব লিবার‍্যাল কিন্তু! গেলেই দেখবে!

এম্মা! এরা যে মুচুলমান! রোজিনা বাঁকা হাসি হাসে! ফের ক্যারিকেচার করে, মু-উ-চুল্‌মান!

কথাটা তুমি ভুলতে পারনি দেখছি। রিজু! মানুষের মূঢ়তাকে ক্ষমা করতে শেখো!

সার-গিরি ফলিও না আমার কাছে।

রিজু! আমি শুনেছি, মুসলমানরাও হেঁদু-মেঁদু এইসব বলে। নেওয়াজমিয়াঁর নাতি বাংলাদেশে থাকে। সে বলছিল, ওখানকার মুসলমানরা 'হিন্দু'-ও বলে না। 'মালাউন' বলে। এই আরবি কথাটার মূল মানে অভিশপ্ত। কিন্তু তাদের বাইরেও মানুষ আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি! তারা হিন্দু-মুসলমান নিয়ে চিন্তা করে না।

লেকচার ঝেড়ো না। নানি! সারকে নাশতা দিয়ে যাও।

সার বলছ যে?

সারকে সার বলব না?

মায়মুনা চিনেমাটির থালায় পরোটা, সুজি, টুবু-আণ্ডা (এগপোচ) আর রাতের কষা গোশত নিয়ে আসে। স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে সেই নারকলে নাড়ুগুলিও ছিল। ধরো ভাই! পানির জগ আর গেলাস নিয়ে আসি।

সানু বলে, এখানে আনলে কেন? রান্নাঘরে গিয়ে খেতাম?

আমার নাতনির সামনে বসে খাও আজ। দেখুক, তার দামাঁদমিয়াঁ কত্তটুকুন খায়।

সানু নারকেলনাড়ুর বাটিটা রেজিয়াকে দিতে হাত বাড়ায়। রেজিনা বলে, তোমার বউদির নাড়ু তুমিই খাও। আমার ও সব ভাল্লাগে না।

কী আশ্চর্য ময়রার দোকানের মিষ্টি তো খাও! না খাও না?

রেজিনা রেগে ওঠে। আমি তা বলিনি!

তবে কী বলছ?

সে চড়া গলায় বলে, আমার ভল্লাগে না!

সানু চুপ করে যায়। মায়মুনা জল আনলে সে হাত ধুয়ে নিয়ে পরোটা কুচি করে মুখে ঢোকায়। ঝলমলে রোদে চারদিক শব্দহীন হাসি হয়ে আছে। আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। বোগেনভিলিয়ার ঝাঁপি সাবধান পেরিয়ে যাচ্ছে একটা ছোট্ট বেড়াল। কাপড় শুকোনোর তারে একজোড়া দোয়েল বসেই উড়ে চলে গেল। উঠোনের কোণে তালগাছের মাথায় কখন থেকে ঘুঘু ডাকছে। ফজল মীরের ঘরের টিনের চালে একঝাঁক পায়রা।

রিজু! চলো পড়তে বসবে।

আজ আমার কিছু ভাল্লাগে না। কতবার বলব?

কেন? হঠাৎ কী হল তোমার রিজু?

শোনো! তোমাকে টিউশনি ছাড়তে হবে।

সে কী! কেন?

আমার আব্বার প্রেসটিজ নেই? কেন এখনও তুমি টিউশনি করবে? কত টাকা পাও তুমি?

আহা, টাকাটা কথা নয়। সকালবেলাটা ফ্রি থাকি। তুমি দৌরতে ওঠ। তা ছাড়া—

না। তুমি আর টিউশনি করবে না। তোমার কিসের অভাব? মাসে অতগুলো টাকা মাইনে পাচ্ছ। এদিকে আম্মা মাসে-মাসে সরু চাল, ঘি, কত কিছু পাঠিয়ে দেন। আব্বা নিজের চিমনিভাটা থেকে দশ হাজার ইট পাঠিয়ে দিলেন। আরও দশ হাজার এসে যাবে। তুমি কাল থেকে টিউশনিতে যাবে না বলে দিচ্ছি!

সানু হাসবার চেষ্টা করে। কী যা-তা বলছ? হঠাৎ টিউশনি ছাড়লে দুটো ছেলের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে না? একটু ভেবে বল রিজু। জাস্ট ফর একজাম্পল বলছি। খোন্দকারচাচাজির ছোট মেয়ে স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিল। ক্লাশ এইট থেকে পড়াতাম আমার পড়ানো বন্ধ হল। ব্যস! টুয়েলভে গিয়ে তারও পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল। দেখলে কষ্ট হয়।

তার জন্য কষ্ট তো হবেই। রেজিনা ভুরু কুঁচকে হাসে। তবে তোমার নিবারণবাবুর ছেলেদুটোর জন্য কষ্ট হবে না। আমাকে বোঝাতে এস না। আমি অনেক বুঝি। বুঝতে বুঝতে এত বড় হয়েছি।

কী বোঝ? সানু মনেমনে বিরক্ত হয়ে বলে। শিক্ষা জিনিসটা অপরকে দান করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, রিজু! সেই জন্য অত স্ট্রাগলের মধ্যেও আমি কখনও হেরে যাইনি।

তোমার লেকচার আমি শুনব না। রেজিনা উঠে দাঁড়ায়। ঘরে ঢোকার সময় তার সুরভিত ফিনফিনে বিদেশি ম্যাক্সি ইচ্ছে করেই সানুর একটা বাহুতে ঘষে দিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে শাড়ি পরতে পরতে সে ফের বলে, কষ্ট! একটা ব্যাড ক্যারেকটার মেয়ে বেপরদা হয়ে পাড়ায়-পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়! তার জন্য কষ্ট! শাড়ি পারার পর সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে। তার কথা থামে না। তার মামুজি না টামুজি এসে নিজের মুখে বলে গেল—আমাকে নেকি ভেবেছে? অ্যাদ্দিন আসা অব্দি কতজনের কাছে কত কথা শুনেছি। বলিনি তা-ই! কুতুবপুর হলে মসজিদের জামাতে পর্যন্ত কথা উঠত। এখানে যে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ আর হাজারটা জামাত।

সানু চুপচাপ খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে যায়! মায়মুনা চুপিচুপি বলে, আজ আবার খেপল কেন গো?

জানি না। বলে সানু উঠোনে তার সাইকেলের কাছে চলে আসে। টালির চালের কোণ ঘেঁষে বাঁধা লম্বা বাঁশের মাথায় টিভি-র অ্যান্টেনা রোদে ধু ধু সাদা। একটা পায়রা ফজল মীরের টিনের চাল থেকে উড়ে এসে

অ্যান্টেনা ছুঁয়ে চলে গেল।

একটু দ্বিধার পর সানু বারান্দায় ফিরে যায়। আস্তে বলে, পড়বে চলো!

রেজিনা কথা বলে না। ভি সি আরে একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে রিউইন্ডের বোতাম টিপে দেয়। তারপর খাটে বসে রিমোট তাক করে থাকে।

সানু হাসিমুখে বলে, কী ছবি?

মুখে থাপ্পড় মারার মত রেজিনা বলে ওঠে, ছবি নয়, তার ছোটবোন। কী যেন নাম—রুবি!

ছিঃ রিজু! তুমি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ। বলে সানু ঘরে ঢোকে। খাটের মশারি-স্ট্যান্ডে ঝোলানো প্যান্ট আর আলনা থেকে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো একটা শার্ট টেনে নেয়। তার ভেতর প্রচণ্ড ঝড় বইছিল। কিন্তু সে শান্ত।

রেজিনা আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকে বলে, উঃ। বড্ড লেগেছে। কাটাঘায়ে নুনের ছিটে। এখন জ্বলতে জ্বলতে ছুটে যাওয়া হচ্ছে। যাও না! খোন্দকার সেবার শুধু মুখের কথা দিয়ে বাড়িছাড়া করেছিল। এবার অবশ্যি মামুজি না টামুজি কে একজন আছে। লম্বাচওড়া লোক। দ্যাখো গিয়ে, তার পকেটে ঢুকতে পার নাকি। তা আইবুড়ি ব্যাডক্যারেক্টার ভাগনির যদি একটা হিল্লে হয়। কিন্তু কুতুবপুরের মীরের বাড়ির মেয়েরা সতীনের সঙ্গে ঘর করে না! এটাও মনে রেখো!

সানু ভাবছিল, মামুজির মত অট্টহাসি হেসে এই উদ্ভট হযবরলকে উড়িয়ে দেবে এবং তার ভেতরকার ঝড়টা এইভাবে বেরিয়ে তাকে স্বাভাবিক করে তুলবে কিন্তু এই মুহূর্তটা এত নতুন যে, সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্যান্ট-শার্ট পরার পর সে শান্তভাবে বলে, তোমার কথাগুলোর মানে আমার কাছে অন্যরকম, রিজু! আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে ভীষণ-ভীষণ ভালবাস! কেন না, কোনও বিবাহিতা মেয়ের মুখে এ ধরনের কথাবার্তা তার স্বামীকে নিজের—একান্তভাবে নিজের প্রপার্টি মনে না করলে বেরোয় না। এতে আমি কিন্তু খুবই খুশি রিজু! এই যে তুমি আমাকে কোন ব্যাড-ক্যারেক্টার মেয়ের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছ, এটা তোমার নিখাদ ভালবাসার পরিচয়।

রেজিনা চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি ঠাট্টা করবে না বলে দিচ্ছি।

ঠাট্টা-তামাশা নয়। সিরিয়াসলি বলছি! তবে কুতুবপুরের মীরের মেয়েরা যেমন সতীনের সঙ্গে ঘর করে না, তেমনই কাঁটালিয়াঘাটের এই মীরের বাড়ির ছেলে একই সঙ্গে দুটো মেয়েকে ভালবাসতে পারে না।

পারে না বলেই তো বলছি! রেজিনার মুখের গড়নে ঈষৎ পুরুষালি ছাপ আছে। সেটা বেঁকেচুরে যাচ্ছিল। ভালবাসা দেখাচ্ছে! ভা-লো-বা-

সা ! যেন আমার সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয়েছে। তুমি কাকে বিয়ে করেছ, সত্যি করে বল তো শুনি ? আমাকে, না স্কুলমাস্টারের চাকরিকে ?

সানু বিপন্ন বোধ করে। এই খোঁচাটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। নতুন যা, সেটা রেবেকা বিষয়ে। এটাই ভয়াবহ আর অসহ্য আঘাত। সে জানত না, কাঁঠালিয়াঘাটে তাকে এবং রেবেকাকে নিয়ে এ রকম একটা গোপন কথা চালু আছে। কেউ তাকে বলেনি। একটুকু আভাসও সে পায়নি কোথাও। সহসা আজ কেন তা রেজিনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ? অতর্কিতে পায়ের সামনে ফণা তোলা একটা সাপ। ফণাটা দুলছে। সানু শক্ত হয়ে কয়েক-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। মবিন খোন্দকার কি এমন কোনও আভাস পেয়েই হঠাৎ তার টিউশনি, বন্ধ করে দিয়েছিলেন ? তা হলে তাঁর স্ত্রীরও জানার কথা কিন্তু তেমন কোনও আভাস তাঁর কাছেও পায়নি সে।

তারপর তো প্রায় দুটো বছর কেটে গেছে। সেদিন বিকেলে খোন্দকারের স্ত্রী তাকে ডেকে পাঠালেন। রেবেকা সম্পর্কে কত কথাবার্তা বললেন। আগের মতই সবটা স্বাভাবিক আর স্বচ্ছন্দ ছিল। আর মামুজির অকপট ঘোষণা, যা খুবই স্পষ্ট ছিল, 'সানু, তুই যদি আরও কিছুদিন কষ্ট করতে পারতিস'—

এতক্ষণে মামুজির ঘোষণাটির অন্যরকম একটা মানে বেরিয়ে আসছে ! খোন্দকারদম্পতি বিবাহিত সানুকে নিরাপদ ভাবতেই পারেন। কিন্তু মামুজির মুখ দিয়ে বিস্ময়কর একটা কথা বেরিয়ে এসেছিল। সানু ইচ্ছে করেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে। বলে, তোমার এইসব খবরের সোর্স কে রিজু ? তুমি তো বাইরে বেরোও না। কারও সঙ্গে ততকিছু মিশতে দেখি না। অবশ্যি খিড়কির ঘাট নাকি 'মেয়েদের গেজেট' বলে একটা পুরনো প্রবচন চালু আছে। পানির ওপর দিয়ে এক খিড়কির ঘাট থেকে অন্য সব খিড়কির ঘাটে কথা চালাচালি হয়। নাহ্—নানি কোনও উড়োকথা কুড়িয়ে আনার মানুষ নয়। কোন সাথে-পাঁচে থাকে না। তোমার সোর্স কে বা কারা ?

রেজিনা গলার ভেতর বলে, কিছু চাপা থাকে না।

থাকে না। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন চাপা কথা বেরিয়ে এল বলবে ?

সরে দাঁড়াও। ক্যাসেটটা দেখতে দাও।

সানু ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। উঠোনে নেমে বলে, নানি ! আমি ঘাটবাজারে যাচ্ছি।

মায়মুনা বলে, এই তো এলে গো সেখান থেকে। আবার কী হল ?

একটা কাজ ছিল। ভুলে গিয়েছিলাম।

সানু সাইকেল নেয় না। খন্ডহর এবং অলিগলি দিয়ে হেঁটে সদররাস্তায়

ওঠে। একটু ভেবে নিয়ে সে দরগাপাড়ার দিকে হাঁটতে থাকে। মবিন খোন্দকারের বাড়ি পেরিয়ে যাওয়ার সময় বাড়িটার দিকে তাকাতে তার ভয় করে। দাদাপীরের দরগার পাশ দিয়ে হেঁটে কাজিপাড়ায় ঢোকে। হাবল কাজির বাড়ির সামনে গিয়ে গেটের ফাঁক দিয়ে সে একটা গাড়ি দেখতে পায়। মিনিআপা এসেছে তা হলে।

স্মৃতি তাকে অন্যমনস্ক করেছিল। কিন্তু আজ আর তার পিছু ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। কাজিপাড়ার শেষ দিকটায় বাঁশবনের ধারে কঞ্চিহাতে এক বৃদ্ধা কাকে শাসাচ্ছিলেন। সানুকে দেখে তিনি বলেন, রোজ-রোজ এমনি করে ছাগল ছেড়ে দেবে, আর আমার ওপর এসে জুলুম করবে। কেউ কখনও শুনেছ, ছাগলে বেগুন কামড়ে খায়? আবার বলতে গেলে বলে কী, পাঁচিল তুলে দাও না কেন?

মামিজি, কেমন আছেন আপনি?

চোখে সোজে না। কে বাবা?

আমি সানু, মামিজি!

ও! সানু? তোমাকে দেখতে পাইনে কেন বাবা?

সানু কদমবুসি করছিল। বৃদ্ধা তা গ্রাহ্য করেন না। তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যান। শুকনো তালপাতা, খেজুরপাতা আর ডালপালা দিয়ে ঘেরা একটুকরো উঠোন। ছোট্ট একটা ঘর। খড়ের চাল। দাওয়ায় উনুন। বৃদ্ধা তাকে কয়েকটি জাঁকালো বেগুনগাছের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন, তুমি নিজের চোখে দেখ বাবা! সপ্তায় এককিলো করে বেগুন ফলে।

উঠোনের মাচানে শশা, শিম, পুঁইশাক এইসব এলোমেলো পণ্যের শ্যামলতা। খড়ের চালে চালকুমড়ো। কুলগাছে লাউ ঝুলছে। বৃদ্ধা বলেন, দেখলে তো? কী রাক্ষুসে ছাগল বাবা! কখন এসে মরিচ পর্যন্ত 'ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে যায়!'

দরজার আগড়টা আরও একটু উঁচু করতে হবে মামিজি!

বৃদ্ধা গ্রাহ্য করেন না। সানুর হাতটা মুঠোয় চেপে ধরে বলেন, শহিদুলের চিঠি এসেছে গতমাসে। পিওন পড়ে শোনাল। গেঁদুমিয়াঁর হাতে একহাজার টাকা পাঠিয়েছে। কেমন লোক দেখ গেঁদুমিয়াঁ। একে-ওকে দিয়ে খবর পাঠাই। সে এসে বলে, বাড়িতে নেই। খোদা কানা গো! খোদার চোখ নেই।

আমি গেঁদুমিয়াঁকে বলব মামিজি! কিন্তু আপনি শহিদুলের কাছে গিয়ে থাকলেই তো পারেন! এ বয়সে কষ্ট করে এইভাবে—

গতবছর নিয়ে গিয়েছিল না শহিদুল? পাসপোর্ট ভিসা করে—বাবা!

বাঙালমুলুকে আমি থাকতে পারি ? কেমন সব কথাবার্তা। আবার শহিদুলের বউও বাঙাল। কী রকম কথাবার্তা বলে। কানে বাজে। দিনরাত্তির নীচের রাস্তায় আওয়াজ হইহট্টগোল। কানের পরদা ফেটে যায়। বললাম, তোর পায়ে পড়ি বাবা। আমাকে রেখে আয়। সানু! একটা শশা খাও। নিজের হাতে পেড়ে নাও। আমার চোখে সোজে না।

পরে একদিন এসে খাব মামিজি !

মঞ্জুলা বেগম সাদা থানের আঁচলে চোখ মোছেন। সে তো তাড়ি মদ গাঁজা ভাঙ খেতে খেতে কলজে ফেটে কবরে গিয়ে শুল। আমি ভিটে আগলাচ্ছি। সানু, তুমি বিয়ে করেছ—কে যেন বলছিল। খুব বড়লোকের মেয়ে। ভাল করেছ বাবা! খোন্দ্‌কারের যা গুমোর! মেয়েটারও নাকি চালচলন ভাল নয়। খোন্দ্‌কারের ঘরে না ঢুকে ভাল করেছ।

গেঁদুমিয়াঁকে আমি বলব মামিজি ! চলি।

সানু জোরে বেরিয়ে আসে। সাইকেল! শুওরের বাচ্চা তার সাইকেল তাকে এতদিন কিছু শুনতে দেয়নি। পিঠে পক্ষিরাজের মত চাপিয়ে উড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছি। কাঁটালিয়াঘাটের অলিতে-গলিতে এতসব গোপন কথা জমা ছিল সে জানত না।

বিভ্রান্ত সে, কোথায় যাবে ভেবে কোথয় যায়। আর পুনঃ পুনঃ পিছনে কণ্ঠস্বর, 'আচ্ছা স্যার, আমাকে একঠা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে দেবেন' তাকে থামিয়ে দেয়।

এত দেরি করে তুমি স্বর্ণচাঁপার চারা চাইলে কেন ? সেই চাঁপাগাছের ফুল ফুটতে কতবছর লেগে যাবে, ভাবলে না ? ততদিনে কি তোমার ফুল বিষয়ে চিন্তার সময় থাকবে ? থাকবে না। থাকে না···

৪

···দুই ভাই ছিল। আসরের নামাজের খানিক বাদে আসত। নওয়াজদের দেউড়ির সামনে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে যেত। দু'বিঘে পীরান জমির বন্দোবস্ত। তাই ওই কথাটা, খাজনার চেয়ে বাজনা বড়। এদিকে নওয়াজের পীরান জমি তিনশ বিঘে। তাই নিয়ে সাত ভাই পাঁচ বোনের কাড়াকাড়ি। খোন্দ্‌কাররা এক শরিক হাবলের আব্বাও এক শরিক।

'বড়মার শতরঞ্জির ওপর মিনি বেগম দামি গালিচা বিছিয়ে দিতে দিতে এইসব কথা শুনছিলেন। হাজারবার, সেই ছেলেবেলা থেকে শোনা কথা, যা ইতিহাস—মিনি যাকে 'হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড' বলেন।

…দুই ভাই, বায়েনপাড়ায় বাড়ি। খগেন আর লগেন। কী বাজনা, কী বাজনা! আমরা সব্বাই তখন ঘোমটা দিতাম—আজান কানে এলে যেমন দিতে হয়। দাদাপীরের উরসশরিফে মেলা বসত। একেক বছর একেক শরিকের পালা। পরে মামলা-মোকদ্দমা বেধে গেল। লাঠালাঠি একেবারে। শেখপাড়ার জমিরুদ্দিন লাঠি ধরলে ঠেকায় কে? নওয়াজের আব্বার ডানহাত ছিল। নওয়াজের আব্বার শাদির সময় আমি সবে কোরানশরিফের আমপারা খতম করেছি। নাপতানি ছিল তরুবালা। নতুন বউ-বিবিকে আলতা-সিঁদুর পরাতে এসেছে।

বড়মা জড়ানো গলায় তরুবালার গান গেয়ে ওঠেন।

…'এ তো বড়ো দায় বন্দু এ তো বড়ো দায়
এ রাঙ্গা চরণ আমি থুইব কোথায়
মস্তোকে থুইলে পরে উকুনে ডংশায়
বিরিক্ষে থুইলে ভোমোর গুনগুনায়
শতেক ভাবিয়া শেষে দেব নারায়ণ
বোক্ষের উপরে চরণ করেন থাপন ॥'

…এটা আলতা পরানো গান। নাপতানি নতুন বউবিবিকে ধন্দের জবাব চাইলে, 'দিই তো পরপুরুষকে দিই। দিই তো পথে-ঘাটে দিই। তুমি আমার আমি তোমার। তোমায় দোব কী'… বড়মা দুলে দুলে হাসেন। নতুন বউবিবি পারলে না। হাফিজা বলে দিলে, ঘোমটা! ছাঁদনাতলায় কী হাসি কী হাসি! শেষে নাপতানি মুখটিপে হেসে আরেকখানা ধন্দ ছাড়লে,

'মুখ তার কালো বটে লয় হনুমান
লজ্জার খাতিরে তিনি মুখ ঢেকে যান ॥'

সব্বাই চুপ। তা পরে—ও মা! ছি ছি? নাপতানি নিজেই বলে দিলে, পেট থেকে পড়ে যখন ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদবে তখন মুখে কী দেবে গো নতুন বউমা? সব্বাই শরমেন্দা। মুখে আঁচল চাপা হাসি। সে খুব রগুড়ে ছিল। সিঁথেয় একটুখানি মেটে সিঁদুর দিয়ে আবার ছড়া কাটলে,

'সাক্ষী রইল চন্দ-সুজ্জ সাক্ষী দাদাপীর
অক্ষয় পরমায় দিলাম তোমার সোয়ামির ॥'

…আম্মার মুখে শুনেছি, তেনার শাদিতে উলু-উলুর রেওয়াজ ছিল। তো নওয়াজের আব্বা আর নতুন বউবিবি দাদাপীরের মাজারে সাঁজবাতি দিতে গেলেন। খিড়কির দুয়োর থেকে দু'ধারে দাসী-বাঁদিরা দু'খানা শাড়ি টান-টান করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে দুলা-দুলিন। সামনে-পেছনেও একখানা করে শাড়ি। মাজারে গিয়ে দুলা ধরবে পিদিম, দুলিন জ্বালবে দেশলাই কাঠি। কাঠি ছুট্ হল, কিংবা পিদিম এক কাঠিতে জ্বলল না—সব্বাই নজর

রেখেছে। একটু গণ্ডগোল হলেই মুখ শুকনো। দুলিনের খুঁত আছে বলে তা-ই নিয়ে আড়ালে গঞ্জনা। তাই কাটলেঘাটে শাদির দিন হলে সেই গাঁয়ের মেয়েকে দেশলাই কাঠি জ্বালানোর তামিল দিতে হতো। আমার হাতে পয়লাকাঠি জ্বলেনি। দুসরা কাঠি জ্বলল। তাই এখনও ভুগছি। আজরাইলেরও কি চোখে সেজে না গো?

শরিফা বেগম চটে গেলেন। শুনছ? শুনছ কী বলছেন? এত করেও নাম নেই। নিজের হাতে গু-মুত সাফ করে দিই।

আম্মা! আপনি চুপ করুন তো! মিনি ধমক দেন। মোরশেদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিলেন। মিনি তাঁকে বলেন, ইস! টেপরেকর্ডারটা কেন যে আনলে না? অত করে বললাম। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি স্পিকিং।

মোরশেদ বলেন, লাইফস্টাইল, কালচার এসবের কোনও রেকর্ড নেই। কেউ রাখেনি!

ইতিহাস মানে নভেল। কিন্তু বড়মা উলু-উলু কথাটা বললেন। খুব আশ্চর্য লাগছে!

শরিফা জামাইয়ের সামনে ঘোমটা টেনে আস্তে বললেন, আমিও শুনেছি। আগের আমলে খান্দানিবাড়িতে উলু-উলুর রেওয়াজ ছিল। ভাইজান আরবমুলুকে চাকরি করেন। বলছিলেন, সে-মুলুকের মেয়েরা উলু উলু দেয়।

...লগনশাতে পনের সেরি রুই পাঠিয়েছিলেন শ্বশুরসাহেব। বদ্দমানের মোঙোলকোটে আয়মাদারদের রবরবা। বলে কী, পনের সেরি রুই? এ গাঁ থেকে বিশের ওপর রুই নিয়ে লগনশা যায়। ফেরত দাও! ফেরত দাও।

মোরশেদ ভুরু কুঁচকে বলেন, মোঙলকোট বলছেন। মঙ্গলকোট শুনেছি। আমার পার্টনারের বাড়ি।

মিনি বলেন, চুপ করো তো।

রাইট, রাইট! মোগলকোটকে মঙ্গলকোট করা হয়েছে। টোব্যাকো যেমন তাম্রকূট।

...রেহানার শাদিতে দলিজঘর থেকে উঠোনে ছাঁদনাতলা অব্দি গালচে পাতা। ছাঁদনার ওপর মখমলের চাঁদোয়া। চারকোনায় চারটে কলার গাছ। বরণডালায় আতপ চাল, পান-সুপুরি, মেটে সিঁদুরের কৌটো। দুলার কাণ্ডকারখানা দেখে সব্বাই থ। লাথি মেরে গাল্চে ওলটাতে ওলটাতে আসছে আর মুখে যা নয় তাই বেফাঁস কথাবার্তা। আচানক কলাগাছ উপড়ে ঘোরাতে শুরু করলে। তখন সব্বাই গিয়ে তাকে আটক করলে।

বড়মা টেনে টেনে হাসেন। পাগলা গো, খ্যাপাপাগল। তক্ষুনি তার মুখ দিয়ে তিনতালাক বলিয়ে তবে ছাড়লে। রেহানার আব্বা ডিপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট। তো ইজ্জতের সওয়াল। চল্লিশদিনের ইদ্দত মানবেন কেন? খুজুটি পাড়ার ইস্কুলে রেহানার এক ভাই ছাত্র ছিল। তার এক বন্ধু ছিল বোর্ডিং ঘরে। রাত দুপুরে তার ঘুম ভাঙিয়ে তুলে গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে আনলে। ফজরের নামাজের পর আবার শাদি হল। তা কপাল দেখ রেহানার! তিন মাস যেতে না যেতে তার দামাদ মরে গেল। তা তখনকার দিনে মিয়াঁঘরে বেধবা হলেই জিন্দেগিভর কষ্ট। আর দামাদ জুটত না। রেওয়াজ ছিল না যে! তবে যদি কেউ দয়া করে, কি ধরো, কারুর সঙ্গে আশনাই হল, তখন—

মিনি বলেন, শুনছ? শুনছ? মুসলমানরাও বিধবা বিয়ে করত না।

শরিফা বলেন, তোর রেহানা নানিকে মনে পড়ে না মিনি?

একটু-একটু মনে পড়ে।

সালারের রেহানা নানি রে। সালার-তালিবপুর আমাদের কুটুম-সোদরে ভর্তি। আয়মাদারদের গাঁ।

মিনি চঞ্চল হয়ে বলেন, ও হ্যাঁ! মাঠের মধ্যে রেহানা নানিদের একটা বাগানবাড়ি ছিল। গেটে মারবেল প্লেটে লেখা ছিল 'সন্ধ্যানীড়'। মধ্যিখানে পুকুর। তিনপাড়ে বাগান। কত গোলাপ ফুটত। পুকুরে পদ্ম ছিল।

নীলপদ্ম। শরিফা বলেন। ডিপুটিসাহেব কোথা থেকে এনে লাগিয়ে ছিলেন।

মোরশেদ বলেন, নীল পদ্ম? এখনও আছে নাকি? মিনি, গাড়ি যায় না?

কান্দি ঘুরে যেতে হবে, মিনি বলেন। নাক বরাবর কাঁচা রাস্তায় এখন পাঁক। তোমার মারুতি উদ্ধার করতে গোরুগাড়ি ভাড়া করতে হবে।

কাশির শব্দে সবাই মুখ ঘোরায়। জোরাল কাশি। ফয়েজুদ্দিন বাড়ি ঢুকছিলেন। শরিফা ঘোমটা টেনে নেমে এসে কদমবুসি করেন। তারপর একাদিক্রমে মেয়েদের কদমবুসির পালা। ফয়েজুদ্দিন বলেন, দেখছ? দেখছ? এইজন্যেই কাজি-বাড়ি আসা ছেড়েছি।

শেষে মিনি এলেন। ফয়েজুদ্দিন বলেন, খবরদার! আর নয়। ও সায়েব! তুমি দেখছি ফিল্মের হিরো করে ফেলেছ চেহারাখানা। না—না! হ্যান্ডশেক। আস্সালামু আলায়কুমটা বাদ দাও। হাফ-মুসলিম হাফ-ওয়েস্টার্ন। মিনি! বনি কোথা রে?

আসেনি মামুজি! ওকে সাউথে এনভাইরনমেন্টাল টুরে নিয়ে গেছে স্কুল থেকে।

এগুলিন তোরা ভাগবাঁটোয়ারা করে খা। ফয়েজুদ্দিন প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট লজেন্স বের করে তার হাতে গুঁজে দেন। তোর সায়েবকে

বাঞ্চত করিসনে। আর শোন, বড়মারও হিস্যে আছে। তবে আমি নিজের হাতে মুখে ছুঁড়ে দেব। 'ছি ছি! ছুঁয়ে দিয়ে না-পাক করলি' বলার আগেই লজেন্সের টেস্ট মুখ বুজিয়ে দেবে।

বড়মা বলছিলেন, আয়মাদার বল কি মিঁয়া বল, ওই একটা কথাই চালু ছিল বেশি। 'ভালোমানুষ'। এই কথাটা বললেই সব্বাই বুঝত। আমার ছোটভাই আশনাই করে চাষাঘরের মেয়ে এনেছিল। তাকে উঠতে-বসতে সব্বাই খোঁটা দিত, ভালোমানুষের বেটি হলে আদব-কায়দা জানত। পাঁচিলের বাইরে গলার আওয়াজ শোনা যায় গো, ছি ছি! আবার উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল শুকোয়। কাশি শুনেও ঘোমটা টানে না। শেষে রউফ তাকে নিয়ে টাউনে চলে গেল। রউফ মুন্সেফের আদালতে উকিল হয়েছিল। একবার হল কী—

ফয়েজুদ্দিনের সাবধানে জিভের ওপর ফেলে দেওয়া লজেন্স তাঁকে থামিয়ে দেয়। মুখ নাড়া শুরু হয়ে যায়। তোবড়ানো মুখে-চোখে হাসি ফোটে। কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম করে বলেন, দাদাপীরের সিন্নি। সব্বাই ভুলে গেছে। উনি ভোলেননি। ভুলতে পারেন এই হতভাগীকে? মনে মনে ডাকি। কানে যায় বৈকি। উরস বন্ধ করে দিলে হারামজাদারা। সইবে? আর যে আমি পা ফেলতে পারিনে। নইলে পরে সাঁজবাতিটা অন্তত জেলে আসতাম। যদ্দিন পেরেছি, জেলেছি।

হাবল কাজি বাড়ি ঢুকে বলেন, ফজু মিয়াঁ ঢুকল দেখলাম!

ফয়েজুদ্দিন বারান্দা থেকে নেমে বলেন, বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকেছে হে কাজিসাহেব!

এসেছ, তা খবর পেয়েছি। ভাবছিলাম তোমার দুলাভাই বারণ না করুক, বোন করেছে।

আমি এক উড়ো পাখি। ডাল দেখলেই বসি। কিসের ডাল, বট না পাকুড়ের, নাকি নিমের—বুঝি না।

মিনি ফয়েজুদ্দিনের হাত ধরে টানেন। চলুন মামুজি। ছাদে গিয়ে আড্ডা দিই। রুবি কাল দু'বার এসেছিল। বলল, আব্বুর খুব অসুখ। সত্যি নাকি মামুজি?

হ্যাঁ রে। কিন্তু দুলাভাইকে তোরাব ডাক্তার জিনে ধরা করে ধরে আছেন। হেল্‌থ-সেন্টারে এম বি বি এস ডাক্তার আছেন। দুলাভাইয়ের যুক্তি হল, আজকালকার ছেলে-ছোকরা ডাক্তার বইপড়া তোতাপাখির বাচ্চা। দে ক্যান্‌ট রিড দি হিউম্যান বডি। কথা বলতে বলতে ফয়েজুদ্দিন দোতলা হয়ে ছাদে ওঠেন। ছাদের পশ্চিমে সুলতানি আমলের মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিশাল বটগাছ উঠেছে। তার ঘন ছায়া ছাদে এসে শুয়ে আছে। ফয়েজুদ্দিন পিছু

ফিরে মিনিকে খোঁজেন। মোরশেদকে বলেন, ও সায়েব। তোমার মিসেসকে হারিয়ে ফেললাম যে।

এখনই পেয়ে যাবেন। আসা অব্দি মামুজি-মামুজি করে অস্থির। বলছিল,—

শ্বশুর হাবুল কাজিকে দেখে মোরশেদ থেমে যান। কাজি বলেন, ফজু মিয়াঁ, ছোট ভাগনিকে দেখাতে কাদের এনেছিলে হে? শুনলাম, তাদের আদব-কায়দা পছন্দ হয়নি খোন্দকারের।

ফয়েজুদ্দিন একটু হাসেন। হুঁ। দুলাভাইয়ের খানদানিও এক জিন। নাম্বার টু জিন বলতে পার। তবে দু'রকম জিন আছে। সাদা আর কালো। আবু তোরাব সাদা জিন। আর এই খানদানি কালো জিন।

কাজি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলেন, খানদানির মাজা আমাদের ছেলেবেলায় ভেঙে গেছে। নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। জোলাপাড়ার—মানে, মোমিনপাড়ার মসজিদ দেখেছ? ওই দ্যাখো, শেখপাড়াও পাল্লা দিয়ে মসজিদ তুলছে। শুনেছি, সাত-আটশ লোকের একসঙ্গে সেজ্‌দার ব্যবস্থা হয়েছে। বড়-বড় সব মওলানারা এসে ওপেন করবেন। ফজু মিয়াঁ আমাদের সঙ্গে ওদের তফাতটা এইখানে। নওয়াজ সাহেব মেয়েদের জন্য স্কুল পত্তন করেছিলেন। কেন? না—প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে কো-এডুকেশন ছিল। তেনারা ঝাড়েবংশে পাকিস্তানে চলে গেলেন। সেই স্কুলের নাম বদলে এখন পরমেশ্বরী হায়ার সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল।

নগেন দত্ত মরাকে জিন্দা করেছেন। তাঁর মায়ের নামে দোষ ধোরো না কাজিসাহেব।

না, না। দোষ ধরছি না। তফাতটা বোঝাচ্ছি। কালচারের তফাত। আয়মাদাররা লাইব্রেরি করেছিল। খেলাধুলোর ক্লাব করেছিল। আয়মাদারদের ছেলেরা বাবুদের ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার করত। তোমার দুলাভাইয়ের কথা ভাবো। সিরাজুদ্দোলা, মীর কাশিম, সাজাহান—সবেতেই হিরোর পার্ট। বঙ্গে বর্গীতে ভাস্কর পণ্ডিত। আর কী যেন বইটা—হ্যাঁ, টিপু সুলতান—মঁসিয়ে লালি করে ফাটিয়ে দিয়েছিল। আর এরা মসজিদ বানাচ্ছে। মওলানা-মৌলবি এনে ইসলামি জলসা করছে। যা-ই বল, কালচারের তফাত অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ওই যে বললাম, মাজাভাঙা সাপ।

চিলেকোঠার সিঁড়ির মাথা দিয়ে বেতের কয়েকটা চেয়ার-টেবিল বেরিয়ে আসছিল। পেছনে কয়েকটি মেয়ের মুখ। কাজি বলেন, মধ্যিখানে সাজিয়ে পেতে দে। ফজু মিয়াঁ, এসো। ও মোরশেদ। বোসো বাবা!

মিনি এসে গেলেন। বুকে তোয়ালে পরানো মানবশিশু। মামুজিকে সারপ্রাইজ দেব। বলুন তো এটা কী?

ফয়েজ্‌উদ্দিন বলেন, আবার কী? খোদার বান্দা। বন্দেগি পাওয়ার লোভেই না খোদা আদম সৃষ্টি করেছিলেন।

মিনি হেসে কুটিকুটি হল। রুবি জামা দেখেও জিজ্ঞেস করছিল ছেলে না মেয়ে?

ফয়েজ্‌উদ্দিন বাচ্চাটার গাল নেড়ে দিয়ে বলেন, আগে জানলে—তো এ যে দেখছি ঘুমে কাদা রে!

বাচ্চাদের ঘুমুনো ভালোই, মামুজি! কিন্তু জাগলে পরে দুনিয়া মাথায় করবে। শুধু খাওয়ার সময় লক্ষ্মীসোনা।

নানার হ্যাবিট। কী হে কাজিসাহেব? আজকাল ক'কিলো গোশ্‌তো খাও?

কাজি বলেন, দাঁতের জোর নেই ভাই। হামনদিস্তায় থেঁতলে কোফ্‌তা করে দিলে তবেই খেতে পারি।

তোমাদের কাট্‌লেঘাটে বরাবর দেখে আসছি দুবেলা খালি মরা গোরুর গোশ্‌তো। চিচিঙ্গে, ডিংলি, বেগুন, পালং শাক সবেতেই—

মিনি বলেন, মামুজি! আমরা ডিংলি বলি না কিন্তু! আপনি বীরভূমের লোক। আমরা মুর্শিদাবাদে কুমড়ো বলে।

কাজি বলেন, বর্ধমানেও ডিংলি বলে।

ফয়েজ্‌উদ্দিন বলেন, হোয়াটস ইন ও নেম? শাহনাজ গার্লস স্কুলের নাম পরমেশ্বরী হয়েছে বলে তোর আব্বা দুঃখ করছিল।

আরে না, না! আমার কথাটার অপব্যাখ্যা কোরো না।

এই সময় মসজিদ থেকে মাইকে আসরের আজানভেসে এল। হাবল কাজি উঠে পড়েন। ফজু মিয়াঁ তো ভুল করেও খোদার ঘরের দিকে হাঁটে না। যাই হে, কবরের দিকে পা ঘুরে গেছে। কখন হ্যাঁচকা টান মেরে আজরাইল শুইয়ে দেন ঠিক নেইকো। তুমি এখনও ইয়ং জায়েন্ট হয়ে আছ।

কাজি যাবার সময় মেয়েদের দঙ্গলটিকে ধমক দিয়ে যান। তারা পুতুল হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আজান শুনে মাথায় কাপড় টানেনি। মিনি বলেন, যাও তো সব। ভিড় কোরো না। কুলসুম, টনিকে নিয়ে গিয়ে দোলনায় শুইয়ে দে। পাশে বসে থাকবি যেন। দোলনায় ফিডিং বট্‌ল আছে। কাঁদলে পরে মুখে ধরিয়ে দিবি।

ফয়েজ্‌উদ্দিন বলেন, সায়েব, আর ক'দিন থাকছ তো? কালীপুজোর ধুম দেখবে না? কঙ্কালের নাচ?

না মামুজি। কাল আর্লি মর্নিংয়ে স্টার্ট করব।

তোমার বিজনেসের খবর কী?

চলে যাচ্ছে। তবে মার্কেট বড্ড ডাল হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। গভ্‌মেন্ট

মুখে বলছেন ইকনমিক লিবার‍্যালাইজেশনের কথা। দি রিয়্যালিটি ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট।

মিনি চটে যান। নো বিজনেস! কতদিন পরে মামুজিকে পেলাম। চাপা গলায় তিনি ফের বলেন, রুবির পড়াশুনো বন্ধের ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস লাগছে। ও তো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছিল। তারপর কী হয়েছিল জানেন মামুজি? আপনার নাকি পেছনেও দুটো চোখ আছে বলেছিলেন।

বাড়তি চোখ থাকার বিপদ আছে রে! কিছুই ভাল করে দেখা হয় না। ইংরেজিতে প্রব্লেম-চাইল্ড, স্পয়েল্ড-চাইল্ড এইসব টার্ম আছে। তোর চেয়ে রুবিকে আমি কি বেশি জানি?

একটু খামখেয়ালি অবশ্যি ছিল। ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে হঠাৎ আসছি বলে চলে যেত। আচ্ছা মামুজি?

বল্।

একটা কথা কানে এসেছিল। পাত্তা দিইনি। আফটার অল পাড়া-গাঁ। টাউন-টাউন গন্ধ থাকলে কী হবে। রুবি সম্পর্কে—

ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। মিনির কথার ওপর বলেন, এখন দুলাভাই স্বীকার করছেন রং ডিসিশন নিয়েছিলেন।

তা হলে সত্যি?

দ্যাখ্ মিনি, একই জিনিস অনেক সময় একদিক থেকে দেখলে সত্যি, আবার অন্য দিক থেকে দেখলে মিথ্যে লাগে। একটা ঘটনা বলি শোন্। একবার ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলাম। অনেক বছর আগের কথা। মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়েছি। সেদিন হাটবার ছিল। তো মাঠের আলপথে দেখি, ভিড় করে লোকেরা কী দেখছে। আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি, খানিকটা দূরে একটা বাঁজা ডাঙায় কী প্রচণ্ড চোখ ঝলসানো ছটা! সবাই বলছে, সাপের মাথার মণি। আমার স্বভাব তো জানিস! একটু পরে লক্ষ্য করলাম, একটা সার্টেন পয়েন্ট থেকে তাকালে ছটাটা দেখা যাচ্ছে। একটু সরে দাঁড়ালে কিচ্ছু নেই। সবাই বারণ করল। শুনলাম না। ছটা চোখে রেখে এক পা এক পা করে এগিয়ে স্পটটা লোকেট করলাম। তারপর স্পটে গিয়ে দেখি—ফয়েজুদ্দিন তাঁর অট্টহাসিটা হাসলেন।

কী দেখলেন?

মোরশেদও জিজ্ঞেস করেন, কী দেখলেন মামুজি?

এক কুচি রাঙতা কাগজ। সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর থাকে, সেই কাগজ। কোন রাখাল-বাগাল বোধ করি কোত্থেকে কুড়িয়ে এনে ওইখানে গোরু চরাতে চরাতে আনমনে কুচি করছিল। একটা কুচি এমন পজিশনে

পড়েছে যে তার ওপর রোদ পড়ে ওই কাণ্ডটি বাধিয়েছে। তা হলে দ্যাখ, ব্যাপারটা কী দাঁড়াল শেষ অব্দি ?

মিনি বেগম একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলেন, বি, এ-তে আমার ফিলোসফি ছিল। অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটির থিওরি পড়েছি। বাংলায় কী যেন বলে ?

মোরশেদ বলেন, অবভাস তত্ত্ব।

বড় ট্রেতে চা-নাশতা নিয়ে এল এক প্রৌঢ়া। মাথায় বড্ড বেশি ঘোমটা। মিনি বলেন, মাজু খালা, কুলসুম টনির কাছে বসে আছে দেখলে ?

'আছে' কথাটি খুব আস্তে বলে মাজু খালা চলে গেল। ফয়েজুদ্দিন বলেন, মাজু আমাকে চিনতে পারল না ?

মিনি হাসেন। না—টনির বাবু বসে আছে না ? বাড়ির জামাইয়ের সামনে মেডসারভ্যান্টকে কী কী করতে হবে, আয়মাদারবাড়ির সেই আদব-কায়দা ! মামুজি ! ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে।

মোরশেদ বলেন, আমার এটা একটু অদ্ভুত লাগে কিন্তু ! আমি অবশ্য ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ হয়েছি। আমার কয়েকজন মুসলমান বন্ধুও ছিল, যদিও হিন্দু বন্ধুর সংখ্যাই বেশি। ওদের মধ্যে রিচ ফ্যামিলির ছেলেও ছিল। ওদের বাড়িতে গেছি। একটু-আধটু পরদা ছিল তা ঠিক। কিন্তু সো-কল্ড আয়মাদারি আদব-কায়দা ভেরি-ভেরি পিকিউলার। আমি এ সব দেখিনি। এখানে এসে প্রথম দেখেছিলাম।

তুমি সাউথ বেঙ্গলের লোক। এটা রাঢ়। মিনি জোর দিয়ে বলে, রাঢ় জিনিসটাই শক্ত। রূঢ়।

মানে—আমি বলছি, এসব আদব-কায়দাও আছে। আবার মেয়েরা পরদা মানে না। অদ্ভুত !

ফয়েজুদ্দিন বলেন, পরদা মানে না বলছ কেন হে ? পাঁচিলের হাইট মেপে দেখেছ ? জেলখানা। থার্টিজে রাঢ়ের আয়মাদাররা প্রথমে ছোট খুকিদের, তারপর ক্রমে ক্রমে বড় খুকিদের পাঁচিল পার করে বাইরে ছুঁড়তে লাগল। সব আয়মাদার নয়, কেউ-কেউ। একটা বড় রকমের জাগরণ ঘটেছিল। ব্রিটিশ গভমেন্ট তখন মুসলমানদের জোর তোল্লাই দিচ্ছে। কেন না, হিন্দুরা কংগ্রেস করে তার লেজে টান দিচ্ছিল। সব ভাল চাকরির ফার্স্ট প্রেফারেন্স মুসলমানের। শরৎ চাটুয্যের একটা বই আছে আমার কাছে। তাতে উনি লিখেছেন, লাটসাহেব বললেন : মুসলমানদের নিয়ে নভেল লিখছ না কেন ? বোঝ কী অবস্থা ছিল ! শরৎ চাটুয্যে ঢাকায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন ; এবার আমি নিজেই একটা মুসলিম সাহিত্য সমিতি গড়ব। একটা হাওয়া উঠেছিল হে ! আফটার পার্টিশন

হাওয়াটা পুবে সরে গেল। রাঢ়ের যে আয়মাদাররা ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে রইল, তারা মাজাভাঙা সাপও নয়। সাপ মরে গেছে। খোলসটা পড়ে আছে। তাই নিয়ে এখনও কারও-কারও গুমোর। যাক গে মরুক গে! কাটলেঘাটে এলেই কবর থেকে—উরেব্বাস! এ মিনি, তোর মা মনে রেখেছে কিন্তু। তেলেভাজা আর পাঁপর! উরেব্বাস! ওহে সায়েব! এ কিন্তু আয়মাদারি নয়। কমন কালচার।

চা খেতে খেতে বেলা পড়ে এসেছিল। চারপাশে গাছপালায় পাখিরা চ্যাঁচামেচি করছিল। হঠাৎ ফয়েজুদ্দিন মিনিকে আস্তে বলেন, একবার ও বাড়ি যাস মা! দেখা করে আসিস! বুড়ি দুঃখ করে বলছিল, মিনি আসে। এত দেখতে ইচ্ছে করে। কখন চলে যায়। হাজার হলেও লতায়-পাতায় সম্পর্ক। সায়েব! তুমি ওঠো। চলো, তোমাকে একটুখানি সারপ্রাইজ দেব। মিনি, তোর সায়েবকে নিয়ে যাচ্ছি। ইনট্যাক্ট ফেরত নিয়ে যাব। ডোন্ট ওয়ারি।

কোথায় যাবেন মামুজি? আপনার গল্পই শোনা হল না। খালি সব ফালতু কথাবার্তা হল।

ফয়েজুদ্দিন হাসেন। আমার এক ইস্টবেঙ্গলের কলিগ ছিল রেলওয়েতে। বলত, পুরান্ কাসুন্দি মাজে-মাজে রৌদ্রে দেওন লাগে।

ক্যারিকেচারটি উপভোগ্য হওয়ায় মিনি হেসে কুটিকুটি হন। তারপর বলেন, টর্চ নিয়ে যেও।

ফয়েজুদ্দিন প্যান্টের পকেট থেকে তাঁর খুদে টর্চ বের করে দেখান। এই আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। বুঝলি মিনি? অন্ধকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করি।...

পিচরাস্তার তেমাথায় বিদ্রোহী কবির কালচে কংক্রিট-শরীরে জোরাল আলো ফেলা হয়েছে। ফয়েজুদ্দিন বলেন, ওই দ্যাখো সায়েব, প্যারাডক্স। তাই না? টাকাটা গভ্‌মেন্ট্ পঞ্চায়েতের থ্রু দিয়ে দিয়েছিল। তো সেই কথাটাই বোঝাচ্ছিলাম। ইসলামে প্রতিমূর্তি নিষিদ্ধ। কোরানে স্পষ্ট করে বলা আছে সেকথা। তুমি আলম মির্জার বাড়ি গেছ কখন? দেউড়ির মাথায় দুই সিংহ বসে আছে। চোয়াল খসে গেছে। লেজ নেই। তবু সিংহ। আরও ভেবে দ্যাখো। ফোটোগ্রাফ প্রতিমূর্তি কি না? ইরানে খোমেইনির ফোটো দিয়ে পোস্টার করেছে। এদিকে ফান্ডামেন্টালিজমের আওয়াজে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। এ কেমন ফান্ডামেন্টালিজম হে, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌কেই নাকচ করে দিচ্ছে?

পাওয়ার-পলিটিক্স মামুজি! কারণ পাওয়ার ইজ মানি।

অ্যাই! সেটাই কথা। ইসলামে সুদ খাওয়া হারাম। ইসলামিক স্টেটে

সন্দকে বলা হচ্ছে প্রফিট। ফয়েজন্দিন খুব হাসেন। হোয়াটস ইন এ নেম? যাকগে মরুকগে। সায়েব! তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি অনেকক্ষণ পাইপ টানার জন্য উসখুস করছ। পকেটে থাকলে খাও। আগের দিনে মজলিশে পিঠ ফিরিয়ে আশরাফদের ফরাসির কলকে টানত আতরাফরা। বাবুপাড়াতেও দেখেছি একই প্রথা ছিল। তা আমি আশরাফও নই, বাবুভদ্রলোকও নই। স্মোকিং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, সেটা আমিও দুলাভাইকে বলি। কেন বলি? না—এটা মডার্ন লব্জ। যখনকার যা স্লোগান। তুমি স্বচ্ছন্দে পাইপ টানো হে! স্বাধীনে-স্বাধীনে সম্পর্কটা খাঁটি হয়। শ্রদ্ধাভক্তি দেখানোর আরও কত ভঙ্গি আছে।

মোরশেদ হেসে ফেলেন। আপনি ফিউচারম্যান মামুজি!

ভুল বললে। একটা বইতে পড়েছি, ফিউচারম্যানরা কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবে। একশটা কথার জন্য একটিমাত্র কোড। আমি বড্ড টকেটিভ।

মোরশেদ একটু দ্বিধার পর পাইপ বের করেন। তামাক ভরে লাইটার জেবলে ধরান। মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন। একটা খালি সাইকেল রিকশ শব্দ করতে করতে যাবার সময় বলে যায়, আসুন স্যার, লিয়ে যাই।

ফয়েজন্দিন হাত নাড়েন। তারপর বলেন, তুমি তো আমার মত মুখ্য নও। কখনও চিন্তা করে দেখেছ, কেন এদেশে গুরুজনদের সামনে স্মোক করা অসভ্যতা? তোমার অবাক লাগে না? দেখ, এইসব ব্যাপারেও আসলে আশরাফ-আতরাফ, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ ফ্যাক্টরটা কাজ করছে। আতরাফরা বাপ-ব্যাটা একটা বিড়ি ভাগ করে টানে। যাকগে মরুক গে। তোমাকে বোর করছি।

না না। আপনি বলুন।

চলো! তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।...

ঘাটবাজারে আসন্ন কালীপুজোয় অনেক রাত অবধি মানুষজনের ভিড় এবং মাইকের গর্জন চারদিক থেকে। ফয়েজন্দিন দু'কানে হাত চাপা দিয়ে হাঁটেন। বাজার পেরিয়ে গঙ্গার পাড় ঘেঁষে রঙবেরঙের বাড়ি আলো-অন্ধকারে শহরের আদল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অংশটা ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। কোনও-কোনও বাড়ি থেকে টিভির জোরালো শব্দ শোনা যাচ্ছিল! মোরশেদ বলেন, এদিকটায় কখনও আসিনি।

কার বাড়ি আসবে? এরা আউট সাইডার। কাকেও চেন, যে আসবে?

গঙ্গার ধারে নিচু বাঁধের ওপর রাস্তা এবং দূরে দূরে একটা করে ল্যাম্প-পোস্ট। গঙ্গার জলে আলো খেলছে। রাস্তা ঘেঁষে একটা একতলা বাড়ির সামনে ছোট্ট ফুলবাগান বেড়ায় ঘেরা ছিল। ফয়েজন্দিন চাপা গলায় হুতুম প্যাঁচার মত শব্দ করছিলেন। একটু পরে মোরশেদ বুঝতে পারেন, শব্দটা

দুটো নাম। ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী!

বারান্দা থেকে কেউ বলে ওঠে, মামুজি? আসুন! চলে আসুন!

প্রথমদিন ভয় পেয়েছিলি!

ভ্যাট! আসুন!

সে-হারামজাদা আছে?

যাবে কোথায়! ফ্রেন্ডের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে।

ভারতী! আমার সঙ্গে কে আছে জানিস! হাবল কাজির জামাই। এ বিগ গাই।

আহ্! আসবেন তো!

সামনে লতিয়ে ওঠা ল্যাভেন্ডারের ঝরোকা ছিল। মোরশেদ এতক্ষণে দেখতে পান রুবির বয়সী একটি মেয়েকে। পরনে তাঁতের শাড়ি। স্লিভলেস ব্লাউজ। কপালে টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর চোখে পড়ার মতো এবং দু'হাতে শাঁখা। মোরশেদকে সে করজোড়ে নমস্কার করে এবং ফয়েজুদ্দিনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। ফয়েজুদ্দিন চাপা গলায় মোরশেদকে বলেন, নতুন মুসলমান ঘন ঘন নামাজ পড়ে। বলতো সায়েব, এর জাত কী?

মামুজি! জাত তুলে কথা কেন হঠাৎ? আমি কি চিড়িয়াখানার আজব প্রাণী?

ইশ! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর। কই রে ভানু?

কাম অন আঙ্কল! আমরা ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসেছি।

ঘরে ঢুকে ফয়েজদুদ্দিন থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করেন, এ কী রে! সানু, তুই বউবিবিকে একা ফেলে এখানে আড্ডা দিচ্ছিস! তোর বরাতে অশেষ দুঃখ আছে বাপ!

সানু মোরশেদকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলে, আপনাকে দেখিনি। তবে, আপনার গাড়ি দেখেছি।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, চোখে দেখিনি, তার বাঁশি শুনেছি। আমাদের কম বয়সের ফেবারিট গান ছিল। ভানু! এই হল গে হাবল কাজির জামাই। হাসান মোরশেদ। আমার এই ভাগনের নাম তো শুনলে।

ভানু নমস্কার করে বলে, বসুন! আঙ্কল! আপনি বসুন! স্পেস কম। ভারতী! ও ঘর থেকে মোড়াটা এনে দাও।

ভারতী মোড়া এনে দিয়ে বলে, পোকার ভীষণ অত্যাচার। কালীপুজোর পর কমবে।

চা-ফা করিসনে। কাজির বাড়ি একগুচ্ছের তেলেভাজা আর চা খেয়ে এলাম। ফয়েজুদ্দিন সানুর দিকে তাকাল। কীরে! মুখে হাঁ-চাঁ নেই যে!

সানু বলে, কী আশ্চর্য! হাঁ-চাঁ থাকবে না কেন! ওঃ মামুজি!

আপনি সব সময় চিমটি কাটেন।

খবরের কাগজটা উলটে দেখে নিয়ে ফয়েজ্‌দ্দিন বলেন, এই একটা হাড়জ্বালানে জিনিস! এটা বেশি চিমটি কাটে। পড়লেই মনের ভেতরটা তছনছ হয়ে যায়। খামোকা বাইরের আপদ ঘরে ডেকে আনা। কামরূপেতে কাক মোলো, কাশীধামে হাহাকার! সানু, তুই খবরের কাগজ রাখিস নাকি?

রাখি। এই কাগজটা নিতে এসে ভানুর সঙ্গে দেখা হল। চলে এলাম।

ভারতী! তোর ঝামেলা মেটেনি?

ভারতী বলে, সেদিন তো বললাম। আবার জিজ্ঞেস করছেন? মামুজি! আপনার এবার কিন্তু বয়স হয়েছে।

হুঁ। বলেছিলি বটে! যাক গে মরুক গে! ফয়েজ্‌দ্দিন গোঁফে তা দিতে দিতে ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে নেন। তারপর বলেন, একটুখানি বসেই চলে যাব। খোন্দকারসাহেবের অসুখটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। তো এই কলকাতার সায়েবকে একটুখানি দুনিয়া দেখাতে নিয়ে এলাম। কলকাতার খাঁচাঘরে বসে দুনিয়া দেখা যায় না। অবশ্যি এই কাগজ-টাগজ আছে। ছাপা হরফে এক-রকম দুনিয়া বানিয়ে বলে, 'দেখো দেখো দুনিয়া দেখো, মক্কা দেখো, মদিনা দেখো! দিল্লি শহর দেখো। কলকাত্তা বোম্বাই দেখো।' আজকাল ওরা আছে কিনা জানি না। আমরা ছেলেবেলায় একটা করে পয়সা দিয়ে বাকসোর ফুটোয় চোখ রেখে তাজ্জব হয়ে দেখতাম।

ভানু হেসে ওঠে। একজ্যাক্টলি আংকল। মাসমিডিয়া ডাইনোসরকে টিকটিকি, টিকটিকিকে ডাইনোসর বানায়। পুজোর আগে ভারতীকে নিয়ে যখন লড়ছি, টাউন থেকে এক লোকাল করেসপন্ডেন্ট হাজির। কলকাতার এক সাংবাদিক তার সঙ্গে ছিল। আমি ভাবলাম, দেশের এনলাইটনড সার্কেল থেকে রেসপন্স পাওয়া যাবে। তারপর খবরটা প্রথম পাতায় বেরুল। ব্যস! হিতে বিপরীত হয়ে গেল। প্রেসটিজের লড়াই বাধল। দেশে সরকার আছে? প্রশাসন বলে কিছু আছে? চার্চিলের একটা কথা এই ইংরেজি কাগজেই পড়েছিলাম। ভাবার্থ মনে আছে। 'ওদের স্বাধীনতা দিও না। ওরা মধ্যযুগে ফিরে যাবে।' যা চলছে, তা মধ্যযুগেরও অধম।

মোরশেদ আস্তে বলেন, ঘটনাটা জানি না। তবে, অপেনার বক্তব্যে আমার একটু রিজার্ভেশন আছে। চার্চিলের কথায় সায় দিতে গেলে 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন'-তত্ত্ব মেনে নিতে হয়। আমি ওয়েস্টে বহুবার গেছি। বিজনেসের কাজকর্মে যেতে হয়। সভ্যতার যে ডেফিনিশন আমরা ওরিয়েন্টালরা ওয়েস্টের কাছে শিখেছি, তাতে গন্ডগোল আছে।

ভানুর মুখে লড়ুয়ার আদল লক্ষ্য করে ফয়েজ্‌দ্দিন বলেন, ব্যস! ব্যস!

মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে না বাপ! লড়ছিস তো লড়ে যা। সাহেব! ওঠ তুমি তো ভোরবেলা স্টার্ট করবে। গোছগাছ আছে বলছিলে! সানু! যাবি নাকি?

ভারতী বলে, সানুদাকে, টানটানি কেন? এলেন গেস্ট নিয়ে। আধ মিনিটও বসলেন না। এক কাপ চা-ও খেয়ে গেলেন না। ভদ্রলোক ভাববেন, আমরা গাঁইয়া। ভদ্রতা জানি না।

মোরশেদ দ্রুত বলেন, না, না আমার কাছে ভদ্রতা, সভ্যতা এ সবের ডেফিনিশন অন্য রকম। সে করজোড়ে ভারতীকে নমস্কার করে। তারপর ভানুকে। যদি কলকাতা যান, দেখা করলে ভাল লাগবে। এই আমার কার্ড।

সে পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে দেয়। ফয়েজুদ্দিন বলেন, সায়েব সব সময় পকেটে নেমকার্ড নিয়ে ঘোরে! তাজ্জব!

মোরশেদ হাসেন। প্লিজ ডোন্ট ফরগেট মামুজি! আফটার অল আই অ্যাম এ ইয়াপ্পি। ইয়াং আরবান অ্যামবিশাস প্রফেশনাল পার্সন। ভানুবাবু নিশ্চয় কথাটা জানেন?

সানু ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ায়। আজ চলি ভানু! ভারতী! চলি। আবার দেখা হবে।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, কাজটা ঠিক হল না অবশ্যি। তিন-তিনটে মুসলমান এবার একত্র হল। হ্যাঁ রে ভানু। এই জিনিসটাই কি ঘটনাচক্রে কমিউন্যালিজ্‌ম? অথচ দ্যাখ, ইসলামের শুরু থেকে প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু! হিন্দুদের নাকি ছত্রিশটে জাত। অথচ এই জিনিসটে নেই। পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে কো-অপারেট করে—সিস্টেমটাই এ রকম।

ভানু-ভারতী কথা বলতে বলতে বিদায় দিতে আসে। ভারতী বলে, মামুজি! ইসলাম এবং মুসলিম এক জিনিস নয়। যেমন কমিউনিজম এবং কমিউনিস্ট এক জিনিস নয়। আমার বাবা কমিউনিস্ট।···

রাস্তায় হাঁটাতে হাঁটতে ফয়েজুদ্দিন বলেন, সাহেব! সারপ্রাইজটা টের পেলে?

মোরশেদ বলেব, না তো!

ভারতী ডাক নাম। ওর আসল নাম জাহানারা ইসলাম। শাহজাদপুরের মেয়ে! সন্দীপ দাশগুপ্ত সেখানকার পাওয়ার সাবস্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিল। বছর দুই হল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। ওই বাড়িটা করেছে! ইস্টবেঙ্গলের ফরিদপুরে ওর পূর্বপুরুষের বাড়ি! সারপ্রাইজ নয়?

সানু বলে, জাহানারার ব্যাপারটা নিয়ে মুসলমানরা মাথা ঘামায়নি চ

তাদের মতে, কমিউনিস্টরা নাস্তিক। সেই বাড়ির মেয়ে। এ তো হবেই। কিন্তু হিন্দুরা চটে গেছে। জাহানারা বি. টি পড়তে গিয়ে স্বামীর নাম লিখেছিল। বোকামি নয়, জেদ। বাবার নাম লিখলেই পারত। তার ওপর ধর্মের জায়গায় ড্যারাচিহ্ন দিয়েছিল। সংবিধান সেকিউলার। কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানুষ দিয়ে গড়া। ওকে সেই মানুষরা নিল না। জাহানারা মামলা করে জিতে গেল। কিন্তু হ্যারাসমেন্টের ভয়ে পিছিয়ে এল। এদিকে, স্কুল ওকে তাড়া দিচ্ছে। বি. টি ডিগ্রি চাই-ই চাই। শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে হবে না।

মোরশেদ বলেন, হাউ ফানি! ওঁর বাবার রোলটা কী?

মফিদুল ইসলাম মেনে নিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মেনে নেননি। জাহানারার ভাইরা ইনঅ্যাক্টিভ। কেউ কন্ট্রাক্টার, কেউ ব্যবসা করে।

কিন্তু মফিদুল সাহেবের দল তো সরকারে আছে!

সানু হাসে! শুনলেন না? বলল, কমিউনিস্ট এবং কমিউনিজম এক জিনিস নয়। ভোট পেতে হলে জনগণের সেন্টিমেন্ট বুঝে চলতে হয়। কাজেই চুপচাপ থাকা ভাল। বোবার শত্রু নেই।

লোকাল হিন্দুদের রোলটা কী?

লোকাল, মানে এই টাউনশিপের হিন্দুরা মাথা ঘামায় না। এরা আউট-সাইডার। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে এখানে এসে বাড়ি তুলেছে। নিজেদের গ্রামের খুনোখুনি দালাদলি অরাজকতা থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে আসা। কাঁটালিয়াঘাটে অতটা অরাজকতা অবশ্যি নেই। বরাবর কসমোপোলিটান ক্যারেক্টার বহাল আছে। কারণ এটা বাণিজ্য কেন্দ্র। আর ভানু খুব মিশুকে। ক্লাব-ট্লাব করেছে। ওর পপুলারিটি আছে।

ফয়েজুদ্দিন চুপচাপ হাঁটছিলেন। মোরশেদ বলেন, মামুজি চুপ করে গেলেন যে?

মামুজি বললেন, না বোবার শত্রু নেই, কথাটা ভাবছিলাম। আমি বড্ড টর্কোটিভ। ফয়েজুদ্দিন সানুর কাঁধে হাত রাখেন। একটু পরে ফের বলেন, কোন সময় লক্ষ্য করেছি, কোন কোন ঘটনা আমাকে সত্যি বোবা করে দেয়। কী বলব, কী করা উচিত বুঝতেই পারি না। যেমন ভানু-ভারতীর ব্যাপারটা। আবার এই সানুর ব্যাপারটাও।

সানু বলে, আমার আবার কী ব্যাপার?

আমাকে বোবায় ধরেছিল রে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম কী ঘটছে। অথচ —যাক গে মরুক গে!

মোরশেদ প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে যান। গত রাতে মিনি সানু এবং রুবি সম্পর্কে কিছু বলছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারেননি। প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে

তার ছাত্রীর প্রেম ট্রেম হতেই পারে। নতুন কোনও কথা নয়। আবার প্রেম মাত্রেই বিয়েকে ডেকে আনবে, তারও মানে নেই। প্রেম না করেও যে-বিয়ে হয়, তা একজন পুরুষ এবং একজন নারীকে ঘনিষ্ঠ করে। সেই ঘনিষ্ঠতাও প্রেমের জন্ম দিতে পারে। দাম্পত্য প্রেমও তো প্রেম। নাকি এর বাইরেকার প্রেমের স্বাদ অন্যরকম? ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় পর্ণা নামে এক সহপাঠিনীকে তাঁর ভালো লাগত। পর্ণাও তাঁকে পাত্তা দিত। কফি হাউসে ঘন্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলত মুখোমুখি। বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পর্ণার কথা আবেগ দিয়ে ভাবতেন মোরশেদ। সেটাই কি প্রেম ছিল? তারপর মোরশেদকে ডালাসে পাঠিয়ে দেন তাঁর ব্যবসায়ী-বাবা। পর্ণার সঙ্গে দু'বার চিঠি চালাচালি হয়। তারপর মোরশেদ চুপ করে যান। চুপ না করে উপায় ছিল না। বাবা তাঁর জন্য বউ ঠিক করে ফেলেছেন। পড়াশুনো শেষ করে বাড়ি ফিরলেই বিয়ে। আসলে প্রেম নিশ্চয় একটা সাহস দাবি করে। বিদ্রোহের সাহস। মোরশেদের তা ছিল না।

ছিল না। কিন্তু এখন, এতদিন পরে ছত্রিশ বছর বয়সে পর্ণা সম্পর্কে চিন্তা করলেই মনে হয়, কী হাস্যকর ছেলেমানুষী খেলা খেলেছিল! সেক্সের একটা অর্থ হয়, প্রেমের হয় না। প্রেম নির্বোধের স্বপ্নবিলাস। সে একজন 'ইয়াপ্পি'।

বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির কাছে পৌঁছে ফয়েজুদ্দিন বলেন, আমাদের প্রত্যেককে বোবায় ধরে গেল। কে কী ভাবছিলাম তা জানার চেষ্টা করা যাক। সায়েব! তোমারটা আগে বলো! ধরে নাও, বিদ্রোহী কবির সামনে এ একটা কনফেশন।

মোরশেদ হেসে ফেলেন। মামুজি! আমি প্রেম সম্পর্কে কিছু ভাবছিলাম।

বাহ্। সানু, তুই?

সানু আস্তে বলে, আপনার কথাটার মানে খুঁজছিলাম।

হুঁ। এবার আমারটা বলি। ফয়েজুদ্দিন সহসা তাঁর সেই অট্টহাসিটি হাসেন। আমি আসলে তো মুসলমানের বাচ্চা। স্বভাব যাবে কোথায়? মুসলমান মানেই সবতাতে এক্সট্রিমিস্ট। হয় এস্পার, নয় তো ওস্পার। শহিদ হও, নয় তো গাজি হও। হয় মরো, না হয় মারো। সানুটা মুসলিম-কুলকলঙ্ক।

তারপর তাঁকে চুপচাপ দেখে মোরশেদ বলেন, প্লিজ এক্সপ্লেন মামুজি!

সানুর কাঁধে চাপ দিয়ে ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি মৃদুস্বরে বলেন, যে বোঝবার, সে ঠিকই বুঝেছে। তুমি আউটসাইডার সায়েব! কী রে সানু? কী বললাম বুঝিসনি? আমার ভাবনার আউটলাইনটা লক্ষ্য কর।

সানু চুপচাপ হাঁটে। তার কাঁধে একটা বিশাল থাবার ভার।

ফয়েজ্বদ্দিন বলেন, আমার দ্বলাভাই মবিন খোন্দকার আমার হাত ধরে কসম খাইয়ে নিয়েছেন, হঠাৎ যদি তাঁর একটা কিছ্ব হয়ে যায়, র্ববির দায়িত্ব আমার এবং র্ববি যেন খানদান পায়। বললাম, যদি ওকে খানদান না দিতে পারি? খোন্দকার বললেন, র্ববি আইব্বড়ি হয়ে মরবে তোমার ফুফুজির মত। সায়েব, আমার বড় ফুফুজি নাইনটিন ফর্টি-টুতে ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন। বিয়ে করেননি।

মোরশেদ বলেন, ফর্টি টু-তে ম্বসলিম মহিলা ডিভিশনাল কমিশনার?

তোমরা নতুন জেনারেশন। কিছ্ব খবর রাখ না। আরও দেখ, ইসলামে সেলিবেসি খারাপ কাজ। গ্বনা হয়। এদিকে আমিও বড় ফুফুজির পদাঙ্ক অন্বসরণ করে চলেছি। না—ব্যর্থ প্রেমিক নই হে! বাঁশবনে ডোমকানা হয়েছিলাম। শেষে দেখলাম গায়ে চাকা গজিয়েছে। কেন অন্য একটা মান্বষকে কষ্ট দেব? অভ্যাসে সব সয়ে যায়। আবার একলা হওয়ারও একটা মজা আছে। কিন্তু সেই মজা কি সবাই বোঝে? র্ববিটা বোঝে না। তাই কী করতে কী করে বেড়ায়। ভেবেই পায় না কিছ্ব। এখন দ্বলাভাই বলছেন, আইব্বড়ি হয়েই মর্বক না। এটা কী সাঙ্ঘাতিক রাগ ব্বঝে দেখ। নিজের রং ডিসিশনের দায়িত্ব চাপাতে চাইছেন একটা অব্বঝ খেয়ালি মেয়ের কাঁধে। দ্বলাভাই কি মান্বষ? ফয়েজ্বদ্দিনের কন্ঠস্বর ভেঙে গেল। 'মান্বষ' শব্দটা আছাড় মেরে ভাঙলেন।

আর এই সময় সান্বর মনে হয়, তা হলে তো একটা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে র্ববিকে দেওয়া উচিত। সে তা দেবে। কেন না র্ববিকে বেঁচে থাকতে হলে স্বর্ণচাঁপা খ্বব প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ।…

৫

এইখানে এলে তার গা ঘিনঘিন করে। তার মনে হয়, এইখানে যেন জীবনের আবর্জনার স্তূপ। হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে আসে কটু গন্ধ। ভাঙাচোরা বাক্যাংশ, ব্যাকরণের নিয়মহীন—কেন না তার মধ্যে এক ছাত্রী আছে, যার কানে খচ করে বেঁধে। আর আর্তনাদের মধ্যে যন্ত্রণার জ্যামিতিগ্বলিও সে আবছা লক্ষ্য করে। কিন্তু এতদিন সে শরীর সম্পর্কে কিছ্ব চিন্তা করেনি। সেদিন স্নান করার সময় অতর্কিতে চিন্তাটা এসেছিল ব্রেসিয়ারটা টেনে নিতে গিয়ে এবং তারপর থেকে মাঝে মাঝে কী একটা হচ্ছে—সে নিজের জৈব অস্তিত্বের বাইরে থেকে শরীরকে দেখতে পাচ্ছে। তাই এইখানে এলেই তার মনে হচ্ছে, শরীর খ্বব বিপজ্জনক। শরীর কখনও আবর্জনা হয়ে পড়তে পারে।

আজ এইখানে এসেই সে সোজা এগিয়ে সবুজ পরদাটা একটু ফাঁক করেছিল :প্রথমে লম্বা টেবিলে অয়েল ক্লথের একাংশ প্রায় আধ সেকেন্ড, তারপর তোরাব ডাক্তারের বগলের ফাঁক দিয়ে বাকি প্রায় আধ সেকেন্ডের জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা উলঙ্গ একটা শরীর দেখেই পিছিয়ে এসেছিল। পাশের কেবিনের চৌকো ফোকর থেকে মুখ বাড়িয়ে হালিম কম্পাউন্ডার তা দেখতে পেয়ে রগড়ে খ্যা খ্যা করে হাসছিল। তোমার বেডরুমের পরদা, যে সরিয়ে শুতে যাচ্ছ? লাইন দাও। নাম লেখাও। তবে না?

রেবেকা চটে যায়। বাজে কথা বোলো না হালিমদা।

হালিম কম্পাউন্ডার একই রগড়ে বলে, দা-কাটারি কী গো? তুমিও দেখছি মফিদুল সাহেবের মেয়ের লাইন ধরব ধরব করছ!

রোগীরা সবাই মুসলমান হওয়ার দরুন রোগের কথা ভুলে হাসাহাসি করে। রেবেকা ঠোঁট কামড়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। সেই সময় তোরাব ডাক্তার বেরিয়ে আসেন। রেবেকাকে দেখে বলেন, আজকের ওষুধ তো দেওয়া আছে। আবার কী হল?

রেবেকা আবৃত্তির মত বলে, রাত্তিরে আব্বুর ১০২ ডিগ্রি জ্বর। মামুজি মাথা ধুইয়ে দিলেন। হাঁফের টান। কাশি খুব বেড়েছে। জ্বর ছাড়ছে না। গলা ব্যথা।

সিগারেট টেনেছিল নাকি?

আম্মি প্যাকেটসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

সবুজ পরদা তুলে এতক্ষণে যে লোকটা বেরিয়ে আসে,তার পরনে চেককাটা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। বেঁটে গাব্দাগোব্দা গড়ন। রেবেকা তাকিয়েই মুখ ঘোরায়, যেন সে লোকটাকে উলঙ্গ দেখতে পাবে! ডাক্তার সাহেব বলেন, এক মিনিট হাজিসাহেব। খোন্দকারের মেয়েকে ছাড়ি আগে। হুঁ—তা হলে তো—তোর মামুজিকে এই চিঠিটা গিয়ে দে। টাউনে চলে যাক। ডক্টর পি কে ব্যানার্জি। লাং-স্পেশালিস্ট। ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশে চেম্বার। আমি শিওর নই ডক্টর ব্যানার্জি আঠার কিমি দূরে কল অ্যাটেন্ড করবেন কিনা। তা ছাড়া কাল কালী পুজো। তোর আব্বুকে যে কিছুতেই রাজি করানো যাবে না। বড্ড গোঁয়ার। আবু তোরাব প্যাডে চিঠি লিখতে লিখতে বলেন, আম্মিকে চুপি চুপি বলবি অন্তত শ'পাঁচেকের ধাক্কা। আর মামুজিকে বলবি—না, আমি লিখেই দিচ্ছি। ইন কেস যদি ডক্টর ব্যানার্জি লোকাল এক্স-রে রিপোর্টের ওপর ভরসা না করেন, তা হলে—ঠিক আছে। পরের কথা পরে।

তোরাব ডাক্তার খাম বের করে চিঠি ভরে আঠা দিয়ে মুখ এঁটে দেওয়ার সময় রেবেকার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। তার দু'চোখ ততক্ষণ নিষ্পলক ছিল। খামের মুখে আঠা কেন? কেন চিঠিটা লুকিয়ে ফেলা হল? আব্বুর

শরীরের বিপজ্জনক কথা আছে কি ওতে? লেখা আছে কি খোন্দকারের শরীর আবর্জনা হয়ে উঠেছে?

শোন্! নতুন ওষুধ দেবার কিছু নেই। হাঁপের সময় ক্যাপসুলটা দেওয়া হচ্ছে তো?

আম্মি জানেন।

ডাক্তার হাসেন। তুই জানিস না? কী করিস? শুধু টি ভি দেখিস আর রেকর্ড প্লেয়ার বাজাস? হুঁ, শোন! তোর মামুজি ফিরে এসে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

রেবেকা বেরিয়ে এসে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। শরীর সহসা ভারী হয়ে গেছে। খামের মুখে আঠা কেন? কিন্তু তার এই গুরুতর প্রশ্নকে তখনই চেপে দেয় চারদিক থেকে মাইকের বিকট হুল্লোড়। এতক্ষণ মাইক বাজছিল। অথচ তার চিন্তায় মাইক ছিল না। কেন না ঘাটবাজারে এটাই স্বাভাবিকতা। একটা খামের মুখে আঠা কিছুক্ষণের জন্য সেই স্বাভাবিকতার ভিড়ে মিশে যাওয়ার মত একাকার হয়ে গেল। তারপর শর্টকাট করতে গিয়ে তার মনে পড়েছিল সামিরুনের চুলের ফিতে কেনার কথা। এটা তার এবং সামিরুনের দীর্ঘকালীন গোপন বোঝাপড়ার একটা শর্ত। রোকেয়ার সংসারের আড়ালে এই বোঝাপড়া আছে। মামুজির হাত থেকে লুঙ্গি-গেঞ্জি ছিনিয়ে নিয়ে কেচে দেওয়ার দরুন কালোর ভাইঝি একটা দু'টাকার নোট বখশিশ পেয়েছিল। বখশিশটাও গোপনীয় ছিল। রোকেয়া দেখতে পেলে না না না না করে উঠতেন আর তাঁর ভাইজানকে বলতেন, টাকার লোভ সাঙ্ঘাতিক লোভ। এই বাক্যের ভিন্ন একটা মাত্রা আছে, রেবেকা জানে। টাকা এই মেয়েগুলিকে নাকি খারাপ করে দেয়, কেন না এরা 'আতরাফ'।

রেবেকা জয় মা কালী স্টোর্সে গিয়ে লাল ফিতে কেনার সময় কাকলিকে দেখতে পায়। কাকলি চেঁচিয়ে ওঠে, রুবি, তুই!

এমন চেঁচিয়ে ওঠার কিছু ছিল কি? রেবেকা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে সে হাসে। আস্তে বলে, কবে এলি?

কাল বিকেলে। কালীপুজো দেখাতে এনেছি তোর জামাইবাবুকে। বিশ্বাসই করে না কঙ্কালের নাচ। তুই বল, সত্যি কি না! কাকলি গম্ভীর হয়। কালই তো অমাবস্যা। স্বচক্ষে দেখবে। রুবি, তোর বিয়ে কোথায় হয়েছে রে?

কলকাতায়। তারকদা, ফুলকাটা লাল ফিতে কত করে গো?

কাকলি বলে, এ রাম! ওই ফিতে তুই কী করবি? কলকাতার বউ হয়েছিস—এ সব কি ভদ্রলোকের বউঝিরা পারে?

তারক বলে, ডেড়টাকা পিস! ডেড়টাকা পিস!

রেবেকা বলে, দাও। আর ওই ক্লিপগুলো—ওই যে। হ্যাঁ। হ্যাঁ ঐ লালগুলো! কত দাম তারকদা?

চার আনা পিস! চার আনা পিস! বাটারফ্লাই ক্লিপ চার আনা পিস!

লাল দু'টাকার নোটটা একটা অনাথ আতরাফের মেয়েকে তিনটে ঝলমলে খুশি দেবে! রেবেকার মাঝে মাঝে এ ধরনের ঘটনা খুব বিস্ময়কর মনে হয়। আশে পাশে কত খুশি ছড়ানো আছে, সহসা আবিষ্কার করলে চমকে যেতে হয়। তা হলে দুঃখ কেন? কেন দুঃখ এসে গোপনে ছুঁয়ে দেয়? কোন পথে আসে? বাড়িতে কুকুর-বেড়াল ঢুকলে রোকেয়া যেমন রেগে গিয়ে পুনঃপুনঃ বলেন, ঢুকল কেন? কী করে ঢুকল? বল্ কী করে ঢুকল হারামজাদি মেয়ে? রেবেকা মনে মনে তেমন করেই বলতে থাকে, দুঃখ কেন? কিসের দুঃখ হারামজাদি মেয়ে? বল্ এক্ষুনি! নইলে—

কাকলি তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকে দেখছিল। আচ্ছা রুবি! কানের কাছে মুখ এনে সে বলে, কটা বাচ্চা রে তোর?

তিনটে। তোর?

একটা। মাথা খারাপ? কাকলি তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। একটা বাচ্চা মানুষ করতেই হিমশিম খাচ্ছি। যা-ই বল্ রুবি। তোদের এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা উচিত। তোর জামাইবাবু বলে, মুসলমানরা মেজরিটি হবার প্ল্যান করেছে। আমি ও-সব বুঝি না। শুধু বুঝি, বেশি বাচ্চা হলে লাইফটা এনজয় করা যায় না। তুমি নিশ্চয় কালীপুজো দেখতে এসেছিস? তোর জামাইবাবু বিশ্বাসই করে না কাটলেঘাটে মুসলমানরা কালীপুজোয় পার্টিসিপেট করে। আমি ওকে ইয়াকুব সাধুর গল্পটা বলেছিলাম। উড়িয়ে দিল। ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

শর্টকার্ট করব। বাবার অসুখ। ওষুধ নিতে এসেছিলাম রে!

কী হয়েছে খোনকারকাকুর?

রেবেকা আবৃত্তি করে যায়। আবৃত্তির একটা টান আছে। সেই টানে খামের মুখে আঠার কথাটাও এসে গিয়েছিল।

আর এইতেই কাকলি একটা সর্বনাশ উগরে দেয়, ক্যান্সার নয় তো রুবি? ক্যান্সার খুব বেড়ে গেছে। আমার মেজভাসুর মরে গেল। ডাক্তার ধরতেই পারেনি যে লাং-ক্যান্সার। শেষে কলকাতা নিয়ে গেল। লাস্ট স্টেজ। তবে জানিস? মা বলে পাঠিয়েছিল, এখানে এনে ত্রিনয়নীতে দেখাতে। গ্রাহ্যই করেনি। তুই এক কাজ কর। ত্রিনয়নীতে আয়। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

রেবেকা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আয় না বাবা! কালীজ্যাঠা বেশি নেন না। শুধু মায়ের ভোগের

জন্য দু-দশটাকা। তা-ও মুখ ফুটে চান না। বাবার বাত সেরে গেছে জানিস? আয়!

অনিচ্ছা-অনিচ্ছা ভাবটুকু কেটে যায় রেবেকার। ত্রিনয়নী দৈব ঔষধালয়ে থেকে মুসলমানরাও ওষুধ নিয়ে যায়, সে শুনেছিল। এরপর তার প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে আশা দিতে থাকে। রোকেয়া ভোরবেলায় নামাজের পর বলছিলেন, দাদাপীরের মাজারে আগরবাতি দিতে হবে। ছবি থাকলে অ্যাদ্দিন—ভাইজান! বিকেলে ঘাটবাজার থেকে খুশবুদার আগরবাতি এনে দেবেন যেন।

ত্রিয়নয়নী দৈব ঔষধালয়ের ভেতরে একটা তক্তপোশের ওপর গদিতে সাদা চাদর পাতা। কয়েকটা তাকিয়া ছড়ানো আছে। তার ওপর বসে কয়েকজন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ একটা দাবার ছকের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। কেউ মুখ তোলেন না। উলটোদিকে একটা ছোট্ট বেদিতে মড়ার খুলি, গাঁদা ফুল, তামার কোষাকুষী এবং যথেচ্ছ ভয়ঙ্কর সিঁদুর। পাশে জলচৌকিতে চিতাবাঘের চামড়া পাতা। বেদি এবং জলচৌকির মাঝখানে একটা ত্রিশুল পোঁতা আছে। ত্রিশুলেও সিঁদুর। ঘরে ধুপের গন্ধের সঙ্গে আরও কী এক গন্ধ। গন্ধের কি হিন্দু-মুসলমান হয়? ধর্মের জায়গায় হয়। প্রতিমার সামনে গেলে কি কোন মন্দিরের দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় রেবেকার এই ভিন্নতার বোধ এসে যায়।

কাকলি ডাকে, কালীজ্যাঠা! ও কালীজ্যাঠা!

এতক্ষণে রেবেকা লাল ফতুয়া আর লাল লুঙ্গিপরা মানুষটাকে দেখতে পায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে তামার বালা। মাথায় জটা আর মুখে ঝাঁপাল দাড়ি। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। জটায় একটা জবাফুল গোঁজা আছে। দু'চোখে পাগলাটে চাউনি। সহসা সেই মানুষ নিঃশব্দে হাসতেই চেহারার নিষ্ঠুরতা মুছে করুণা ও আশ্বাসে ঘর ঝলমলিয়ে উঠল।

কাকলি বলে, উঠে আসুন না কালীজ্যাঠা। কথা আছে।

কালীজ্যাঠা তক্তপোশ থেকে নেমে দাঁড়ালে সে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। রেবেকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কালীজ্যাঠা বলেন, এটা কে রে?

আমার মুসলমানপাড়ার বন্ধু। খোনকারকাকুর মেয়ে রুবি, খোনকারকাকুর কী অসুখ হয়েছে। রুবি! বল্ না।

দাবাড়ুরা কেউ কেউ ঘুরে একবার দেখে নিয়েছিল। কালীজ্যাঠা জলচৌকিতে আসন করে বসে বলেন, বল মা, বল।

রেবেকা করজোড়ে নমস্কার করে। আবৃত্তির মত অসুখের কথা বলে যায়। কালীজ্যাঠার মুখটা তার চেনা লাগছিল। ক্রমে মনে পড়ে যায়। প্রাইমারি সেকশনে ভুলোনবাবু বাংলা পড়াতেন। তখনও গার্লস স্কুলে

দিদিমণিরা আসেননি। ভুলোনবাবু রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনাতেন। সেই ভুলোনবাবুর ছোট ভাই কালীবাবু কোন-কোনদিন গিয়ে ক্লাসে উঁকি মেরে ফিক করে হাসতেন। ভুলোনবাবু চেঁচিয়ে উঠতেন, ধর! ধর! অমনই কালীবাবু দৌড়ে গিয়ে কল্কে ফুলের জঙ্গলে ঢুকে উধাও। রাস্তাঘাটেও পাগলামি করে বেড়াতেন। তারপর কোথায় চলে গেলেন খবর নেই। সেই কালীবাবুকে এত বছর পর এভাবে আবিষ্কার করে রেবেকা বিস্মিত হয়। সার! আপনি বলতেন, আমাদের চারপাশে কত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। সেইসব ঘটনা জীবনকে মিনিংফুল করে। কিন্তু চোখ থাকা দরকার। লেখাপড়া চোখ খোলার একটা চেষ্টা। সার! এই যে এখানে এসে যা দেখছি, তা বিস্ময়কর নয় কি? একটা পাগল মানুষের মুখের সেই হাসি তখন লক্ষ্য করিনি। এখন দেখছি, সে পুরনো হাসির মধ্যে এইরকম কত কিছু ছিল। বেদি, মড়ার খুলি, চিতাবাঘের চামড়া, ত্রিশূল, আরোগ্যের স্বাস্থ্য, প্রাণ, এইসব।

এবং আব্বুর ওষুধও! সার! অসুখ সারুক বা না-ই সারুক, তোরাব ডাক্তারের ওষুধও তো আব্বুর অসুখ সারাতে পারছে না, তবু ওষুধ জিনিসটা কি মিথ্যে? মানুষেরা মরে যায়, তবু মানুষ কি মিথ্যে? একজন পাগল একজন দৈবচিকিৎসক হয়ে ফিরে আসেন, এই ফিরে আসাটা কি মিথ্যে? রেবেকা সহসা চমকে উঠে তাকায়। কেন এত কথা তার মনের ভেতর বুদবুদ হয়ে ফোটে আর ভেঙে যায়? কেন সারাক্ষণ একজন সার তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন? এটা ঠিক নয়। কখনই ঠিক নয়।

দৈবচিকিৎসক চোখ বুজে বিড়বিড় করে কিছু আওড়াচ্ছিলেন। তারপর তার ডানহাত ত্রিশূলের দিকে চলে যায়। সেই হাত বেঁকে গিয়ে মড়ার খুলির ওপর থেকে ঘুরে আসে এবং মুষ্টিবদ্ধ হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাত বুকের কাছে এসে খুলে যায় এবং রেবেকা সেই হাতের তালুতে বাঁকাচোরা একটুখানি শেকড়ের মতো জিনিস দেখতে পায়। পাশ থেকে কাকলি তাকে খুঁচিয়ে দেয়। আর দৈবচিকিৎসক বলেন, লাল সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, বুঝলি মা? কিন্তু গেরোর ব্যাপার আছে। আড়াই পাক গেরো। সুতো দিচ্ছি। আড়াই পাক গেরোয় বেঁধে দিচ্ছি।

লাল সুতোর গোছা পাশের দেওয়ালে পেরেক থেকে ঝুলছিল। তার একটু ওপরে কাত হয়ে থাকা ফ্রেমে বাঁধানো এক সন্ন্যাসীর ছবি, যিনি যে-কোনও মুহূর্তেই ছবি থেকে জ্যান্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, এমন মনে হয় রেবেকার। দৈবচিকিৎসক সুতো গ্রহণের সময় ছবির দিকে ঘুরে চোখ বুজে করজোড়ে প্রণাম করেন। তারপর 'আড়াইপাক গেরো'-তে শেকড়টা বেঁধে বলেন, দু'হাত পেতে নিতে হয় রে মা।

কার্কালর খোঁচা খেয়ে রেবেকা হ্যাণ্ডব্যাগ বগলে চেপে দু'হাত বাড়ায় এবং দৈব-ওষুধ গ্রহণ করে। কাকলি ফিসফিস করে বলে, এক্ষুনি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখ্। বাড়ি গিয়ে খুলে বাবার গলায় পরিয়ে দিবি। কালীজ্যাঠা! কত লাগবে?

তুই নিয়ে এসেছিস। তোর বন্ধু। যা দেবে, দিক না! আমি কি ওষুধ বেচার ব্যবসা করি পাগলি?

তা-ও কত, বলুন না কালীজ্যাঠা?

কাল মায়ের পুজো, কী বলব?

কাকলি রেবেকার কানে-কানে বলে, দশটা টাকা দিয়ে দে। আছে?

তোরাব ডাক্তারের নতুন ওষুধের কথা ভেবে রোকেয়া একটা দশটাকার নোট দিয়েছিলেন। রেবেকা নিঃসাড় হাতে চেন খুলে সেই নোটটা দৈব চিকিৎসকের সামনে এগিয়ে দেয় এবং তিনি তা দু'হাতে গ্রহণ করে চোখ বুজে সেই নোটসহ হাতদুটি কপালে ঠেকান। তারপর চোখ খুলে তাঁর বিস্ময়কর নিঃশব্দ হাসি হাসেন। রেবেকা দেখে, পৃথিবীজুড়ে নিরাময়ের আনন্দ ঝলমলিয়ে উঠল।

বাইরে গিয়ে কার্কাল জয়ের হাসি হাসতে হাসতে বলে, আমি বলে তা-ই। অন্য কেউ হলে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তুই দেখবি, তোর বাবার অসুখ সেরে যাবে। তবে কী জানিস রুবি? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু—খোনকারকাকু যদি হিন্দু সাধুসন্নেসির দৈবওষুধ বলে—

না, না! রেবেকা বলে ওঠে। ওষুধের হিন্দু-মুসলমান কী রে?

ঠিক। তবে তোর অবাক লাগল না? কালীজ্যাঠার হাতে ওষুধটা কী করে এল দেখলি? ম্যাজিক বলবি তো? কালীজ্যাঠা ম্যাজিক জানলে ম্যাজিশিয়ান হয়ে অনেক বেশি টাকা কামাতেন। এই কাঁটলেঘাটে পড়ে থাকতেন না। চলি রে! কালীপুজোর বাজি পোড়ানো দেখতে আসবি তো?

রেবেকা মাথাটা শুধু দোলায়। ভিড়ের রাস্তায় একটা খালি রিকশ দাঁড় করিয়ে কার্কাল উঠে বসে। শাঁখাপরা একটা হাত নাড়ে। রেবেকাও একটা হাত নাড়ে। তার হাতে লাল প্লাস্টিকের বালা এঁটে বসে আছে।

আজ আকাশ আবছা নীল। মেঘ নেই। ভোরে ঘন কুয়াশা জমেছিল। সেই কুয়াশা ঘরবাড়ি-দোকানপাটের ফাঁক দিয়ে দেখা দূরের গাছপালায় এখনও কিছু ছাপ রেখেছে, যদিও সূর্য ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নগ্ন নির্জন খেলার মাঠ পেরিয়ে শর্টকাটে কাজিপাড়া ঢোকার সময় তার মনে পড়ে যায় মিনিআপার কথা। আজ এতক্ষণে ওঁদের গাড়ি কতদূরে ছুটে যাচ্ছে কে জানে। কাল সন্ধ্যায় মিনিআপা কত বছর পর তাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আম্মি বলেছিলেন, গাড়ি দেখাতে আসে। আর সেই আম্মি মিনিআপাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে অস্থির। আব্বু কথা বলতে গেলেই কাশি—কাশির মধ্যে

কতবার 'খানদান খানদান' বেরিয়ে আসছিল, যেন রক্তমাখানো শব্দ, কিংবা শব্দটাতে পুরনো রক্তের ছিটে আছে, কাশির সঙ্গে ছিটকে পড়ে। মিনিআপা শুধু এক গ্লাস শরবত খেলেন। টনিকে আনেননি সঙ্গে, কেননা সন্ধ্যাবেলা, শিশির এবং সিজিন চেঞ্জের সময়। ঘুরে-ঘুরে সারা বাড়ি দেখতে গিয়ে হঠাৎ হাসনুহেনার ঝাঁঝালো সৌরভে ঈষৎ আবিষ্ট হয়েই মিনিআপা বলছিলেন, কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িতে মাটি কোথায়? তবে টবে ঝোলানো রঙবেরঙের প্ল্যাণ্ট। বনসাই আছে দুটো। ও রুবি! বনসাই বুঝিস তো? রেবেকা চুপ করেছিল। শিউলির গন্ধ পেয়ে মিনির ঈষৎ নস্টালজিয়ার উদ্রেক হয়েছিল। রুবি! এই গন্ধটা পেলেই পুরনো দিনগুলো মনে ভেসে আসে। কিন্তু যেখানকার যা লাইফ-স্টাইল, তার মধ্যে ঘাড় গুঁজে বাঁচতে হয় মানুষকে। মিনিআপার শ্বাস ছাড়ার শব্দটা মনে পড়ছে। ঝড়ের মত এসে ঝড়ের মত চলে গেলেন। আর রোকেয়া হ্যাংলার মত সদর দরজায় গিয়ে বলেছিলেন, মিনি! রুবির জন্যে একটা ছেলে খুঁজে দিস না মা! চোখে বেঁধে। এদিকে পাঁচজনের পাঁচ কথা। হাজার হলেও পাঁড়াগা। ছেলে গরিব হোক না! তোর খালুআব্বার ওই একটা বাতিক, খানদান। তা হলেই চলবে। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে। ছবি তো এর আশা করে না। রুবি আর দামাদমিয়াঁ ভোগদখল করবে। ঘরজামাই হয়ে থাকলে শরমেরই বা কী আছে? তাই না! মিনি, একটু মাথায় রাখিস মা!···

রেবেকা কোনওদিকে তাকায়নি। সোজা বাড়ি ঢুকেছিল। ঢুকতেই রোকেয়া মারমূর্তি। দুনিয়া ডুবলেও তোর হাঁটুপানি হারামজাদি? এত দেরি হল কেন? কেন এত দেরি হয়? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কার দুয়োরে ঘুরছিলি?

আম্মি! তোরাবচাচাজির ডিসপেন্সারিতে লম্বা লাইন। রেবেকা হাসতে হাসতে বলে। লাইন পেরিয়ে কাছে যেতে এক ঘণ্টা। কাল কালী-পুজো না?

কালীপুজো, তাতে তোরাবমিয়াঁর কী? আমার সঙ্গে চালাকি করবিনে বলে দিচ্ছি।

রেবেকা রোকেয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে যায়, হিন্দুদের অসুখ-বিসুখ হয় না বুঝি? তারা তোরাব চাচাজির কাছে যায় না? মামুজি কোথায় আম্মি?

রোকেয়া মেয়েকে অনুসরণ করেন। গলার ভেতর বলেন, ভাইজানের আর কী? উড়ো পাখি। এ ডাল থেকে সেইডালে। কী ওষুধ দিলেন ডাক্তার-সাহেব?

আব্বুর ঘরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই রেবেকা কয়েক পা সরে আসে। আম্মির কানের কাছে মুখ এনে বলে, মামুজিকে এখনই টাউনে যেতে হবে।

এই দেখুন, ডাক্তারচাচাজি চিঠি লিখে দিয়েছেন। আপনাকে বলতে বলেছেন, শ পাঁচেক টাকা খরচ হবে। পড়তে পারছেন নামটা ?

খামটা নিতে রোকেয়ার হাত ভারী হয়েছিল। ডাক্তারসাহেবের হাতের লেখা পড়তে পারেন না, যদিও ছাপা হরফে ইংরেজি পড়তে অসুবিধে হয় না। বোবার চোখে তাকিয়ে থাকেন রোকেয়া।

রেবেকা চাপা গলায় বলে, ডক্টর পি কে ব্যানার্জি। লাং-স্পেশালিস্ট। ওয়াটারট্যাঙ্কের কাছে চেম্বার। মামুজিকে কেন যেতে বললেন, বুঝতে পেরেছি। মানুষ পটাতে মামুজি ওস্তাদ।

থেমে যায় সে। না—এখন একটা দুঃসময়। তামাসা নয়। হাসি নয়। খামের মুখ আঁটা আছে। খামটার দিকে তাকাতে আবার ভয় করছে। সে ফের বলে, মামুজিকে খুঁজতে পাঠান আম্মি। কালোভাই নেই ?

রোকেয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বলেন, মাঠে গেল।

সামিরুনকে বলুন তা হলে। ও ঠিক খুঁজে বের করতে পারবে। বলেই রেবেকা মাথা দোলায়। নাহ। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাল কালীপুজো। আম্মি! আমি যদি যাই ?

ঘর থেকে কাশির শব্দ কানে ঝাঁপিয়ে এল। রেবেকা ঘরে ঢুকে পড়ে। মবিন খোন্দকারের চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে আসছে দেখে সে হ্যান্ডব্যাগ থেকে সেই দৈবওষুধটা গলায় পরিয়ে দেয়। রোকেয়া দেখতে পেয়েছিলেন। প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে যান। রেবেকা আব্বুর বুক ডলে দেবার ভঙ্গিতে শেকড়টা গেঞ্জির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। কাশি থামার পর খোন্দকার গলার কাছে হাতড়ে লাল সুতোটা একটু তুলে ধরে দেখেন। শুধু বলেন, কী ?

রেবেকা বলে, পরে বলব আব্বু! আম্মি! বাইরে চলুন, বলছি।

রোকেয়ার বুদ্ধিসুদ্ধি কাজ করছিল না। বাইরে বারান্দায় তাঁকে রেবেকা টেনে নিয়ে যায়। আস্তে বলে, গলা থেকে আব্বু যেন ওটা ফেলে না দেন। চোখে-চোখে রাখবেন আম্মি! আর—পাঁচশ টাকার কী হবে ? নেই টাকা ?

আছে। কিন্তু—

আহ! এখন কোন কিন্তু-টিন্তু নয়। আর শুনুন, যে দশটাকা দিয়েছিলেন, তা দিয়ে ওই ওষুধটা কিনেছি। পরে বুঝিয়ে বলব। আমাকে দশটা টাকা দিন। ট্রেন ভাড়া, রিকশভাড়া। টুলুভাইকে ডেকে নিয়ে ডক্টর ব্যানার্জির কাছে যাব। হুঁ! যদি অ্যাডভান্স চান ? একশটাকা তো দেওয়া উচিত। তাই না আম্মি ? শিগগির! এগারোটায় একটা ট্রেন আছে। বাসে গাদাগাদি ভিড় হয়।

রোকেয়া সহসা শক্ত মুখে বলেন, না।

কী না ?

তুই একা যাবি না। টাউন-ফাউন জায়গা। তুই একা যাবি না।

রেবেকা রেগে ওঠে। টাউন-ফাউন জায়গা তো কী হয়েছে? ছবি যে একা রোজ যেত, তার বেলা?

ছবি যেত, যেত। তুই কি ছবির মতো?

আমি কী? রেবেকার গলা কেঁপে যায়। কী আমি আম্মি?

কথা বাড়াসনে। আমি দেখছি।

আম্মি! আমি যদি কলেজে যেতাম? একা যেতে হত না?

যাস্‌নি তো! বলে রোকেয়া ডাকেন, সামিরুন! সামিরুন!

আর রেবেকা ছুটে গিয়ে তার ঘরে ঢোকে। বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গোঁজে। তার পিঠ কাঁপতে থাকে। খোঁপা ভেঙে চুলগুলি বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে অলীক প্রপাতের মত মেঝেয় ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'ছবি' শব্দটা তাকে আজ এই দুঃসময়ে আবার অন্যভাবে আঘাত করেছিল। 'ছবি' শব্দটা তাকে আঘাত করে।

সামিরুন রান্নাঘর থেকে সাড়া দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় ছোটবুবুর ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকিয়েছিল। কেননা, জোরে দরজা খোলার শব্দ শুনেছিল সে। ঈষৎ হতবুদ্ধি সে। রোকেয়ার কাছে গিয়েও দ্বিতীয়বার বলে, মাজি?

ভাইজান কোথায় আছেন জানিস? খুব যে হেসে হেসে কথা বলছিলি তখন! বলে গেলে তোকেই বলে যান। অ্যাই হারামজাদি! মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস? বল্‌, কোথায় গেছেন ভাইজান?

সামিরুন তোতলায়। মামুজি—মামুজি তো—সে প্রচণ্ড চেষ্টা করে টাটকা স্মৃতিটুকু যাতে ফিরে আসে। পেটে আসছে, মুখে আসছে না মাজি!

রোকেয়া গজগজ করেন, কেনই বা ঢঙ করতে আসেন, যদি আপদ-বিপদের সময় মাথার কাছে না থাকবেন? চোখে দেখেও টর হল না মানুষের, কীরকম এখন-তখন অবস্থা? ফকির হয়ে তসবিদানা হাতে নিয়ে দাদাপীরের দরগায় গিয়ে বসলেই তো পারেন।

মাজি! মনে পড়েছে! সামিরুন ছটফটিয়ে বলে ওঠে। মামুজি মশকরা করছিলেন ছোটবুবুকে জিনে ধরেছে। তা'পরে বললেন, জিনের ডাঙায় ঘুরে আসি। দাঁড়ান মাজি, ডেকে আনছি!

সে খিড়কির দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। গভীর ডোবার পাড় দিয়ে ঘুরে লাল মাটির বাঁজা ডাঙায় পেঁছে একটু দাঁড়ায়। এটাই জিনের ডাঙা। লোকেরা মাটির ঘর রাঙা করার জন্য মাটি খুঁড়ে নিয়ে যায় এখান থেকে। টুকরো-টুকরো ইট বেরিয়ে পড়ে। নিচের গঙ্গার পুরনো মজে-যাওয়া খাত এখন জলেভরা ঝিল। এইখানে নাকি কোন জিনের দালান বাড়ি ছিল।

সামিরুন চেরা গলার ডাকে, মামুজি ! মামুজি !

একটু পরে ফয়েজুদ্দিনকে দেখতে পায় সে। ঝিলের ধার থেকে প্রথমে মাথা, তারপর ক্রমে বিশাল শরীরটা উঠে আসে। কী রে ? বলে তিনি লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসেন। আকলুর মাছ ধরা দেখছিলাম। কোথায় মাছ ? খালি গুগলি আর ঝিনুক।

মাজি ডাকছেন মামুজি। শিগগির চলুন !

যাচ্ছি তো ! তোর মত শ্যাওড়াগাছের পেত্নি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ? দুলা-ভাইয়ের হাঁপ উঠেছে নাকি ? রুবি আসেনি ?

ফয়েজুদ্দিনের সঙ্গে হাঁটতে হলে দৌড়ুতে হয়। সামিরুন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, ছোটবুবু এসে দড়াম করে দরজা খুলেই উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। মাজি খুব মুখ করছেন !

লে হালুয়া। মায়ে বেটিতে ঝগড়া নাকি রে ?

সামিরুন বুঝিয়ে বলতে পারে না, কেন না সে কিছু জানে না। তাই সে ফের বলে, মাজি খুব মুখ করেছেন। আপনাকে ডাকতে পাঠালেন।...

ফয়েজুদ্দিন রেবেকার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একবার দাঁড়িয়ে-ছিলেন। রেবেকা বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দেখে নিয়ে তিনি বোনের কাছে গেলেন।

রোকেয়া বলেন, ভাইজান। এই দেখুন ডোক্তারসাহেব টাউনে কোন ডাক্তারকে চিঠি লিখে দিয়েছেন। এখনই যেতে হবে। পাঁচশ টাকা খরচ হবে নাকি। রুবি জেদ করছিল একা যাবে। তাই বারণ করেছি, আর অমনই মেয়ের—ভাইজান ! খামের মুখ আঁটা দেখে বুক কাঁপছে। কাল আবার কালীপুজো। আজই যেতে হবে। এগারটায় ট্রেন আছে নাকি।

খামটা নিয়ে ফয়েজুদ্দিন পড়ে দেখেন। তারপর গলার ভেতর বলেন, যাচ্ছি।

রুবি বলছিল যদি অ্যাডভান্স লাগে ? একশটা টাকা হাতে নিয়ে যান। আর রাহা খরচ—

ফয়েজুদ্দিন ভুরু কুঁচকে বাঁকা হেসে বলেন, এই জন্য তোকে দুটো নামে ডাকি ! বেবি আর বুড়ি ! এখন তোর বেবির টোন। ছেলেবেলায় আব্বা তোর এই টোন শুনে আদরে ডাকতেন, বে-এ-বি-ই ! টাকা দেখাচ্ছিস রে ?

রোকেয়া কেঁদে ফেলেন। ভাইজান ! আমার মাথার ঠিক নেই। হাত-পা কাঁপছে। লাং-স্পেশালিস্টকে চিঠি।

দুলা ভাইয়ের কাছে গিয়ে বস। আমি বাসেই যাচ্ছি। একটা কথা। চুপচাপ মুখ বন্ধ করে থাকবি। তোর প্রেসার উঠলে এইটুকু এইটুকু দুটো মেয়ে বিপদে পড়বে। আর, সেই এক্সরে প্লেট আর প্রেসক্রিপশন দে। ডক্টর ব্যানার্জি

দেখতে চাইতে পারেন। বলে ফয়েজুদ্দিন নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক বদলান। ঝকঝকে শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে আসেন। কই রে বুড়ি? বোবার শত্রু নেই। মনে রাখিস!···

খোন্দকার আবার লাল সুতোটা তুলে দেখছিলেন। রোকেয়ার ভিজে চোখ তিনি দেখতে পাননি। তাঁর আঙুল লাল সুতোটা নিয়ে খেলা করছিল। একটু পরে বলেন, রুবিকে বকছিলে কেন? কিসের তকরার?

কথা বোলো না। ডাক্তারসাহেব বারণ করেছেন কথা বলতে।

ফজু মিয়াঁ কোথায় গেল?

রোকেয়ার মনে হয়, খোন্দকার দূর থেকে কথা বলছেন। তাঁর কপালে হাত রেখে রোকেয়া আস্তে বলেন, গলার ব্যথা বাড়বে। এক কাপ গরম দুধ এনে দিচ্ছি। আরাম পাবে।

না। ঠাণ্ডা কিছু।

ডাক্তারসাহেব কাল বারণ করলেন না ঠাণ্ডা খেতে?

খোন্দকার লাল সুতোটা টানছিলেন। তারপর সেই বাঁকা খুদে শেকড়টা বেরিয়ে এল। বাঁ হাতে বালিশের পাশ থেকে চশমা তুলে চোখে পরেন। বলেন, রুবির কাণ্ড? তারপর হাসতে গিয়ে কাশিটা এসে যায়।···

তখন সামিরুন রান্না ঘরে ভাতের ফেন গালতে গিয়ে রেবেকার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোটবুবু উপুড় হয়ে আছে। একটু নড়ছে না। চুলের ফিতের প্রশ্নটা সামিরুনের ভেতর ধড়ফড় করছিল। শেষাবধি সে সাহস করে খুব আস্তে ডাকে, ছোটবু!

এই সময় তার একটা হাত শক্ত নির্ভরতা পেতে চৌকাঠ ছুঁয়েছিল। 'ছোটবুবু' থেকে শেষ ধ্বনি একটা 'বু' বাদ পড়ে যায় তখন, যখন সে, একজন আতরাফ মেয়ে, একজন আশরাফ মেয়ের খুব কাছাকাছি পেঁছুতে চায়। 'বু' বাদ দেওয়ার মধ্যে একটা কাকুতি মিনতিও কাজ করে।

আর রেবেকা একইভাবে শুয়ে থেকে একটা হাত বুকের তলা থেকে বের করে। সেই হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল। সেই একটা মাত্র হাতের আঙুল কারিগরি দক্ষতায় ব্যাগটা খুলতে পারে এবং টেনে বের করে কয়েকটা থুপি-সাজানো লাল ফিতে, ক্রমে দুটো প্রজাপতি ক্লিপ। সেগুলি ছুড়ে দিলে সামিরুনের লাল ফ্রকে ঢাকা বুকে এসে পড়ে। সামিরুন আবেগে গ্রহণ করে দেখতে দেখতে বলে, ছোটবু! মাজি কাঁদছিলেন। মামুজিকে ডেকে এলাম জিনের ডাঙা থেকে। তা পরে মামুজি বেরিয়ে গেলেন।

রেবেকা ঘোরে না দেখে সে ফের বলে, এগুলা পরে বাজি পোড়া দেখতে যাব। মাজিকে বলে রেখেছি। ছোটবু! আমার চুড়ি—মনে আছে তো? আজ না। কাল হলেও চলবে। পরশু বিকেলে ঠাকুর ভাসাবে। অনেক

দেরি! ছোটবু! গেলবছরকার মতো তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো? তুমি না গেলে কালোচাচার সঙ্গে যাব। দুগ্গাপুজোয়, কালোচাচার সঙ্গে ঠাকুর ভাসানো দেখতে গেলাম। মাজি দিয়েছিলেন একটাকা। আর তোমার দু'টাকা। চাচা পাঁপর জিলাপি ঝুরিভাজা কিনে আদ্ধেক গামছার খুঁটে বেঁধে নিয়েছিল। বলে কী, তুই এতগুলা খেতে পারবি নাকি? বড্ড ঠ্যাঁটা—কালো চাচা।

রেবেকা এতক্ষণে ঘুরে চিত হয়ে শোয়। তার দু'চোখ এখন শুকনো। কিন্তু মুখটা লালচে। সে আস্তে বলে, মামুজি টাউনে গেলেন, জানিস?

গেলেন তো বেরিয়ে। লতুন জামা-প্যান্ট পরেছিলেন। পায়ে চড়ো জুতো! আমি পালিশ করে দিয়েছিলাম না?

চড়ো জুতো মানে বুট জুতো। রেবেকার মনে স্বস্তি ফিরে আসে। ভেবেছিল মামুজি খামের মুখে আঠাকে গুরুত্ব দেবেন না। মামুজি নিজের সম্পর্কে একবার বলেছিলেন আনপ্রেডিক্টেবল ম্যান। তখন সার থাকায় মানে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন! গত বছর একদিন সহসা তার মনে হয়েছিল, সে নিজেও কি তা-ই নয়? কী করতে গিয়ে কী করছে। কোথায় যেতে গিয়ে কোথায় যাচ্ছে। পরমেশ্বরীর দিকে যেতে যেতে কখন উলটো রাস্তায় স্টেশনকোয়ার্টারে তপতীজেঠিমার মেয়ে সোমার কাছে। তপতীজেঠিমার বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান ছিল না। কাঁটালিয়াঘাটে বাইরে বাইরে যত মেলামেশা থাক, তার কোন হিন্দু বন্ধু বিছানায় টেনে শুইয়ে দেবে সোমার মত? বড়জোর উঠোন থেকে বারান্দা, তারপর বাইরের বসার ঘর। সেটাই শেষ সীমানা। অথচ তার হিন্দু বন্ধুদের সে সোজা এই ঘরের ভেতর এনে বসিয়েছে। রেলের লোকেরা সত্যিই অন্য রকম। মামুজির মতো। তাদের হিন্দু-মুসলমান থাকে না।

ছোটবু! কাল বাজিপোড়া দেখতে যাবে না? কেন? মামুজির সঙ্গে যাবে। তা হলে আমারও যাওয়া হয়। সামিরুন নাকছাবি খুঁটতে খুঁটতে বলে। তার ফ্রকের ভেতর বুকের কাছে থুপিকরা লালফিতে আর দুটো প্রজাপতি লুকিয়ে আছে। কেন না আজ কাজিয়ার দিনে মাজি দেখতে পেলেই নুখ করবেন। সে ফের বলে, আমাদের পাড়ার মেয়েগুলা যায়। কিন্তু আগে বলে না রাখলে সঙ্গ পাব না। এখানে ডাকতে এলে মাজি মুখ করবেন।

রেবেকা বলে, থাম্ ছুঁড়ি!

এই বলাটা রোকেয়ার কণ্ঠস্বরে। তাই সামিরুন কাঁচুমাচু মুখে রান্নাঘরে চলে যায়। তারপর রেবেকা উঠে বসে। অন্যমনস্কভাবে খোঁপা বেঁধে নেয়। তার চটি জুতো আব্বুর ঘরের সামনে পড়ে আছে। সে আলনার তলায়

সারবন্ধ জুতোগুলির মধ্যে একজোড়া বেছে নেয়। লাল দু ফিতের এই চটি মামুজির উপহার। শেষ দিকটায় ঈষৎ উ'চু হিলের পেছনে ফিতে বাঁধা সাদা চটি জোড়ার দিকে তাকাতে গিয়ে ছবির কথা মনে পড়ে যায় তার। সাব-রেজিস্ট্রার দুলাভাইয়ের ওই উপহারে ছবি জড়িয়ে আছে। 'ছবি' শব্দ একটা থাপ্পড়ের মতো তার গালে মারেন রোকেয়া বেগম। ছবি হলে ওটা করত! ছবি হলে এটা করত! ছবি ছবি ছবি! 'পড়াশুনো তো ছেড়ে দেয়নি ছবি!' জয়ন্তী দিদিমণির কাছে প্রাইভেট পড়তে যেত। জয়ন্তী দিদিমণি বিয়ে করার পর টিউশনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন রেবেকার জন্য সার এলেন। সারের সঙ্গে খোন্দকারদের লতায়-পাতায় সম্পর্ক। প্রথম-প্রথম সার বিনয়ে পড়াতেন। তারপর সারের বিনয় চলে গিয়েছিল। কণ্ঠস্বর ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বি পূর্বক আ পূর্বক ঘ্রা ধাতুর উত্তরে অ, মতান্তরে ক— ব্যাঘ্র।···সার, ঘ্যাঁও করে ডাকে বলেই হয়ত ব্যাঘ্র। রেবেকা এই বলে তামাসা করলেই সার বলতেন, নো জোক, নো জোক!···হিন্স্ ধাতুর উত্তরে অ, মতান্তরে অচ্ পূর্বক ক—সিংহ, ···সার! হু-উম্হ্ করে ডাকে বলেই···ও রুবি, নো জোক। আর ক'দিন পরে পরীক্ষা। মনে রেখো, তুমি ছবি নও, রুবি। তুমি স্বতন্ত্র। ছবি সাধারণ।

সার, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি—শুধু আপনিই বুঝেছিলেন আমি স্বতন্ত্র। আমি ছবি নই। ছবি হতে চাই না, তা আপনিই জানতেন। আপনার এই বোঝা আর জানা আম্মির মত নয়। সার, আপনিই তো বলে-ছিলেন, ছবি বয়সে তোমার চেয়ে বড়, নলেজে নয়! আপনিই কি বলেননি ছবি বোঝে না যে, সৌন্দর্য মানুষের চেহারা-সাজগোজে নেই, তা আছে মনে! মনকে সাজিয়ে তোলো। আমি কি তা-ই করছিলাম না সার! হঠাৎ আপনি সরে গেলেন দূ—উ—রে। আনার সাজগোজ গেল থেমে। না সার, আব্বুর রং ডিসিশনের চেয়ে আপনার স্বার্থপরতা আমার চোখে বড় হয়ে ধরা পড়েছিল। আপনি কি ইচ্ছে করলে আর কোন কাজ খুঁজে নিতে পারতেন না? ছিঃ সার! আপনাকে যা মানায় না, যা স্বপ্নেও আমি ভাবিনি, একটা ধাড়ি মেয়ের পাশে শুতে গেলেন? লোকেরা যা-যা করে, আপনাকে তা কত তুচ্ছ করে দেয়, আপনি বুঝলেন না?

আবার রেবেকার চোখ ছাপিয়ে জল এল। না, না, না! আপনি যদি স্বর্ণচাঁপার চারা আমার খাতিরে এনে দেন, আমি নেব না। কিছুতেই নেব না। কেন নেব? আমার মধ্যে একজন 'বড়মা' এসে গেছেন। আমি 'না-পাক' হব না। কখনও হব না। চলে যান সার! স্বর্ণচাঁপার চারা আমি চাই না।···

দুপুরে মসজিদের মাইকে আজান দিলে রোকেয়া ঘোমটা টেনে এনামেলের বদনায় ওজু করে বারান্দায় নামাজ পড়ছিলেন। দু কাঁধের দুই ফেরেশতাকে মুখ ঘুরিয়ে সালাম জানানোর সময় তিনি দেখছিলেন, রেবেকা এতক্ষণে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। জায়নামাজে বসে থাকার দরুন তিনি বাৎসল্যজনিত মৃদু ভৎর্সনা থেকে বিরত হন। সেই কখন গোসলখানায় ঢুকেছিল! আজ জোহরের এই নামাজে দু'হাত তুলে প্রার্থনায় রোকেয়া প্রথমে স্বামীর আরোগ্য, পরে ছোটমেয়ের সুমতি কামনা করেছিলেন। জায়মামাজ ভাঁজ করে গুটিয়ে বারান্দার তাকে রেখে একটু দ্বিধার পর তিনি যেন রান্নাঘরে যাচ্ছেন, এমন ভঙ্গিতে রেবেকার ঘরের দরজায় একটু দাঁড়ান। সে শাড়ি ঠিকঠাক করে পরছিল। মাথায় তোয়ালে জড়ানো। চোখে চোখ পড়লে রোকেয়া আস্তে বলেন, সিজিন চেঞ্জের টাইম! জ্বরজ্বারি বাধালে কাকে সামলাব?

ভেবেছিলেন ঝাঁঝালো জবাব আসবে। তার বদলে রেবেকার মুখে হাসি ঝলমলিয়ে উঠল। আম্মি, চান করার সময় ভাবছিলাম, আজ ছেলেবেলার মত রান্নাশালে বসে খাব। আব্বু তো উঠতে পারবেন না।

রোকেয়ার মুখে মেয়ের হাসির একটুখানি প্রতিফলিত হল। চেয়ারটেবিলে আমার খাওয়া হয় না রে! তোর আব্বুর কানে ছবি মন্তর আওড়ে খামোকা একগাদা টাকা খরচ করাল। প্রেসটিজ! শিগগির আয়। খানা বাড়ছি। অ সামিরুন! পরের ডাকটি জোরাল হয়। সামিরু-উ-ন!

সাড়া না পেয়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকান রোকেয়া। কপাটে শেকল আঁটা দেখে স্বস্তি পান। শেকল খোলার সময় খিড়কির ডোবায় নিজেকে চুবিয়ে সামিরুন ফিরে আসে। তার ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তিটুকু রেবেকার খাটের তলায় পায়ের দিকে। মাদুর, কাঁথা, বালিশ, শীতের জন্য তুলোর কম্বল, একটা ছোট্ট টিনের সুটকেস এই সব। মাজিকে দেখে সে আড়ষ্ট, কেন না আজ কাজিয়ার দিন। সে কাঁচুমাচু মুখে বলে, ছোটবু! মেঝে ভিজে যাবে। ফ্রকখানা দেবেন? পেন্টুলখানা ওপরেই আছে। ওই দেখুন।

নবাবজাদি! সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কী হয়? বলে রোকেয়া রান্নাঘরে ঢুকে যান।

রেবেকা ভেংচিকাটার মত বলে, ভিজুক মেঝে! চান করে তোর ফ্রক প্যাণ্ট ছুঁই আর না-পাক হয়ে যাই। বাহ!

সে বেরিয়ে এসে বারান্দার শেষে কাত হয়ে থাকা সূর্যের দিকে পিছু ফিরে একই ছন্দে চুল ঝাড়ে। সামিরুন গুঁড়ি মেরে একটু ঢুকে ফ্রক-প্যাণ্ট টেনে

নেয়। সেই সময় সে ছোট্ট সাবানটা সুটকেসের ওপর গোপনে রেখে দেয়। তারপর সে ছুটে চলে যায় উঠোনের সীমান্তে উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ানো ফুলগাছগুলির আড়ালে। ওটাই তার ড্রেসিংরুম।

রেবেকা চোখের কোনা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছিল। দু'মাস আগে সামিরুনের মেয়ে-শরীর থেকে প্রথম রক্তপাত, অথচ সে ভয় পায়নি। রেবেকার মত মুষড়ে পড়েনি। একটুকু মনখারাপ না। চুপিচুপি বলেছিল, ছোটবুবু! একটা কথা বলব? আমার ফুল হয়েছে! মাজিকে যেন বলে দেবেন না ছোটবুবু! এ অঞ্চলে আতরাফের মেয়েরা এই প্রথম রক্তপাতকে বলে 'ফুল হওয়া'। পরেরগুলিকে বলে 'গা-গাউলি'। দ্বিতীয়বার সামিরুন বলেছিল, ছোটবুবু! আমার গা-গাউলি যাচ্ছে।

আচ্ছা, সামিরুন কি তার শরীর বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করে? রেবেকা চুলঝাড়া শেষ করে তারে তোয়ালে শুকোতে দেয়। ক্লিপ আঁটে। আজ একটু হাওয়া উঠেছে। তার ফুলগাছগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটু তাকিয়ে থাকার পর সে পিঠ থেকে আঁচল সামনে এনে কয়েকটা ছেঁড়া চুল গুটিয়ে নিচে ফেলে দেয়।

ও রুবি! হল? খানা বেড়েছি।

আম্মি! চুল আঁচড়ানো হয়নি। এক মিনিট। বলে সে ঘরে ঢুকে চিরুনি টেনে শুধু সামনের দিকের চুলগুলি সংযত করে। আজ শ্যাম্পু দিয়েছিল চুলে। চুলগুলি ফুলের সৌরভে লুটোপুটি খাচ্ছে। মনও এখন হালকা আর মসৃণ। কাঁদতে পারলে এটা হয়, সে জানে। রান্নাঘরের সিলিংয়ে আলকাতরা মাখানো তালকাঠ থেকে ছোট্ট ফ্যানটা ঘুরছে। মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রোকেয়া। ভাতের ফ্যান দিয়ে রাঁধা মুগের ডাল, ভাজা ডিমে থকথকে ভাজা পেঁয়াজ, আলুভর্তা, আর একটুখানি আমের আচার। রোকেয়া বলেন, রাঁধব, না তোর আব্বুকে দেখব? এদিকে, ভাইজান আছেন। ক'দিনের জন্য আসা। খাতির-যত্ন যে করব, সময় কোথায়? ওই একদিন যা হয়েছে। কোন্ আতরাফের ব্যাটারা এসে—সামিরুন! খানা বাড়া আছে। নিয়ে যা।

আতরাফের মেয়েটি বারান্দার মেঝেয় বসে দেওয়ালের দিকে ঘুরে এমন ভঙ্গিতে খায়, যেন তার খাওয়াটা কোন গোপনীয় কাজ। রেবেকার চোখে পড়লে বলে, অমন করে খাচ্ছিস কেন রে তুই?

সামিরুন কী জবাব দেবে জানেই না। কালো বলেছিল, তার ভাইঝিটার সব ভাল। শুধু একটু 'খাওট্' মেয়ে, এই যা। খোন্দকারের মতে, খাক না কত খাবে! কালোর চেয়ে কি বেশি খাবে? তাঁর কথা, খাওয়া দেখলে ভাল লাগে। আয়মাদাররা নিজে খেয়ে আর পরকে খাইয়েই তো ফতুর হয়ে গেল।

এটাই একটা গ্লোরিয়াস ট্র্যাডিশন।

আম্মি! এ বেলা আব্বু কী খেলেন?

দুধ-সুজি খাইয়ে দিয়েছি। অত কাশি! গলা ব্যথা করবে না? আবার—সিগারেটের জন্য অস্থির।

রোকেয়া ফের আনমনে বলেন, ভাইজান কখন ফিরবেন কে জানে! টাউনের ডাক্তারের মর্জি। ও কী! তোর সব ভাত যে পড়ে রইল?

আপনি আস্তে-আস্তে খান আম্মি! আব্বু একা আছেন।

হুঁ। কতবার তোর কথা বলছিলেন। আমি বললাম, রাত জেগেছে। ঘুমোচ্ছে···

আজ তোরাব ডাক্তারের মোটরবাইকের শব্দ থেমে গেল না বাড়ির কাছে। রেবেকা আব্বুকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে দেখে নিঃশব্দে পাশে বসে ছিল কিছুক্ষণ। শ্বাস-প্রশ্বাসের শাঁ শাঁ শব্দ আর মাথার ওপর ধী·রে ফ্যানটা ঘুরছিল। রোকেয়া এলে সে বেরিয়ে আসার সময় বলেছিল, ডিসটার্ব করবেন না যেন, ঘুমোচ্ছেন।···

বিকেলে সে যখন ফুলগাছগুলির গোড়া খুরপি দিয়ে খুঁড়ে দিচ্ছিল, তখন সদর দরজার বাইরে একটা মোটরগাড়ি গরগর করতে করতে এসে থামে। তারপর মামুজিকে দেখতে পায়। ফয়েজুদ্দিন বলেন, কাল কালী পুজো। ডক্টর ব্যানার্জি বিজি। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলেন। ও বুড়ি! স্ট্রেচার নিয়ে লোক আসছে। আমি সঙ্গে যাব। তোরা আজ গিয়ে কী করবি? নার্সিং হোমে থাকবেন দুলাভাই। কাল সকালে এসে রুবিকে নিয়ে যাব বরং। পরে তুই যাবি'খন।

বাড়িতে এমন একটা ঘটনার সময় সহসা রেবেকার মনে কেন যেন একটা স্বর্ণচাঁপার চারা ভেসে এল এবং সে দেখল স্বর্ণচাঁপার চারাটা মাটি খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে মাটি না পেয়ে কোথায় হারিয়ে গেল।···

৬

স্বর্ণচাঁপা? নাহ্। নেই।

স্বর্ণচাঁপা? ও বলাই! আমাদের আছে নাকি? না। নেই।

স্বর্ণচাঁপা? অর্ডার দিয়ে যান। পরে খোঁজ নেবেন। তবে গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

স্বর্ণচাঁপা? গুলাইয়ের নার্সারিতে পেতেও পারেন। জেলাপরিষদ অফিসের বাঁ দিকের রাস্তায় এগিয়ে জিজ্ঞেস করবেন।

স্বর্ণচাঁপা? না তো। বর্ষার সিজনে এলে পেতেন। আপনি গভর্নমেন্ট হর্টিকালচারে গিয়ে দেখুন না। হেডমালীকে আড়ালে ডেকে হাতে কিছু গুঁজে দেবেন। তবে আপনার লাক। কাল কালী পুজো। আজই হর্টি-কালচার হয়ত দেখবেন শুনশান।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে লাক খুলেছিল। আর একটু দেরি হলেই হেডমালীর সাইকেল উধাও হয়ে যেত। গেট থেকে বেরুনোর মুখে তার সাইকেলে হেডমালীর সাইকেল বাধা পায়। গরজ আঁচ করে হেডমালী বলেছিল, রিসক আছে। বুঝলেন না? গুনিগোনতা থাকে। তবে কালী পুজোয় বাড়ি যাচ্ছি। পঞ্চাশের কমে হবে না। বাজারে পঁচিশ থেকে তিরিশ দর। আমার চাকরি গেলে? ভেবে দেখুন।

সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল। হেডমালীর কথামতো সে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে প্রতীক্ষা করছিল। প্রতীক্ষা কী অসহনীয়, এই প্রথম তার জানা হয়ে যায়। পরে ঘড়ি দেখে অবাক হয়েছিল। মাত্র পাঁচমিনিট কী করে পাঁচঘণ্টা হয়ে যায়? হেডমালী চোখের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলেছিল। বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো লম্বাটে থলে থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু এবং সেলোফেন পেপারে মোড়া জিনিসটা আরেক সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো লম্বাটে থলের ভেতর পাচার হয়। হেডমালী পঞ্চাশ টাকার নোটটা বুকপকেটে গুঁজে বলে, ওই দেখছেন টব বিক্রি হচ্ছে। ছোট মত একটা কিনে নেবেন। এক প্যাকেট বোনডাস্ট পাবেন কোর্টের সামনে সিডস্টোরে। যাবার পথে গঙ্গার ধারে খানিকটা মাটি তুলে বোনডাস্ট মিশিয়ে ঠিক মধ্যিখানে চারাটা বসিয়ে দেবেন। অল্প একটু জল হলেই চলবে। আজ মাটিতে বসাবেন না যেন। আগে গোল করে দেড়ফুট গর্ত খুঁড়ে রাখবেন। তলায় খোলপচা আর গোবর সার দিয়ে রাখতে হবে। দিনতিনেক বাদে সন্ধ্যার আগে বসাবেন। যা দিলাম, দেখবেন কী হয়।

হেডমালী চোখ নাচিয়ে নিঃশব্দ হেসে চলে গিয়েছিল। একটা বেজে যায় সেইসব কাজে। চারাটার দিকে সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকাচ্ছিল। মাত্র তিনটে পাতা আর দুটো খুদে ডালে পাতার আঁকুর। ঠকাল না তো? বাঁচবে তো? বাসস্ট্যান্ডের মুসলিম হোটেলে সে খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়। থলের ভেতর একটা গোপন সম্ভাবনার প্রতি উদ্বেগ তাকে অস্থির করেছিল। যাবার সময় ফুলের চারার কোন দোকানে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ! স্বর্ণচাঁপাই বটে। ও বলাই, দ্যাখ্ তো!

গুলাইয়ের নার্সারিতে আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। কোথায় পেলেন? হর্টিকালচারে তো? বলেছিলাম না? হ্যাঃ। স্বর্ণচাঁপা।

মশাই! ফুলের চাষে আমাদের তিনপুরুষ চলেছে। আনিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু হেডমালী একবার ধরা পড়ার পর খুব হাঙ্গামা হয়েছিল। তার চাকরি যায়নি। গভর্নমেণ্টের চাকরি কি যায়? মাঝখান থেকে আমাদের অনেক টাকা গচ্চা গিয়েছিল। শেষে পার্টির নেতাদের ধরে-টরে বদরাগী অফিসারকে বদলি করালাম। কিন্তু আর ও পথে হাঁটি না। মাত্র তিনটে ক্যাকটাসের মামলা। আপনার লাক মশাই! তবে কথা আছে। সবার হাতে ফুল-ফলের গাছ জিয়োয় না। এই কিন্তু একটা মিস্ট্রি। এই স্বর্ণচাঁপার চারা কার হাতে বসলে পরে ফুল ফোটাবে বলা কঠিন। একে তো চাঁপা যত্রতত্র ফোটে না। বললাম না? চাঁপার ক্যারেক্টার বড্ড মিসটিরিয়াস।...

কাটালিয়াঘাটে ফিরে আসার সময় সূর্য ঘোর লাল। বৃত্তাকারে দূরের গ্রামরেখা ছুঁয়েছিল। এই সময়টা জীবজগতে চাঞ্চল্য আসে। সে কুতুবপুর স্কুল থেকে ফেরার পথে এটা লক্ষ্য করেছিল। মাঠ থেকে মানুষজনের বাড়ি ফেরার তাড়া। পাখিরাও গাছের দিকে উড়ে যায় মাটি থেকে। সে রেলব্রিজের তলা দিয়ে যাবার সময় একটা মালগাড়ি ধীরে, অনেকক্ষণ ধরে আপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাঁকের মুখে কাঁপা-কাঁপা শিসের শিথিল শব্দ ক্রমে দূরে এলিয়ে পড়ে গেল। তারপর কখন তার সাইকেলের চাকা অলস হয়ে উঠলে সে চমকে দেখেছিল, এইখানে রেবেকাদের বাড়ি। এইখানে এসে সাইকেলের গতি নিজে থেকেই মন্থর হয় কেন? সাইকেলটা কি তার জৈব অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে? এটা কী ভাবে হয় কে জানে!

প্রায় দুটো বছর পরে গত সোমবার সে তার সাইকেলেরই ইচ্ছাপূরণ করেছিল—সম্ভবত। আজ বৃহস্পতিবার। এখনই মসজিদের মাইক্রোফোনে আজানের প্রতিধ্বনি এবং দলিজঘরটির বারান্দায় কেউ বসে নেই। সে সদর দরজার দিকে তাকায়, যা আয়মাদারবাড়ির 'দেউড়ি'। আশ্চর্য! মালতীলতার ঝরোকা নেই, সে লক্ষ্য করেনি এতদিন। সোমবার বিকেলেও তার মনে ছিল না মালতীলতার কথা। রেবেকাও বলেনি। কবে শুকিয়ে মরে গেছে, সারকে তা বলতে দ্বিধা হয়েছিল কি?

সানু দেখছিল বাড়িটা খুব স্তব্ধ। দেখছিল সদরদরজা তেমনই বন্ধ। তবে সে জানে, সদর দরজা ভেজানো থাকে এবং ঠেললেই খুলে যায়। তবু এইভাবে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা দিতে যাওয়া কি উচিত হবে, যখন আড়ালের এক পুরনো রটনা এই ক'দিনে গর্ত থেকে একটু-একটু করে বেরিয়ে ফণা তুলেছে তার সামনে এবং গত রাতে বিদ্রোহী কবির পায়ের কাছে সহসা মামুজি অমন করে 'মানুষ' শব্দটা আছাড় মেরে গুঁড়িয়ে দিলেন?

না। এটা ঠিক হবে না। শোনো গো! খোন্দকারের ছোট মেয়েকে সানু একটা স্বর্ণচাঁপার চারা দিয়েছে!!! স্বর্ণচাঁপার চারা কেন এখনও

দিয়ে আসে প্রাক্তন ছাত্রীকে তার প্রাক্তন সার? কেন মসজিদে মগরেবের নামাজের সময় মবিন খোন্দ্‌কারের বাড়ি ঢুকে গফুর দর্জির ছেলে খোন্দ্‌কারের আইবুড়ি 'ব্যাড ক্যারেক্টার' মেয়েকে স্বর্ণচাঁপার চারা দেয়?

আয়মাদারবাড়ির খিড়কির এক ঘাট থেকে আরেক খিড়কির ঘাটে জল-মাকড়সার মত তরতরিয়ে ছোটাছুটি করবে এইসব কুচুটে প্রশ্ন। অশালীন গ্রাম্যতার পচা শ্যাওলাভরা বদ্ধ জলাশয়গুলির ওপর ভাসতে ভাসতে মীর-পাড়ার কোন মীরের বউয়ের কণ্ঠস্বর রেজিনার সামনে দিয়ে আরেক মীরের বউয়ের কাছে পেঁছে যাবে, ও আপা! খোন্দ্‌কারের বাড়িতে এবার চাঁপাফুলের বাস ছুটেছে। খুশবু পাওনি? এই কথাটি উপক্রমণিকা।

সানু ভয় পেল। রেজিনাকে ভয় পাওয়ার সঙ্গে তার বাবা হাশিম মীরকে ভয় পাওয়া এবং তাঁকে ভয় পাওয়ার সঙ্গে কুতুবপুর স্কুলের সেক্রেটারিকে ভয় পাওয়ার জটিল যোগসূত্র সে লক্ষ্য করছিল। সেই লক্ষ্য করাটা তার সাইকেলে পেঁছে গেল। মাথার ভেতরকার এক নার্ভ যেমন শরীরের অন্যান্য নার্ভকে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে বার্তা পাঠায়, তেমনই এক বার্তা সাইকেলে পেঁছে যায় এবং সানু দেখতে পায়, তার সাইকেল দরগাপাড়ার বাঁক পেরিয়ে আরেক বাঁকে মীরপাড়ার মোড়ে চলে এসেছে।

মীরপাড়ার কাঁচা রাস্তাটা শুকনো খটখটে হয়ে গেছে দুদিনের রোদে। দরজার কাছে সাইকেলের ঘণ্টি বাজানোর সময় তার হাত ক্লান্ত ছিল। সারাদিনের পরিশ্রম, মাথাকোটা অন্বেষণ আর উদ্বেগের পর প্রত্যাশা ছিল একটি হাসিতে উজ্জ্বল মুখ থেকে আবেগময় কিছু কথার—এনেছেন সার? সত্যিই স্বর্ণচাঁপা সার? ও আম্মি, দেখে যান। সার একটা স্বর্ণচাঁপা এনেছেন।

এই কথাগুলি পুরনো, তবু সতত নতুন। গন্ধরাজ, হাসনুহেনা, বোগেন-ভিলিয়া, মালতীলতা—যখন যা নিয়ে যেত, কথাগুল বিহ্বলতায় উঁচু পাঁচিলের মধ্যে ছটফটিয়ে বেড়াত।

আজ কথাগুলি ফুটল না। না—এর জন্য রেবেকা দায়ী নয়। দায়ী সানু নিজে। 'সানু মুসলিমকুলকলঙ্ক'। মামুজি কাল রাতে 'মুসলিম' শব্দটা কী ভাবে মিলিয়ে দিলেন নির্লজ্জ এথিস্টমিজমের সঙ্গে। সানু আর রেবেকার বিষয়ে এথিস্টমিজম আসে কোন সূত্রে? মামুজি কি তাকে তাতিয়ে দিতে চাইছিলেন? তা হলে তো মামুজি এক বিপজ্জনক মানুষ। তা হলে আর কার হাত দিয়ে এই স্বর্ণ চাঁপার চারা পাঠাবে সে?

মায়মুনা দেরি করে দরজা খোলে। গলার ভেতর বলে, টিভি-র আওয়াজে শুনতে পাইনি হে দুলামিয়াঁ। তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ভাই? ছিলে কোথা সারাটা দিন?

টাউনে কাজ ছিল। বলে সানু বাড়ি ঢোকে। উঠোনে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে থলেটা হ্যান্ডল থেকে বের করে। তারপর সাবধানে, খুব যত্নে স্বর্ণচাঁপার টবটা তুলে বোগেনভিলিয়ার শেকড়ের কাছে রেখে দেয়।

মায়মুনা দেখছিল। ফিক করে হেসে বলে, টবের গাছ! আমি ভাবি দুলামিয়াঁ না জানি কী আনল আমার নাতনির জন্যে টাউন থেকে!

টালিতে ছাওয়া বারান্দার শীর্ষ থেকে যে বালবের আলো এসে পড়েছে, সেই আলোয় সানু একটু ঝুঁকে দেখে নেয় চারাটিকে। ঠিকই আছে। তিনটি পাতা আর গুঁড়ো গুঁড়ো পাতার আঁকুর ঠিকই আছে।

রেজিনা বারান্দায় এসেছিল। টিভি চলছিল। সে বলে, ওটা কী?

মায়মুনা বলে, টবের গাছ গো। দুলামিয়াঁর শখ হয়েছে—

সানু বলে, নানি! চা খাব।

রেজিনা নেমে এসে টবের দিকে এগিয়ে যায়। এটা কিসের গাছ?

স্বর্ণচাঁপার। সানু একটু হাসে। বউদি বলেছিল আনতে। এখন ভীষণ টায়ার্ড। কাল দিয়ে আসব'খন।

রেজিনা বলে, দেওয়াচ্ছি। পরের জন্যে এত ফুলগাছ কিনতে পর, নিজের বাড়িতে শুধু ওই কাগজফুলের গাছ? কেন? ফুলের মর্ম আমি বুঝি না?

না-মানে, এখন কোথায় ফুলগাছ বসাবে? পুরো বাড়ি রিস্ট্রাক্‌চারিং করা হবে। ডিজাইন এখনও ফাইনাল হয়নি, না? মোটে তো সাড়ে তিনকাঠা জায়গা। বাথরুম ল্যাট্রিন অবশ্য থাকবে। গার্ডেনিংয়ের জায়গা সামনে রাখা হবে, না পেছনে—তুমি যা বলবে তা-ই হবে।

তুমি তোমার বউদি-টউদিকে আরেকটা চারা এনে দিও।

যাঃ! কী বলছ? স্বর্ণচাঁপার চারা কি সহজে পাওয়া যায়? গভর্নমেন্ট হর্টিকালচারের হেডমালীকে ঘুষ দিয়ে কী কষ্টে জোগাড় করে এনেছি জান? পুরো একটা দিন—

সানু থেমে যায়। অনেক-বেশি বলা হয়ে গেল। সে ফের বলে, ভীষণ টায়ার্ড! জামাপ্যান্ট বদলে হাতমুখ ধুয়ে আগে এককাপ চা খাওয়া দরকার।

সে বারান্দায় ওঠার সময় রেজিনা বলে, বউদির জন্য একটা মুচুলমান এত কষ্ট করে কেন, কে জানে বাবা! পুরো একটা দিনের কষ্ট! বউদি মুচুলমানের হাতের ছোঁয়া চাঁপাগাছের ফুল দিয়ে মালা গাঁথবে, না পুজো করবে, তা-ও বুঝি না। এ কেমন বউদি—সার সার করেটরে হয় তো!

ছিঃ রিজু! কী বলছ?

কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছি। আহা! বড্ড লেগেছে।

সানু ঘরে ঢুকে যায়। প্যান্ট-শার্ট-আন্ডারওয়্যার খুলে, লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে

বেরিয়ে আসে। রেজিনার পাশ দিয়ে বাথরুমে যায়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে রেজিনাকে বারান্দায় দেখতে পায়। টিভি থেমে গেছে। বারান্দায় একটা চেয়ার বের করে এনে বসার সময় মায়মুনা চা আনে। ফোকলা মুখে একটু হেসে বলে, দুপুরে খেলে কোথা দুলুমিয়াঁ?

হোটেলে।

ওই দেখ, বলতে ভুলেছি। খোন্দকারকে অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে টাউন নিয়ে গেছে। বাঁচে কি না। কাশির সঙ্গে নাকি খুন নিকলেছে শুনলাম। তোতামিয়াঁ বলছিলেন। কানে এল।

সানু মায়মুনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রেজিনা বলে, সারকে খবর পাঠিয়েছে বলছ না কেন নানি? আগে সেটা বল।

কে? সানু ফের বলে, কে খবর পাঠিয়েছিল?

মায়মুনা বলে, আমার মরণ। আসল কথাটাই বলতে ভুলেছি। শেখপাড়ার কালোর ভাইঝি—কী যেন নাম মেয়েটার—এসে বলে গেল, মাজি ডেকেছেন সারকে। আমি শুধোলাম, সার কে রে ছুঁড়ি? সার সার করছিস কেন? সার আবার কার নাম? তখন বললে, ছোটবুবুকে পড়াত, সেই মানুষ।

রেজিনা বলে, চুপ করো তো নানি। চা খেয়ে সার যাবে। একটা কথার জায়গায় খালি হাজারটা কথা! আমি না বললে তো তোমার মনেই পড়ত না।

সানু শান্তভাবে চায়ে চুমুক দেয়। রেজিনা কেন তার বাপের বাড়ির 'দাসী-বাঁদি'কে খোন্দকারবাড়ি থেকে ডেকে পাঠাবার কথা মনে পড়িয়ে দিল, সে বুঝতে পারে। রেজিনা তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ্য রেখেছে, তা-ও বুঝতে দেরি হয় না তার। এ একটা পরীক্ষার সময়। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। চায়ে শেষ চুমুক দেওয়ার পর সে আস্তে বলে, বিপদের দিনে মানুষ আত্মীয়স্বজনকে ডাকে। খোন্দকারসাহেব আমার আব্বার দূর সম্পর্কের ভাই।

সেই ভাই কিন্তু আজ অব্দি ভাইপোর বউয়ের মুখ দেখতে আসেননি। সেই ভাইয়ের বেগমসাহেবাও তো এতদিন ডেকে পাঠাননি? মীরবাড়ির বউবিবিকে অন্তত মিষ্টিমুখ না করান, একটু দোওয়া করার ভদ্রতাও—হুঁ, কাটলেঘাটের খানদানির কত নাম শুনেছিলাম। কুতুবপুরের খানদানি যেন নেই-ই। রেজিনা শীতল মুখে কথাগুলি উচ্চারণ করে। তারপর সে গলা চড়িয়ে বলে, নানি! তোমার মনে পড়ছে? সন্ধ্যাবেলা দাদাপীরের মাজারে আগরবাতি জ্বালতে গেলাম। তোতামিয়াঁর আম্মা বললেন, এই দেখ খোন্দকারসাহেবের

বাড়ি। তোমার শ্বশুরের আরেক খানদান। ভাবলাম—

সানু দ্রুত বলে, কেন ওসব পুরনো কথা তুলছ? দুঃখ কি আমারও হয়নি? হয়েছিল বলেই যেচে পড়ে তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাইনি। এমনকি ও-বাড়ির সামনে দিয়ে দু'বেলা যাতায়াত করেছি, কিন্তু মুখ তুলে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখিনি।

চুপ! সহসা পুরুষালি কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে রেজিনার মুখ থেকে। মঙ্গলবার সকালে এক মামুজি না টামুজি এসে তোমার কুলের কথা ফাঁস করে গেল, আর এখনও গলগল করে মিথ্যে আওড়াচ্ছ! শরম হয় না তোমার?

সানু রাগ চেপে বলে, আহা! চাচাজি ডাকলেন বলেই—আমি অত ছোটলোক নই।

তাহলে আমিই ছোটলোক। বলে রেজিনা ঘরে ঢুকে যায়। আবার জোরে টিভি চালিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে সানু ঘরে ঢুকে আলনা থেকে পাঞ্জাবি টেনে নেয়। দেওয়ালের র‍্যাকে সাজানো বইয়ের ওপর থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। ডাকে, নানি! দরজা এঁটে দাও। আসছি।

মায়মুনা ট্যাঙস ট্যাঙস করে সদর দরজা আঁটতে এসে চাপাগলায় বলে, আপদ বিপদে মানুষ মানুষকে ডাকে। যাবে বৈকি ভাই! তুমি যাও। আমি নাতনিকে সামলাব। অ্যাটুকুন থেকে কোলে-পিঠে আমিই মানুষ করেছি। বিবিজি তো জম্মো দিয়েই খালাস। আমি মেয়ের ধাত বুঝি।···

আজ খোন্দকারবাড়ির সদরদরজা এই সন্ধ্যাবেলাতেই ভেতর থেকে বন্ধ। এই প্রথম প্রতিরোধ সানুকে চমকে দেয়। দেউড়ির মাথায় তারের জালের ভেতর থেকে একটা বালব উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল।

রাস্তার মোরাম এত লাল দেখাচ্ছে কেন? সানু জোরে কড়া নাড়ে। তারপর গলা চড়িয়ে কালোকে ডাকতে থাকে। সহসা ক্রোধে সে দুঃসাহসী হতে পেরেছিল। কেন না এতক্ষণে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা দূর থেকে 'বউদি না টউদি' এবং 'মুচুলমান' কথাগুলি তার দিকে ছুঁড়ে মারছিল। যেগুলি ভুল অর্থে জর্জরিত।

সামিরুন দরজা খুলে কোমল কণ্ঠস্বরে বলে, মাজি সারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। ছোটবুবুকে সামলানো যাচ্ছিল না। এখনও উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মামুজি নিয়ে যাননি বলে কী রাগ!

রোকেয়া অর্ধবৃত্তাকার খোলা চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সানুকে দেখে বলেন, কাজিবাড়ি থেকে মজা দেখতে এসেছিল সব। দুশমন! দুশমন! বাড়িতে মাতম হচ্ছে। আর ফুলের খুশবু শুঁকে—এসো। জানতাম তুমি

আসবে। না এসে পার? মেয়েটাকে সামলাতে পারলে তুমিই পারবে বাবা! কখন থেকে ঘর-বার করছি!

সানু কদমবুসি করে না। সে বলে, কাল রাতে মামুজি বলছিলেন, চাচাজির অসুখ বেড়েছে। কিন্তু এত বেশি বেড়েছে, বলেননি।

তোরাব! রোকেয়া তর্জনি তোলেন। ওই তোরাব ডাক্তার হঠাৎ আজ খামের মুখ আঁটা চিঠি দিয়ে বললে, টাউনে যাও। রোজ এসে ঢঙ করে দেখে যায়। ভেতর ভেতর খুনের ফোয়ারা বইছে, বুঝতে পারে না। ডাক্তারি করে লোকের খুন শুষছে! আর তোমার চাচাজিও তাকে ছাড়বেন না। আমার কী?

মামুজি টাউন থেকে অ্যাম্বুলেন্স এনেছিলেন শুনলাম।

রোকেয়া কান্না চেপে বলেন, খোদার মেহেরবানি বাবা! এমন দিনে ভাইজান ছিলেন। লাং-স্পেশালিস্ট নার্সিংহোমে ভর্তি করতে বলেছেন। নিয়ে গেলেন। মায়ের পেটের ভাই। এদিকে রুবি কাটা মুরগির মত উঠোনে ধড়ফড় করছে, আব্বুর সঙ্গে যাবে। স্ট্রেচারে তোলার সময় কাশির সঙ্গে এত-এত খুন। চোখে দেখা যায় না। খুন দেখেই তো মেয়েটা—তুমি ওকে দেখ বাবা!

রোকেয়া সানুর একটা হাত চেপে ধরেন। সানু বলে, চিন্তা করবেন না চাচিজি। দেখছি।

সে রেবেকার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। রোকেয়া তাকে অনুসরণ করে বলেন, পারলে তুমিই পারবে। তুমি ওর সার। তোমার অবাধ্য হতে পারে?

ঘরে শুধু টেবিল ল্যাম্পের আলো। আলোর খানিকটা রেবেকার শরীরের ওপর দিকটায় কাত হয়ে পড়েছে। বালিশে মুখ গুঁজে বাঁ হাতে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরে আছে। খোঁপা ঝুলে আছে পিঠে। ডান হাত বালিশের কোনায় চুপচাপ পড়ে আছে। সানু থমকে দাঁড়ায়। দু'বছর আগের সেই গন্ধ এখনও এই ঘরের ভেতর থেকে গেছে।—অথবা তার বিভ্রম। জানালার পাশে সেই টেবিল-চেয়ার আর দেওয়ালের থাকে-থাকে সাজানো টেক্সট বই, জিওমেট্রি বক্স, এক্সারসাইজ খাতার বাণ্ডিল। বইয়ের ওপর বাঁধানো ফটোগ্রাফ। পাশ থেকে তোলা মুখের প্রোফাইল, এতদিনে প্রায় দু'বছর পরে ভালবাসার প্রার্থনা মনে হয় কেন?

রোকেয়া সানুর পাশ কাটিয়ে মেয়ের পিঠে হাত রাখেন। রুবি। এই দ্যাখ, তোর সার এসেছে। ওঠ মা! না না—অমন করে পড়ে থাকে না। তোর সার কী ভাববে বলতো? তিনি কাতর চোখে সানুর দিকে তাকান। তুমি ডাক বাবা! সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কেন অমন অবুঝ হয় এই দুর্দিনে, তুমি বুঝোলে বুঝবে।

সানু ডাকে, রুবি ! রুবি ওঠ। আহ রুবি ! আমি তোমার সার না ?

রোকেয়া বলেন, দেখ বাবা ! পারলে পরে তুমিই পারবে। তারপর তিনি রেগে যান। চড় থাপ্পড় মারো হারামজাদিকে। আমার প্রেসার বাড়বে বলে চুপ করে আছি। বিপদের ওপর বিপদ বাঁধানো নয় ? গাল টিপলে দুধ বেরোয় ? কচি খুকি সেজেই থাকবে ?

আমি দেখছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না চাচিজি !

রোকেয়া রাগ চাপতে বেরিয়ে যান। সামিরুন উঁকি দিচ্ছিল। তার চুল খামচে টেনে নিয়ে যান। তুই ছুঁড়ি কী দেখছিস ? কুকার জ্বেলে সানুর জন্য চায়ের পানি চাপা এক্ষুনি। খালি ঘুরে-ফিরে এই দুয়োরে উঁকি-ঝুঁকি !

সানু আবার ডাকে, রুবি ! তারপর সে এই প্রথম তার প্রাক্তন ছাত্রীকে ছোঁয়। কাঁধে সাবধানে আঙুলের ডগা রেখে আস্তে বলে, তোমার জন্য স্বর্ণ-চাঁপার চারা এনে রেখেছি। কাল নিয়ে আসব। জানো ? নার্সারির ওঁরা বললেন, চাঁপার খুব মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার। সবার হাতে চাঁপা গাছ জিয়োয় না। কোনও কোনও হাত স্বর্ণচাঁপার পছন্দ। তোমার হাতে গন্ধরাজ, হাসনুহেনা—সবই তো ফুল ফুটিয়েছে দেখলাম। মালতী লতাটাও তো ঝাঁপাল হয়েছিল। দেখলাম মালতীলতাটা নেই। কী হল বল তো ?

রেবেকা সহসা সাপের গতিতে আধখানা শরীর তুলে দু'হাতে সানুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে, সার ! আব্বুর অত রক্ত ! সার ! আব্বুকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

সানু হঠাৎ বিব্রত হয়েছিল। সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে রেবেকার মাথায় সে হাত রাখে। এখন খোঁপাভাঙা চুলগুলি রেবেকার মুখের ওপর সরে এসেছে। আজ চুলে শ্যাম্পু করেছিল। ফ্যানের হাওয়ায় চুলগুলি মুহুর্মুহু স্থানচ্যুত হচ্ছিল। ফ্যানের হাওয়া শ্যাম্পুর গোপন সৌরভ ফাঁস করে দিচ্ছিল। আর ফেঁপেওঠা সুরভিত চুলগুলি পুনঃপুন সারের ধূসর পাঞ্জাবি স্পর্শ করছিল।

রেবেকার মাথা থেকে হাত তুলে নিয়ে সানু বলে, তুমি ইন্টেলিজেন্ট। কেন ভাবছ আব্বু ছাড়া বাঁচবে না ? কে কার জন্য বেঁচে থাকে রুবি ? প্রত্যেকে নিজের জন্যই বাঁচে। তা না হলে তো কবে পৃথিবী জনশূন্য হয়ে যেত ! তাই না ? তবে হ্যাঁ—এই ফিলিংটা মানুষের থাকে। থাকে বলেই হয়ত জীবন মিনিংফুল হয়ে ওঠে।

রেবেকা আলতোভাবে শাড়ির আঁচলে চোখ দুটি মুছে নেয় ! চুলগুলি খোঁপা করে বাঁধে। মৃদু স্বরে বলে, আপনি বসুন সার !

তারপর সে উঠে গিয়ে সুইচ টিপে একশ ওয়াটের বাল্‌বটা জ্বালিয়ে দেয়। সানু বলে, এদিকটায় পোকার অত্যাচার নেই। ঘাটবাজারের ওদিকে

টাউনশিপে কী পোকা! আমাদের বাড়িতেও জ্বালাতন করে। আসলে আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন নতুন তো! পোকাদের এটুকুও সহ্য হয় না। সানু হেসে ওঠে।

আপনি বসছেন না সার!

সানু অগত্যা বসে। মামুজি যখন আছেন, চিন্তা করো না। বেশি কাশির জন্য গলার শিরা ছিঁড়ে রক্ত পড়তেই পারে।

আমি ত্রিনয়নী থেকে দৈব ওষুধ এনে আব্বুর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু কাকলি—আজ ঘাটবাজারে তার সঙ্গে দেখা। সে জোর করে নিয়ে গেল। বলল, আব্বুর লাং-ক্যান্সার হয়েছে।

লাং-ক্যান্সার? সানু ভুরু কুঁচকে তাকায়। তোমার বন্ধু বলল তোমাকে? সে কি ডাক্তার?

কাকলির মেজভাসুরের নাকি এ রকম হয়েছিল।

তুমি সব কিছু অনেক বড় করে দেখ কেন রুবি?

সামিরুন বাইরে থেকে বলল, সারের চা ছোটবু!

নিয়ে আয় না। সারকে কখনও দেখিসনি? আম্মি কোথায়?

এশার নামাজের জন্য ওজু করছেন।

সামিরুন চায়ের কাপ-প্লেট টেবিলে রেখে সানুকে আড়চোখে দেখতে দেখতে বেরিয়ে যায়। সানু বুঝতে পারে রেবেকা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তার মনে পড়ে যায় রোকেয়া বলছিলেন সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তুমি বোঝালে বুঝবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে বলে, একটু আগে টাউন থেকে ফিরে চা খেয়েই এসেছি। কিন্তু তোমার ঘরে এসে পুরনো দিনের কত কথার স্বাদ পাচ্ছি এই চায়ে। তো জান? আজ একটা স্বর্ণচাঁপার জন্য পুরোটা দিন—

রেবেকা মুখ নিচু করে মাথা দোলায়। খুবই আস্তে বলে, না।

কী না?

আর আমি স্বর্ণচাঁপা নিয়ে কী করব সার? আব্বুর লাং-ক্যান্সার।

তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার জীবনে স্বর্ণচাঁপার কত প্রয়োজন। তা ছাড়া তুমি নিজেই কি চাওনি রুবি? আজ আমি পুরো একটা দিন খুঁজে খুঁজে কত ছোটাছুটি করে—আসলে স্বর্ণচাঁপা তোমার মতই মিসটিরিয়াস, জানো? সানু একটু হাসে। তুমি চেয়েছিলে বলেই লাকিলি পেয়ে গেলাম। কালোকে দিয়ে দেড়ফুট গভীর গর্ত করিয়ে রাখবে। তলায় একটু গোবরসার আর খোলপচা ছড়িয়ে দেবে। কাল শুক্রবার। সোমবার সন্ধ্যার আগেই তুমি চারাটা বসিয়ে দেবে। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

না সার! স্বর্ণচাঁপার চারা আমি নেব না।

সানু প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, নেবে না? কেন নেবে না?

আর এই সময় মসজিদের মাইক্রোফোনে এশার নামাজের আজান শোনা যায়। রেবেকা দ্রুত মাথায় আঁচল চাপিয়ে তেমনই মৃদুস্বরে বলে, আমি মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়ব সার। তারপর বেরিয়ে যায়। বাইরে তার কথা শোনা যায়, আম্মি! একটু দাঁড়ান। ওজু করে নিই। আমি নামাজ পড়ব।

সানু অবাক হয়েছিল! এ কি সত্যিই রেবেকার নামাজ পড়তে যাওয়া—কেন না তার আব্বুর অসুখ, নাকি এইভাবে সে সারের কাছ থেকে এবং একটা স্বর্ণচাঁপার চারার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল?

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আধ কাপ চা ফেলে রেখে সানু বেরিয়ে আসে। দেখতে পায়, ডাইনিং টেবিলের ওদিকে জায়নামাজে মা ও মেয়ে প্রার্থনারত। দু'জনকারই দৃষ্টি আনত। সানু মুখ ঘুরিয়ে আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে থাকে।

সহসা এতকাল পরে রেবেকা সশরীরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং একটা এই ঘটনা একটা দূরত্বের আকস্মিক লয়, তারপর এইভাবে আবার শরীরকে ঢেকে আলোর গতিতে দূ-উ-রে সরে যাওয়া, সে যাওয়া খোদার দিকে হোক কিংবা যে দিকেই হোক, সানুকে ক্ষুব্ধ করেছিল। হাশিম মীরের মেয়ের কথার চাবুকের চেয়ে এই চাবুকের আঘাত অপ্রত্যাশিত ছিল তার কাছে। খোন্দকার মবিনউদ্দিন আহমদ, একদিন তাকে বলেছিলেন, বাবা সানু! এই যথেষ্ট। আর কষ্ট করে তোমাকে পড়াতে আসতে হবে না। সেদিন সানুর মনে অপমানের আঘাত লেগেছিল। কিন্তু আজ এই আঘাত অন্যরকম, কেন না এটা প্রত্যাখ্যান এবং রেবেকার প্রত্যাখ্যান তার কাছে অকল্পনীয় ছিল। এই প্রত্যাখ্যান তার ব্যার্থতার বোধকে বাড়িয়েদিল। অসহ্য ব্যর্থতা বোধে যন্ত্রণার্ত সে, ডাকে, সামিরুন! দেউড়ি বন্ধ কর। চাচিজিকে বোলো, একটা কাজের তাড়া আছে।

নিজের বাড়ি ঢোকার সময় অব্দি সে সেই যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। তারপর বাড়ির ভেতরে দশ হাজার ইটের পাঁজার দিকে তাকাতেই তার যন্ত্রণাবোধটা নিমেষে সরে যায়। চৌকো লালচে রঙের ছোট-ছোট কঠিনতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ-তায় সংহত। তারা তার মধ্যে অতি দ্রুত সুসংহত সাংসারিক চিন্তা নিয়ে আসে। সে টর্চের আলোর চটায় তাদের দেখতে থাকে। বারান্দা থেকে রোজিনা বলে, খুব কান্নাকাটি হল সারের কাছে!

সানু মুখ না ঘুরিয়েই বলে, স্বাভাবিক।

আমি ভাবছিলাম সারকে এত শিগগির ছাড়বে না!

তুমি তো অনেক কিছু ভাব।

মায়মুনা বলে, হ্যাঁ গো দুলামিয়া! কুটুমসোদরকে খবর দেয়নি এখনও?

কেন ? চাচাজির কি ইন্তেকাল হয়েছে যে এখনই খবর দেবে ?

ভাই ! হায়াত-মউত খোদার হাতে। সে কথা বলছি না। বাড়িতে তো খালি মা আর মেয়ে। হাবল কাজি সাহেবকে দেখলে না ? শুনেছি, উঁয়ারা ফুফুত না মামাত ভাই। কাজিসায়েব না যেয়ে পারেন ?

গেছেন, বলে সানু বারান্দায় ওঠে। রিজুর টিভি বন্ধ কেন ? আবার খারাপ হল নাকি ?

আজ আমি পড়তে বসব। সারের জন্য ওয়েট করছিলাম।

বাহ্ ! কিন্তু সত্যি বলছি, আজ আমি ভীষণ টায়ার্ড। দুই পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তুমি পড়। আমি শুয়ে শুয়ে তোমাকে হেল্প করব। তুমি বরং ইতিহাস বইটা রিডিং পড়ে যাও। ফরাসি বিপ্লব চ্যাপ্টারটা খোল। ওটা ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যাডমিশন টেস্টে অবশ্যই আসবে। ঝেড়ে মুখস্থ করাই ভাল। ইতিহাস যা পড়ানো হয় তাতে নলেজ বাড়ে। তবে, উইজডম অন্য জিনিস। সানু বড় আলোটা নিভিয়ে টেবিলল্যাম্প জেবলে দেয়। আমার চোখে লাগছে বড্ড। আমি শুচ্ছি। তুমি টেবিল ল্যাম্পের আলোয় পড়তে বসো। হুঁ, নলেজ আর উইজডম বললাম। তফাতটা পরে বুঝিয়ে দেব। বসো। কী ?

থাক। তোমার পায়ে ব্যথা। পা টিপে দিই।

আহ্ ! কী করছ ? না না—

কী করব বল ? আমার আঙুল তো নরম আর চিরোল চিরোল নয়। একটু মোটা আর শক্ত।

রিজু ! তুমি হঠাৎ কেন করছ বল তো ?

বা রে ! আমার কোমরে ব্যথা হলে তুমি টিপে দাও না ? ধরে নাও, তা শোধ করে দিচ্ছি। আব্বা বলেন, কক্ষনো কারও কাছে দেনা করতে নেই। আমি তোমার কাছে দেনা করি। দেনা শোধ করতে দাও।

আশ্চর্য ! আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ককে তুমি এভাবে কেন দেখ, রিজু ?

রেজিনা পুরুষালি গলায় হেসে ওঠে। বল, টিপতে গিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছি। বললাম তো আমার হাতের দোষ। আমার টেপা পছন্দ হবে কেন ? থাক বাবা ! মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, ব্যথাটা পায়ের নয়, মনের।...

এইভাবেই তার দিনগুলি রাতগুলি কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে সিদ্ধান্ত নেয়, রেজিনার কথা পালটা কথা দিয়ে সে খণ্ডন করবে না। কিন্তু ঘটনাকালে তা মনে থাকে না! কেন মনে থাকে না, সেটা পরে বুঝতে পারে! তার মধ্যে একটা ভয় লুকিয়ে আছে। সেই ভয়টা সে কিছুতেই তাড়াতে পারে না। কেননা তার জীবনচরিত একজন সারের জীবনচরিত। এও বিস্ময়কর

কী ভাবে ক্রমে ক্রমে খানদান বাড়ির এক কিশোরীই তাকে সার করে ফেলেছিল —আর কেউ নয়, আর কেউই এই কাজটা পারত না। সেই কিশোরী এক দক্ষ রূপকার। সে-ই একজন সারের ভাস্কর্য গড়ে তুলেছিল।

তা হলে তুমিই এ জন্য দায়ী রেবেকা! সকালে সাইকেলের হ্যান্ডেলে থলে ঝুলিয়ে ঘাটবাজারে যাবার পথে, যখন স্বভাবে সহসা মন্থরগতি তার জৈব অস্তিত্বের অন্তর্গত এই দু'চাকার গাড়ি, তখন মনে মনে কথাটা বলে যায় সে। বাড়িটার দিকে না তাকিয়েই মনে মনে আরও বলে যায়, আমার জীবনকে এভাবে একমুখী করে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। তুমিই আমাকে এই চোরাবালির মুখে ঠেলে দিয়ে নিরাপদে দূরে দাঁড়িয়ে আছ। আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে যাচ্ছে মুদ্রিত বর্ণমালার শব্দহীন গভীর বালিতে।

এই যে সানু! কী ব্যাপার বল তো? নিবারণ রায় তার সাইকেলের হ্যান্ডেল খপ্ করে ধরে ফেলেন। কালও তুমি ডুব মারলে। তোমার বউদি অস্থির। তিনি খ্যা খ্যা করে হাসেন। যেন নিজেই তোমার ছাত্তর! নাস্তু-মান্তুকে গুঁতো মারে, দেখে আয় তো তোদের সারের কী হল?

দাদা! কাল আমাকে হঠাৎ একটা আর্জেণ্ট কাজে টাউনে যেতে হয়েছিল।

ফেরার পথে তোমার কাছে ঢুঁ মেরে যাব ভাবছিলাম। তোমার বউদি বলল, আজ সন্ধ্যায় সানু বউকে নিয়ে কালীপুজোর বাজি পোড়ানো দেখতে আসে যেন। বলা আছে। আর ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে—নিবারণ রায় হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে যান, তোমার কপালেই ভাইফোঁটা দেবে! উলটপুরাণ হল। তাতে কী? খালি পূর্বজন্ম দ্যাখায় হে! সন্ধ্যায় বউমাকে নিয়ে যেন যেও ভাই! নইলে ভাববে আমি মিথ্যুক।

নিবারণ রায়ের হাতে থলে এবং গ্যাঁদার মাথায় ঝুড়ি। প্রকান্ড একটা কুমড়ো ঝুড়ি থেকে ঠেলে উঠেছে। ভিড়ে দু'জনে মিশে গেলে সানু সাইকেল থেকে নেমে অজন্তা বুক স্টোরে যায়। শচীনদা! কালকের কাগজ নিয়ে যাওয়া হয়নি।

শচীনবাবু বলেন, ভানু তোমার নাম করে নিয়ে গেছে যে পাওনি?

ঠিক আছে। পেয়ে যাব।

ঘাটবাজার ছাড়িয়ে ব্লক অফিস বাঁয়ে রেখে সানু সাইকেলে চেপে টাউন-শিপের দিকে যায়। ভানুর বাড়ির সামনে নেমে ঘন্টি বাজায় সে। ল্যাভেণ্ডার লতার আড়াল থেকে ভারতী ছুটে এসেই থমকে দাঁড়ায়। বলে, যাঃ! কোন মানে হয়? আমি ভাবলাম পোস্টম্যান।

আজ কালীপুজোর ছুটি।

মনে ছিল না। কিন্তু তুমি কক্ষনো পোস্টম্যানের মত বেল বাজাবে না।

ভানু নেই?

কিছুক্ষণ আগে বাজারে গেল। অজন্তা বুক স্টোরে পেয়ে যাবে ওকে।

দেখলাম না। আমার কালকের নিউজপেপারটা ভানু এনেছে। দেখ তো!

তুমি ভেতরে আসবে না?

একটু তাড়া আছে। বাজারটা সেরেই ফিরতে হবে।

এক মিনিট। বলে ভারতী চলে যায়। প্রায় তিন মিনিট পরে কাগজ নিয়ে আসে। খুঁজে খুঁজে হয়রান! এতটুকু ডিসিপ্লিন নেই। বালিশের তলায় কেউ নিউজপেপার ভরে রাখে!

সানু সাইকেল ঘুরিয়ে প্যাডেলে পা রেখেছিল। সেই সময় ভারতী ডাকে, সানুদা! শোন!

বল!

কালীপুজোয় তোমার ফ্রেন্ডের ওভারডিউটি! সন্ধ্যাবেলা এসো না, বাজিপোড়ানো দেখতে যাব।

প্রব্লেম। নিবারণদার স্ত্রী—তুমি চিনবে না, আমাকে সস্ত্রীক ইনভাইট করেছেন। দোতলার ছাদ থেকে বাজি পোড়ানো দেখতে হবে। ওঁর দুই ছেলের আমি প্রাইভেট টিউটর। একটু অবলিগেশন আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। ভারতী একটু বাঁকা হাসে। আমি অচ্ছুৎ। জাতনাশা মেয়ে।

রাগ করলে জাহানারা?

শাট আপ! আবার তুমি ব্যঙ্গ করতে এসেছ? তোমাকে আমি লিবার্যাল ভাবতাম!

সরি ভারতী। মুখ ফসকে কেন যেন বেরিয়ে গেল। ক্ষমা চাইছি!

থাক্। হিন্দু মেয়েদের দেখলেই মুসলমানদের নোলা দিয়ে জল ঝরে। এই জন্যই তো হিন্দুরা একটা গণ্ডি টেনে রেখেছে। এদিকে মুসলমান-বাড়ির এডুকেটেড মেয়েদের উপযুক্ত বর জুটছে না। আমি শোধ নিয়েছি। নেব না? আমার দু'দুটো ভাই হিন্দু মেয়ে এনে বিশ্বজয় করল। আর আমার বেলা পৃথিবী রসাতলে গেল! যেমন হিন্দু, তেমনই মুসলমান! এ দেশে মানুষ থাকে? সব হিপোক্রাট! নির্লজ্জ! কালচার-ট্রাডিশনের বড়াই করে! মনের ভেতর প্রাগৈতিহাসিক এলিমেন্ট, আর বাইরে মর্ডানিজম!…

সানু মোড় পেরিয়ে গিয়ে ভাবে, গত সোমবার বিকেলে তার জীবনে যে সুসময়ের সূচনা হয়েছিল, তা কী ভাবে বাঁক নিতে নিতে দুঃসময় হয়ে যাচ্ছে—অকারণে একটার পর একটা আঘাত এসে পড়ছে এবং আজ শুক্রবার সকালে

বাড়ি থেকে বেরনোর সময় রেজিনা একই কণ্ঠস্বরে 'নোলা দিয়ে জল ঝরা' ইডিয়মের প্রহার করছিল। অবশ্যি ফেমিনিন লজিক বলে একটা কথা আছে। অমর সিংহরায় বলেছিলেন, মেল শোভিনিজম লজিক মানে না। কিন্তু ফেমিনিজমের নিজস্ব লজিক আছে। সেই লজিক প্রাচীন ভারতীয়রা আঁচ করেছিলেন বলেই স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে ওই শ্লোকটা 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—

শাহজাদপুরের কমরেড মফিদুল ইসলামের মেয়ে জাহানারাকে জাহানারা বলে ডাকতে মানা। তা ভুলে গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ সকালে জাহনারা এত বেশি চটে গেল কেন? ও নিশ্চয় পোস্টম্যানের প্রতীক্ষায় আছে। কোন চিঠি আসবে কি কোনও সুখবর নিয়ে এবং এল না বলেই কি এমন রেগে গেল? কিন্তু ওর ভুল হচ্ছে। কোন বি টি কলেজের কর্তৃপক্ষ যেমন আছেন তেমনই কত নিবারণ রায় আর তাঁর স্ত্রী আছেন। কত অমর সিংহ রায় আছেন। কাজেই হিন্দু-মুসলমান কথাটি অবান্তর হয়ে যায় নাকি? এই কাঁঠালিয়াঘাটর পুজোর উৎসব ম্রিয়মাণ করে দেবে না কি মুসলমানদের অনুপস্থিতি? এটাই চিন্তাযোগ্য বিষয়। আর জাহানারা, কেন ভুলে যাবে তুমি সন্দীপ দাশগুপ্তর কথা? তোমরা দু'জনেই তো বাহুবন্ধ আছ। তাই না?

তার চিন্তার ছন্দটাই এমন যে, সে আপাতদৃষ্টে নিটোল একটি কবিতার মত সিদ্ধান্তে সহজে পেঁাছে যায় এবং খুশি হয়। আজ বাজারে কালীপুজোর দিন খয়রা মাছ উঠেছিল। মায়মুনানানি রোজ খয়রা মাছের কথা বলে কেন, সে বুঝতে পারে। কুতুবপুরের আয়মাদারবাড়ির 'দাসীবাঁদি' কাঁটালিয়াঘাটে এসে একটা সংসারের কর্তৃত্ব পেয়ে গেছে। যত ছোট্ট হোক, এ-ও এক সংসার। ইচ্ছে মত নিজের হাতে ভাত-তরকারি বেড়ে খায়। খয়রা মাছ কেন তার প্রিয় কে জানে! বাড়ি ঢুকে কথাটি জানাতেই ফোকলা মুখ থেকে একরাশ হাসি ঝাঁপিয়ে এল। থলেয় হাত ভরে এক মুঠো খয়রা মাছ হাতের তালুতে রাখা মাত্র সূর্য সব রোদটাই ঢেলে দিল। প্রচুর উজ্জ্বলতা হাতে মেখে গেল। ও আমার লক্ষ্মীসোনা ভাই রে! বেহেশতের মেওয়া তুলে এনেছে রে! অ নাতনি। দেখ, দেখ কী এনেছে তোমার দামাঁদমিয়াঁ! অই গো! একবার চোখে তাকিয়ে দেখবে তো? কাঁটলেঘাটের খয়রা মাছের কত নামডাক শুনেছি। অ্যাদ্দিনে চোখ দিয়ে দেখলাম। হাত দিয়ে ছুঁলাম। অ নাতনি! একবারটি ইদিক পানে মুখ ঘোরাও!

সানু উঠোনে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে রেজিনাকে খুঁজছিল। তারপর দেখতে পেল। রান্নাঘর আর বাথরুমের মধ্যিখানে হাত তিনেক ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে পিছু ফিরে বসে রেজিনা কী একটা করছিল। তার বিদেশি সাদা ম্যাক্সিতে কাদার ছোপ। পাশে একটা শাবল আর প্লাস্টিকের মগ পড়ে

আছে। সন্দিগ্ধ সানু ছুটে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে, এ কী করলে! এ কী করলে? সর্বনাশ! তাজা স্বর্ণচাঁপাটাকে তুমি খুন করে ফেললে? তুমি জানো না কী করে চাঁপা গাছ বসাতে হয়—ওঃ! তুমি টব থেকে উপড়ে তুলে ওইভাবে পুঁতে দিলে? চাঁপা মিসটিরিয়াস ক্যারেক্টার, রিজু!

শেষ বাক্যটি সে ধরা গলায় বলেছিল, কেন না শব্দগুলি যন্ত্রণার্ত। আর তারপরই রেজিনা মুখ ঘোরায়। তার মুখে তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুরতা ছিল। মীর আনোয়ার আলি যে তার চাইতে মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার! বলে সে উঠে দাঁড়ায়। ভেংচি কাটে। বউদির চাঁপা? মিথ্যুক! লম্পট! তারপর সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বিকট কেঁদে ওঠে। হায় আল্লা! তুমি জেনেশুনে আমাকে কার হাতে তুলে দিয়েছিলে? আমি তো জেনেশুনে কোনও গুনার কাজ করিনি।

সানু দু'হাত বাড়িয়ে তার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ছি ছি রিজু! কী হচ্ছে? লোকে শুনতে পাবে।

শুনুক। ঢি ঢি পড়ুক। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রেজিনা তার একটা হাত খামচে ধরে। তাকে টেনে নিয়ে যায় ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় বলে, বউদির জন্য স্বর্ণচাঁপা? বল! কত মিথ্যে কথা বলতে পার, বল। দেখি তোমার হিম্মত! আমার হাতে ডকুমেন্ট। নিজেই পড়ে দেখ। দেখে মুখ খুলবে যদি বাপের ব্যাটা হও।

এক্সারসাইজ খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতায় বড় বড় হরফে তাড়াহুড়ো করে লেখা একটা চিঠি রেজিনা দু'হাতে মেলে ধরে তার মুখের সামনে। সানুর পড়া হয়ে যায়। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে নীলাভ হরফগুলি শব্দ থেকে বাক্যে, বাক্য থেকে একটি সন্দর্ভে পরিণত হয়ে তার চেতনায় মুদ্রিত হয়, কেন না হরফগুলি তার পরিচিত ছিল।

'স্যার,

আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম গ্রহণ করবেন। সামিরুনকে পাঠালাম। তার হাতে স্বর্ণচাঁপার চারা দেবেন। কাল রাতে আমার মাথার ঠিক ছিল না। অপরাধ মার্জনা করবেন। সকালে মামুজি এসে খবর দিলেন যে আব্বুর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা মত হয়েছে। মামুজির সঙ্গে আমি এখন রওনা হব। আপনি আমার জন্য অত কষ্ট করে স্বর্ণচাঁপার চারা এনেছেন। না নিলে আপনাকে অপমান করা হয়। তা কি আমার উচিত? ভাবিজিকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম জানাবেন। তাড়াতাড়ি লিখলাম। ইতি।

আপনার স্নেহের রেবেকা।।...'

রেজিনা চিঠিটা সরিয়ে নিয়ে হিংস্র শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে উচ্চারণ করে, ডকুমেন্ট! মিথ্যুক! লম্পট!

সান্‌ আস্তে বলে, একটা নির্দোষ চিঠি। অবশ্যি স্বর্ণচাঁপার চারাটা—

চু-উ-প। আর একটা কথা বলবে না। এই ডকুমেন্ট যদি আব্বার কাছে পাঠিয়ে দিই? 'আপনার স্নেহের রেবেকা'। ব্যাড ক্যারেক্টার আইবুড়ি হারামজাদি মেয়ে। স্কুলে যাবার নাম করে প্রেম করে বেড়াত। তার জন্য সারের এত দরদ যে চাঁপাফুলের গাছ কিনতে ছোটে। দেওয়াচ্ছি চাঁপাফুলের গাছ। রেজিনা সশব্দে আলমারি খোলে এবং ভেতরকার লকার খুলে চিঠিটা চালান করে দেয় গয়নার বাক্সের তলায়। তারপর তর্জনি তুলে ফের বলে, ডকুমেন্ট রইল। ফাস্ট ওয়ার্নিং। এরপর যদি—

তখন হাশিম মীরের শ্রেণীবদ্ধ চৌকো লালচে দশ হাজার ইট একটার পর একটা ছুটে এসে সানুকে ঢেকে ফেলছিল এবং ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত সানু, রেবেকার সার, সহসা দেখতে পেল লাল বালাপরা দুটি কোমল হাত ক্রমে একটি করতল হয়ে ভেসে আছে। বিপজ্জনক ধ্বংসপ্রবাহের মধ্যে শান্ত এক প্রার্থনা হয়ে আছে। স্বর্ণচাঁপার জন্য প্রার্থনা। হ্যাঁ, এটাই জীবনকে 'মিনিংফুল' করতে পেরেছে। আপন স্বভাবে সে এই সিদ্ধান্ত সহজেই নিল। আপাতদৃষ্টে একটি নিটোল কবিতার মত একটি সিদ্ধান্ত এ সময়ে তার খুব প্রয়োজন ছিল।...

৭

তাহলে কঙ্কালের নাচ দেখলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিস্টিরিয়াস নয়?

ইনটারেস্টিং।

আমাদের কাঁটালিয়াঘাটে একসময় কালীপুজোর রাতে এটাই ছিল মেইন অ্যাট্রাকশন। প্রমথনাথ একটু হাসেন। আজকাল বাজি পোড়ানোর হুল্লোড় ওটাকে মেরে দিয়েছে। ভিড় দশগুণ বেড়েছে। লোকেরা আলোর খেলাই দেখতে চায়। কিন্তু অন্ধকারের খেলার মজাটা বুঝতে চায় না। তোমরা অবশ্যি নতুন জেনারেশন। বুঝতে চাও না হিউম্যান লাইফ একটা কয়েনের মতো। তার দুই পিঠ দুরকম। কঙ্কালের নাচ উল্টো পিঠটাও দেখানোর চেষ্টা করে। ওই পিঠটা অন্ধকার।

আইনজীবী শ্বশুরের এই দার্শনিকতায় ইঞ্জিনিয়ার জামাই বিব্রত বোধ করছিল। কেননা তাঁর আদুরে কন্যার পাল্লায় পড়ে তাকে রাত আড়াইটে অব্দি জাগতে হয়েছে এবং বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়ার পরই

একটা সিগারেট টানার অভ্যাস মজ্জাগত। সে সায় দিয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। আই এগ্রি।

তার চালে ভুল হল। প্রমথনাথ দরজার চৌকাঠে হাত রেখে বলেন, কঙ্কালেব নাচ একটা সিম্বল। তুমি ইণ্টারেস্টিং বললে কিন্তু তার চাইতেও ইণ্টারেস্টিং, গত ষাট-সত্তর বছরের কালীপুজোয় কঙ্কালের নাচ রীতিমতো একটা ট্রাডিশন। আর এই ট্রাডিশনের পত্তন করেছিল একজন মুসলমান।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকলি ডিটেলস বলছিল। আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

প্রমথনাথের হাসিটা বেড়ে যায়। তখন কাকলি কোথায়? আমিই বা কোথায়? লোকটার নাম ছিল ইয়াকুব গুনিন। বাড়ি ছিল। জামনা গ্রামে। অমাবস্যার রাতে শবসাধনার জন্য কবর থেকে টাটকা ডেডবডি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। মুসলমানরা মরা মানুষকে বড্ড বেশি সম্মান করে। গুনিনের একটা ঠ্যাং আর একটা হাত ভেঙে দিয়েছিল। ওই অবস্থায় কোথায়-কোথায় ঘুরে শেষে কাঁটালিয়াঘাটের শ্মশানতলায় এসে জুটল। মাথায় জটাজুট পরনে রক্তাম্বর, আর একটা হাতে ত্রিশূল। গ্রামের মানুষের এই একটা স্বভাব। ঠিকই চিনতে পারে। তো সেই গুনিনের নাম হয়ে গেল ইয়াকুব সাধু। তুমি দেখে থাকবে, শ্মশানতলার পেছনে গঙ্গার বাঁক আছে। বাঁকের মুখে রাজ্যের মড়া এসে আটকে যেত। এ-ও মিসটিরিয়াস। ইয়াকুব সাধুর হাতে একটা কঙ্কাল জল থেকে উঠে এসেছিল।

কাকলি গঙ্গাস্নান করে এসে গেল। বাবা! কাজিকাকু এসেছেন। প্রথমে চিনতেই পারিনি। মাথায় টাক।

আইনজীবী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পরে আরও ডিটেলস বলব'খন। কোর্ট-কাছারিতে ছুটি। কিন্তু আমার বরাতে ছুটি নেই। বলে তিনি বেরিয়ে যান।

কাজিপাড়ার হাবলকাজি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। মাথায় টাক। চিবুকে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। প্রমথনাথ দরজা খুললে তিনি বলেন, ভাবলাম রাত জেগে কঙ্কালের নাচ দেখে ঘুমোচ্ছ!

না হে! এবার আর দেখতে যাইনি। তুমি গিয়েছিলে নাকি?

নাহ্। আর কি সেই বয়স আছে?

হুঁ, বয়স একটা ফ্যাক্টর। বসো।

এই ঘরটা বসার ঘর-কাম-চেম্বার। সার বেঁধে তিনটে কাঠের আলমারি মুদ্রিত বর্ণমালায় বন্দি চৌকো-চৌকো প্যাঁচালো আইনকানুন থরে-বিথরে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পুরনো রেক্সিনের সবুজ আবরণ একটু-আধটু ছেঁড়া। গদি আঁটা চেয়ারে বসে প্রমথনাথ ড্রয়ার থেকে চশমার খাপ বের করেন। হাবল কাজি সামনের চেয়ার টেনে বসেন। পেছনে একপাশে সোফাসেট, অন্যপাশে গদিতে সাদা চাদরপাতা তক্তাপোশ। কাজি

বলেন, তোমার মেয়ে এসেছে দেখলাম। বলেই ফিক করে হাসেন। কান টানলে মাথা আসার মতো তোমার জামাইও এসে গেছে বলল।

এসেছে। তবে দুর্গাপুরের ইঞ্জিনিয়ার কাঁটালিয়াঘাটের কালীপুজোর মাহাত্ম্য বোঝে না। প্রমথনাথ সহাস্যে চাপা গলায় বলেন, কঙ্কালের নাচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বলে কী, ইণ্টারেস্টিং! ব্যস! বলো তুমি, ইণ্টারেস্টিং কথাটা কি যথেষ্ট হল?

আমার মেয়ে-জামাইও এসেছিল। বললাম কালীপুজোর মজাটা দেখে যাও। থাকল না। গাড়ি করে কলকাতা থেকে আসে। ফুড়ুত করে কেটে পড়ে। বিজনেস। ফিরে গিয়েই নাকি হংকং যাবে।

চা খাবে তো?

নাহ্। খেয়েই বেরিয়েছি।

আহা! পুজোর দিনে এলে! একটু মিষ্টিমুখ না করলে চলে?

সুগার বাড়িয়ে মারা পড়ি আর কী? কাজি সহসা গম্ভীর হন। আস্তে বলেন, শুনলাম আলম মির্জা দাদাপীরের মাজার মেরামত করবে। উরস দেবে। মেলা বসাবে। তুমি ভালই জানো, হাইকোর্টের ইঞ্জাংশনের মেয়াদ শেষ হয়নি। তা হলে এটা হয় কী করে?

প্রমথনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, মির্জা তা পারে না। সব শরিক একমত হয়ে সোলেনামাতে সই করবে। হাইকোর্টের পারমিশন নেবে। তবে না?

জোলাপাড়া—মানে মোমিনপাড়ার গিয়াসুদ্দিন আর মটরবাবুর সাহসে সাহস।

হুঁ। পালিটিকস এসে গেছে।

এখন কী করা উচিত বলো প্রমথ?

আইনজীবী একটু চিন্তার পর বলেন, আরেক শরিক তো মবিন খোন্দকার। তার সঙ্গে কথা বলেছ?

তাকে পাচ্ছি কোথায়? টাউনে নার্সিংহোমে আছে। বাঁচে কিনা।

নওয়াজ সায়েবের ছেলে-মেয়েরা তো বাংলাদেশের সিটিজেন। তবে তুমি এক কাজ করতে পারো। হাইকোর্টের ইঞ্জাংশন কপি নিয়ে এস ডি জে এমের কোর্টে ১৪৪ ধারা জারির জন্য পিটিশন করে দাও। লোকাল থানাকেও একটু বলে রাখো। তবে যতক্ষণ না পীরের এরিয়ায় ওরা হস্তক্ষেপ করছে, ততক্ষণ কিছু করার নেই। ওয়েট অ্যান্ড সি।

হাবল কাজি টাকে হাত বুলিয়ে বলেন, খোন্দকার খুব খান্দান-খান্দান করে। ওর শালা ফজু মিয়াঁকে তো চেনো। ছোট ভাগনির বিয়ের জন্য যতবার লোক নিয়ে আসে, খোন্দকার বলে, আদব কায়দা জানে না। চাষা!

আলম তার মাসতুতো ভাই। খোন্দকারের নাকে ঝামা ঘষে দিল হে! জোলার ছেলেকে জামাই করল—ওই গিয়াসুদ্দিন। আগের দিনে কী ছিল ভাবো! রাঢ়ের আয়মাদারদের সামনে গিয়াসের পূর্বপুরুষেরা চেয়ারে বসার সাহস পেত না। কালচারের তফাত ছিল। এখন আলম খাল কেটে ঘরে কুমীর ঢুকিয়েছে। এ তারই ফল। নাহ্! খোন্দকার ঠিকই বলে।

প্রমথনাথ হাসেন। আমাদেরও ভাই একই অবস্থা। এই কাঁটালিয়াঘাটে বামন-কায়েতের দাপট তুমি দেখেছ! হরিমোড়লের ছেলে মটর এখন বাবু হয়েছে। তুমিই মটরবাবু বললে। বায়েনপাড়া কালীপুজো দিচ্ছে। শুনলাম গত রাতে ন্যাটা বায়েনের ছেলে অশোক মদ খেয়ে সতু মুখুজ্যের মেয়ের হাত ধরে টেনেছিল। তাই নিয়ে বোমাবাজি হয়েছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এই সবে শুরু। প্রমথনাথ চাপা গলায় ফের বলেন, বছর বছর কেন বাজিপোড়ানো বাড়ছে তার ভেতরকার কথাটা বুঝতে পারছ তো? কাঁটালিয়াঘাট আর নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

কার নাকি হাত উড়ে গেছে শুনলাম?

ভবেশের ছেলের। রাতেই টাউনের হসপিটালে নিয়ে গেছে। এ কী জেনারেশন এসে গেল হে।

হ্যাঁঃ।

হাবল কাজি একটু পরে শ্বাস ছেড়ে বলেন, তাহলে তুমি যা বললে, ওয়েট অ্যান্ড সি। ঠিক আছে। ইতিমধ্যে আমি বরং টাউনে নার্সিংহোমে গিয়ে খোন্দকারের কানে কথাটা তুলি। শুনলাম মরো-মরো কণ্ডিশন। দেখি।

খোন্দকারের সঙ্গে তোমার নাকি বাক্যালাপ বন্ধ বলেছিলে?

সে কবেকার কথা। মসজিদে তো হামেশা দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

খোন্দকার মসজিদমুখো হয়েছে?

কবে! মুখের দাড়ি বুক ঢেকে ফেলেছে। আমি এখনও ধুতি ছাড়িনি। মবিন খোন্দকার ছেড়েছে বিশ বছর আগে। অবশ্যি ও আমাদের দুজনকারই সিনিয়র। তোমার কত হল হে?

সিক্সটি ফাইভ। তোমার?

কাছাকাছি।

প্রমথনাথ ড্রয়ার খুলে নস্যির কৌটো বের করেন। খোন্দকার বোধ করি সেভেণ্টি পেরোল। ওঃ! সে এক দিনকাল ছিল হে কাজি। ঘাটোয়ারি-বাবু দয়ারাম পাণ্ডে, খোনকারের ভাস্কর পণ্ডিত দেখে রুপোর মেডেল দিয়েছিল।

হুঁ। বঙ্গে বর্গীতে। হাবল কাজি খিক খিক করে হেসে ওঠেন। সিরাজুদ্দৌলাতে তুমি আলেয়া, মবিনভাই সিরাজ। তোমার গান একদিকে,

উমা নাপিতের হারমোনিয়ামের সুর অন্যদিকে। ভোম্বলবাবু উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে কর্নেটের আওয়াজে সিনটা বাঁচিয়ে দিলেন।

ওঃ! সত্যি সে এক দিনকাল ছিল। সাজাহানে খোনকার 'দেখে এলি জাহানারা' বলে আমার দুই কাঁধের হাড় ভেঙে ফেলে আর কি! পানু গাঙ্গুলির ঔরঙ্গজেব? পানু শেষ জীবনে পাগল হয়ে মরে গেল। ভেরি ট্র্যাজিক ডেথ।

আর আবসারের কথা চিন্তা কর প্রমথ। নটরাজের নাচ নাচতে স্টেজের তক্তাপোস ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু সে নাচ আর দেখতে পাও। টিভিতে অবশ্যি পাও। সে তো ছবি হে প্রমথ!

হ্যাঁ, নুরুল আবসার। সে শুনেছি ঢাকায় আছে ছেলেদের কাছে।

কী করবে এখানে থেকে? ছেলেরা পাকিস্তানে চলে গেল। তবে নুরুলের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। গতবছর একটা চিঠি লিখেছিল। ওর বাতিক তো জানো। পদ্যটদ্য নাচটাচ নিয়ে থাকত। ওখানে নাচের স্কুল করেছিল। পয়সাকড়ি, যশ সবই পেয়েছে। কিন্তু মনের সুখটি গেছে। লিখেছিল, কাঁটালিয়াঘাটের স্বপ্ন দেখি আর কাঁদি। নির্বাসিনের দুঃখ। তবে দেখ প্রমথ, আবসার চলে গিয়ে ভালই করেছে। এখানে থাকলে গফুরের মতো দর্জিগিরি করতে হত। ওর তো না প্রপার্টি, না ডিগ্রি—

ওঃ হো! প্রমথ ঝুঁকে এলেন টেবিলের ওপর। গফুরের ছেলে সানুর সঙ্গে সেদিন দেখা হল ঘাটবাজারে। কুতুবপুর হাইস্কুলের টিচার হয়েছে। বিয়ে করেছে বলল। ওর শ্বশুর হাশিম মীর বিরাট বড়লোক। আমার বাবার মক্কেল ছিল। এখন আমার মক্কেল।

বিয়ের বদলে মাস্টারি!

তার মানে?

শোনা কথা। তুমি তো এখানকার প্রসন্নময়ী স্কুলের সেক্রেটারি ছিলে?

আর নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড বসিয়েছে। নামকা ওয়াস্তে বোর্ড। মটরই চালায়।

তো শোনা কথা। প্রসন্নময়ীতে ডোনেশন চেয়েছিল ষাটহাজার টাকা। কোথায় পাবে সানু? কুতুবপুরে চেয়েছিল তিরিশহাজার। টাকাটা হাশিম মীর দিয়েছে। তার বদলে সে তার সানুর বয়সী মেয়েকে সানুর কাঁধে চাপিয়েছে। সানু এম এ বি এড। মীরের মেয়ে টেনেটুনে স্কুল ফাইনাল। বোঝো!

তোমার জামাই বিজনেসম্যান বলেছিলে। এডুকেশন?

আমেরিকায় বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট কোর্স করেছে। ডবল এম এ। মিনিও গ্রাজুয়েট।

বাহ্। আমার জামাই আই আই টির ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় তিনটে বাড়ি আছে। দুর্গাপুরে থাকে। কোয়ার্টার দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সরকারি খরচে মালী, আর্দালী, কেয়ারটেকার।

এ বয়সে এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব স্বাভাবিক। দুজনেই তা আঁচ করে প্রসঙ্গান্তরে যান, কেন না বন্ধুতার স্মৃতি মর্যাদা দাবি করে। কাজি বলেন, বেশ ছিলাম। আলম খামোখা ফ্যাসাদ বাধাতে চাইছে। শান্তিতে থাকবার জো নেই হে।

প্রমথনাথ চাপা গলায় বলেন, দেখ ভাই হাবল! আজকাল আইনকানুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেহাত কথার কথা। তুমি শেখপাড়ার ছৈরদ্দিকে একটু ম্যানেজ করো না।

ওরে বাবা! সে তো গুণ্ডা।

আইনজীবী হাসেন। ভেতরকার খবর বলছি। মটরের পার্টিতে রেষারেষি চলছে। ছৈরদ্দি বাগ মানছে না আর। বড় রায়বাবু—মানে ভবতারণ রায় এখন ছৈরদ্দিকে বাড়িতে ডেকে বিলিতি মদ খাওয়ান। তুমি ওকে ম্যানেজ করতে পারলে আর কথা নেই। পীরের থানে ছৈরদ্দি গিয়ে একবার দাঁড়ালেই —ব্যস।

রেষারেষিটা কীসের?

একটু আগে তুমি যা বলেছিলে আয়মাদার না খান্দান—ওই একটা সেন্সিটিভ স্পট। বড়রায়বাবুর ভ্যানিটিতে লেগেছে। হরি মোড়লের ছেলে হবে লিডার? রায়বংশের প্রতিষ্ঠিত স্কুল। পয়েণ্টটা বুঝতে পারছ?

হুঁ, ডেমোক্রেসি ইজ অল রাইট। কিন্তু অ্যারিস্টোক্রেসির আমল ছেলেবেলায় ছিটেফোঁটা তুমি যেটুকু দেখেছ, আমিও সেটুকু দেখেছি। আমাদের পূর্বপুরুষ দেখছেন তারও বেশি। তখন ছোট ছোটর মতই থাকত। ছোটকে যে টেনে বড় করা হয়েছে, সেটা কোন গুণে? রবার জিনিসটা টানলে বাড়ে। কিন্তু রবার বেশি টানলে ছিঁড়ে যাবে। যাচ্ছে।

প্রমথনাথ টেবিল চাপড়ে বলেন, অ্যাই, তুমি ঠিক ধরেছ। ছিঁড়েখুঁড়ে মবোক্রেসি দাঁড়িয়েছে।

হাবল কাজি বাঁকা হেসে বলেন, আমার জামাই সাউথ বেঙ্গলের ছেলে। কলকাতায় মানুষ হয়েছে। সে এসে অবাক হয়ে যায়, রাঢ়ের খান্দানি জিনিসটা কী? তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে অবশ্যি ট্রাডিশন তত ভাঙেনি। তোমরা বামুন কায়েতরা এখনও টপে রান করছ। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের মধ্যে খান্দানির মাজা ভেঙে গেছে। কলোনিপাড়ার লোকেরা সব মুসলমানকেই 'মিঁয়া' ডাকে। ওরা জানেই না, রাঢ়ে 'মিয়াঁ' একটা টার্ম। একটা স্পেশ্যাল ক্লাশ। অ্যারিস্টোক্রেটরাই 'মিয়াঁ'। তারা আশরাফ। বাদবাকি মুসলমান

আতরাফ। মিয়াঁ কখনও লাঙল ধরবে না। কোদাল কোপাবে না। এখনও তাই। বিড়ি বেঁধে খায়। রিকশো চালায়। দর্জিগিরি করে। দোকানদার হয়। কিন্তু কখনো চাষের কাজ করে না। মুনিশ খাটার কাজ নয়। সেদিন বাঁওরের মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে জমি দেখছি। শেখপাড়ার দুজন মুনিশ নিড়েন দিচ্ছে। কলোনিপাড়ার মাখন হাওলদার মুনিশদের ডাকল, অ' মিয়াঁভাই। কার জমিতে কাম করো? প্রমথ! তোমার কাছে কী লুকোব? খচ্ করে কানে বিঁধল। রিয়্যাল মিয়াঁ ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আর—

কাজির বাঁকা হাসি সহসা সরল হতে হতে ফেটে গেল। প্রমথ বলেন, হাওয়ার যা গতি, আর বিশ বছর পরে বামুনকায়েতও সিংহাসনচ্যুত হবে। তবে এটা পার্টিশনের পরিণাম হে! আমাদেরও ঘটি-বাঙাল আছে না? এখন ঘটিরা কাত হয়ে পড়ে আছে। বাঙালরা ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

কথাটা বলেই আইনজীবী জিভ কাটেন। চাপা গলায় ফের বলেন, আমার বেয়াইমশাই ঘটি। বেয়ানঠাকরুণ বাঙাল। মাঝে মাঝে যা বাধে না দুজনে!

কাজি বলেন, রায়বাবুরা কলোনি বসাতে বাধা দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার দেখ, শেখপাড়ার মুসলমানরাই রিফিউজিদের ফরে লড়েছিল। কেন বলো তো? ওই উঠবন্দি জমিতে তাদের পূর্বপুরুষ চাষ করত। রায়বাবুরা জমি অনাবাদী ফেলে রাখল, তবু চষতে দিল না। তারপর ফার্টি এইটে রিফিউজিরা এসে বসল। রায়বাবুরা ডি এমকে তিন হাজার ফলস্ লোকের সইসাবুদ দিয়ে পিটিশন দাখিল করলেন, ওটা খেলার মাঠ। ছেলেরা ফুটবল খেলবে কোথায়—হেন তেন। কার সাধ্য রিফিউজিদের আর ওঠায়? এখন দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন ছবিতে আঁকা সিনারি।

প্রমথনাথ বলেন, তুমি কালচারে তফাত বলছিলে। ঘটি-বাঙাল কালচারের একটা বড় তফাত দেখ। কাঁটালিয়াঘাটের মাটি শাক্ত। কালীপুজোর ধুমটাই এখানে বেশি। এখন তো তেইশখানা ঠাকুর হয়। গড়ে তেইশশো পাঁঠা বলি হয়। কলোনিপাড়ায় বৈষ্ণব মিস্টিসিজমের গন্ধ। দুর্গাপুজোয় বলি-টলির প্রথা নেই। কালীপুজোয় একখানা ঠাকুর ইদানীং হচ্ছে। তাও নিরামিষ পুজো। নিজেদের ঘাটে বিসর্জন দেয় সব কাজে আলাদা হয়ে থাকে। ওরা সেলফ-আইডেন্টিটি বজায় রেখে চলেছে। আর আমরা? হযবরল হয়ে গেছি। তাই না?

কাকলি চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢোকায় কথায় বাধা পড়ল। কাজিকাকুকে আমি চিনতেই পারিনি প্রথমে। আপনার মাথায় কত্তো চুল ছিল। দাড়ি অবশ্যি দেখেছিলাম। আপনার চুল ভ্যানিশ হল কেন কাকু?

হাবল কাজি বলেন তোর বাবার গোঁফ দেখে কি তুই কল্পনা করতে পারবি,

থিয়েটারে ফিমেল রোল করত ?

জানি। রুবির বাবার হিরোইন ছিলেন। কাকলি খুব হাসে। ভুলোন-জেঠু প্রাইমারি ক্লাসে সেইসব গল্প বলতেন।

প্রমথনাথ বলেন, তখন তুই কোথায় ? তোর মা-ই বা কোথায় ? কাজি চা খাবে না, সুগার বাড়বে বলছি। এবার ?

চা খাচ্ছি—কাকলির অনারে। কিন্তু মিষ্টির প্লেটটা নিয়ে যা মা।

কাকলি বলে, সে কী। পুজোর দিনে এসেছেন।

আজ পুজো কী রে ? আজ তো বিসর্জন।

কাকলি বলে, সেদিন ঘাটবাজারে রুবির সঙ্গে দেখা হল। বলল বাবার খুব অসুখ। ওকে ত্রিনয়নী দৈব ঔষধালয়ে কালীজ্যাঠার কাছে নিয়ে গেলাম। তো রুবি আছে, না কলকাতা চলে গেছে ?

কলকাতা যাবে কেন ? খোন্দকার টাউনে নার্সিং হোমে আছে। কলকাতায় রুবির এক মাসির বাড়ি।

বলল কলকাতায় বিয়ে হয়েছে। তিনটে বাচ্চা।

কার ? কার তিনটে বাচ্চা ?

রুবির।

হাবল কাজি খিক খিক করে হাসেন। মাথাখারাপ ? এখনও ওর বিয়েই হয়নি। লোকেরা এসে দেখে যাচ্ছে। খোন্দকারের পছন্দ হচ্ছে না। অ্যারিস্ট্রোক্রেসির ভূত কাঁধ থেকে নামেনি।

সে কী! কাকলি অবাক হয়ে যায়। অদ্ভুত মেয়ে তো! এমন সিরিয়াসলি বলল—

কাজি আস্তে বলেন, মাথায় একটু ছিট বরাবরই ছিল। এখন বেড়ে গেছে। স্কুলফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছিল। টুয়েলভ্থে হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিল। খোন্দকার শাসনে রাখতে পারেনি ছেলেবেলা থেকে। এখন আর পারে ?

কাকলি বলে, সবই জানি। রুবি আমার ক্লাশফ্রেন্ড ছিল পরমেশ্বরীতে। একটু হুইমজিক্যাল টাইপের মেয়ে অবশ্যি ছিল। কিন্তু আশ্চর্য তো!

প্রমথনাথ বলেন, আশ্চর্যের কী আছে ?

কাজি বলেন, ছেড়ে দাও। তোরা কিছুদিন থাকছিস তো কাকলি ?

কাকলি বলে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন চলে যাব।

ওই! ঠিক আমার মিনির টোনে টোন। বাপের বাড়ি এসেই পালাই পালাই রব খালি। আসলে আরবান লাইফের স্বাদ পেয়ে গেলে গ্রামে এসে মন টেকে না। মিনি এল রবিবার রাতে। তারপর যাব যাব করে অস্থির। পরশু চলে গেছে।

মিনিদি এসেছিলেন ? ওঃ কতদিন দেখিনি ও'কে। গঙ্গায় সুইমিং রেসে যে বার ফার্স্ট হলেন, সেবার আমি ক্লাস টুতে পড়ছি। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আর সুইমিং রেস হয় না বাবা ?

প্রমথনাথ বলেন, হয়। তবে আগের গ্র্যাঞ্জার আর নেই। পরমেশ্বরীতেও পলিটিকস ঢুকে গেছে। এদিকে প্রসন্নময়ীর ছেলেরা এখন সারাবছর ক্রিকেট খেলে। কাজি! আমাদের ছেলেবেলায় ইউনিস-ইসমাইল দুভাই মিলে ব্যায়ামাগার গড়েছিল না ? মুগুর-বারবেল ভাঁজা, ডন বৈঠক—তারপর ওরা পাকিস্তানে চলে গেল। বছর দু-তিন চলার পর ব্যায়ামাগার মুখ থুবড়ে পড়ল। আজকালকার ছেলেদের এইসবে ইণ্টারেস্ট নেই। ক্রিকেট আর টিভি। তার ওপর ভি ডি ও পার্লার। লোকাল কালচার বলতে টিমটিম করে টিকে আছে শুধু কালীপুজোর রাতে কঙ্কালের নাচ।

কাজি বলেন, কাকলি দেখতে যাসনি ?

যাব না আবার ? কাকলি একটু হাসে। আপনার জামাইকেও নিয়ে গিয়েছিলাম।

কেমন দেখলি বল ?

কাকু, সত্যি বলতে কী, আগের মতো জমল না। কালীজ্যাঠা ঠিক—

প্রমথনাথ মেয়ের কথার ওপর বলেন, কালীনাথের সে বিদ্যে কোথায় ? ওর পক্ষে ওই ত্রিনয়নীতে বসে দৈব ওষুধের ডাক্তারিই উপযুক্ত। আগে যারা নাচাত, তারা ইয়াকুব সাধুর চেলার চেলা তস্য চেলা।

কাকলি বলে, শ্মশানতলা যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনই ছিল। মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। কঙ্কালও গাছের ডাল থেকে ঝুপ করে নেমে একটুখানি নাচল। তারপর উঠে গেল। ভ্যানিশ! কিন্তু গা ছমছম করবে, তবে না ? টুকুনের বাবা টর্চ জ্বালতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলাম। ও বলে কী, চিপ ম্যাজিক!

হাবল কাজি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠলেন। চলি প্রমথ ? চলি রে মা! বলে পা বাড়িয়ে কাজি ঘুরলেন। আজকাল মানুষ আলোর খেলা দেখেই বেশি মজা পায়। অন্ধকারে খেলা দেখার চোখ থাকা চাই তো। না কী হে প্রমথ ?

রাইট। তুমি ঠিক ধরেছ। প্রমথনাথ টেবিল চাপড়েছিলেন। কাকলি হেসে উঠেছিল। কাজি চলে যাওয়ার পর প্রমথনাথ বলেন, কী হিন্দু, কী মুসলমান, আজকাল আর ট্রাডিশনের মাহাত্ম্য বোঝে না। আলম মির্জারা দাতা পীরের থান মেরামত করবে। জন্মদিন পালন করবে। মেলা বসাবে আগের মতো। কাজিসাহেব তাতে বাগড়া দিতে চায়। প্রব্লেম হল, এ সব ব্যাপারে সেণ্টিমেণ্ট এত কাজ করে যে বারণ করলে ভাববে আমি মির্জার

পক্ষে আছি।

বাবা! কাকলি নড়ে ওঠে। আমার টুকুনের জন্য দাতা পীরের থানে ঘোড়া মানত করে রেখেছি। আজ বিসর্জনের দিন, তুমি কাল সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাবে কিন্তু। সাইকেল রিকশোয় যাব। মানত দিয়ে চলে আসব।

পীরের ঘোড়া পাচ্ছিস কোথায়? কুমোরেরা আর তৈরি করে না।

অর্ডার দিলে তৈরি করে দেবে না?

প্রমথনাথ একটু পরে বলেন, তুই যে এই মানত করেছিস, এটা আমার খুব ভাল লাগছে। কাঁটালিয়াঘাটের সেকেণ্ড ট্রাডিশন ওই দাতা পীর। মুসলমানরা বলে দাদা পীর।

কাকলি আস্তে বলে, বি এ পার্ট টুয়ের রেজাল্ট বেরুনোর আগের দিন তুমি মানত দিয়ে এসেছিলে। তখন আমি টুকুনের ঠাকুর্দার বাড়িতে কলকাতায় ছিলাম। তুমি চিঠি লিখেছিলে পরে। তার আগেই রেজাল্ট বেরিয়েছিল। পাশ না করতে পারলে মুখ দেখাতে পারতাম না।

হুঁ। সংকল্প যখন করেছিস, পালন করবি। আমি ধনু পালকে বলে পাঠাচ্ছি। আমার কথায় না করতে পারবে না। তবে তুই প্রীতীশবাবাজিকেই সঙ্গে নিয়ে যাস। কাঁটালিয়াঘাটের সয়েলটা ওর চেনা উচিত। রাজা কর্ণ সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—যেটাকে মুসলমানরা জিনের ডাঙা বলে, সেটাও দেখিয়ে আনবি। লাল মাটির মিস্ট্রিটা আমি ওকে বুঝিয়ে দেব। নিচে গঙ্গার পুরনো খাতটাও দেখে আসুক। কাঁটালিয়াঘাট গ্রাম ছিল না রে খুকু! কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। সমৃদ্ধ নগরী কণ্টক-কলি উচ্চারণ দোষে কাঁটালিয়া হওয়ার পর ঘাট জুড়ে গেছে। অধঃপতন!

প্রমথনাথ এই কথাগুলিন বলার পর হাই তুলে 'মা গো!' বলে তুড়ি দিলেন। তাঁর এই মা ডাকে নিজের জীবনের প্রচ্ছন্ন আর্তি ছিল। আইন-জীবীরও একটা নিজস্ব জীবন থাকে। স্মৃতি থাকে।...

বিকেলে বিসর্জন দেখতে সেজেগুজে বেরুচ্ছিল কাকলি। টুকুন থাকবে দিদিমার কাছে। প্রমথনাথ জামাইয়ের পোশাক দেখে একটু হাসেন। তুমি প্যাণ্টশার্ট পরে যাচ্ছ? আজকের দিনটা এখানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে হয়। কালচারাল ট্রাডিশন।

কাকলি বলে, ওকে সেটাই বোঝাচ্ছিলাম। কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে আসেনি। আমারও মনে ছিল না।

তার মা হৈমন্তী দুষ্টু নাতিকে সামলাচ্ছিলেন। কথাটা কানে গেলে বলেন, বড্ড বেশি ভিড় হবে। প্যাণ্টশার্টই ভাল। কাকলি, পই পই করে বলে দিচ্ছি কিন্তু। কখনো ভিড়ে ঢুকবিনে তোরা। সব মদ-মাতাল এসে জুটবে। গায়ের

ওপর পটকা ছুঁড়বে।

প্রমথনাথ বলেন, আজকের দিনটা ওই একটু—

ট্রাডিশন-কালচার বলো বাবা! কাকলি হেসে ওঠে। তারপর প্রীতীশকে বলে, টর্চ নাও। বাজি পোড়ানো দেখে বাড়ি ফিরব।

প্রীতীশ বলে, আজও বাজি পুড়বে নাকি?

প্রমথনাথ বলেন, পুড়বে কী বলছ? আজই তো আসল বাজি পোড়ানোর ধুম। কালকের দ্বিগুণ। গঙ্গার আকাশ জ্বালিয়ে দেবে। ছাদে বসে দেখি। তেইশখানা ঠাকুরের বিসর্জন কি কম কথা? তাছাড়া ওপারে মহুলা, এপারে কাঁটালিয়াঘাট। মহুলা গত বছর থেকে কম্পিটিশনে নেমেছে। অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশের বোট—এলাহি কাণ্ড।

হৈমন্তী বলেন, গেল বছর তিনটে নৌকা ডুবে পঁচিশজন মরেছিল। এবার মা কতজনকে খাবেন কে জানে!

কাকলি ও প্রীতীশ বেরিয়ে পড়ে। এটা বাবুপাড়া। মাটিটা উঁচু। কোথাও ঘিঞ্জি গলি-রাস্তার দুধারে মাটি আর ইটের নতুন বা পুরনো বাড়ি। কোথাও পোড়ো ভিটের জঙ্গল গজিয়ে আছে। কাকলি বলে, শর্টকাটে যাই এস। পাড়ার ভেতর দিয়ে গেলে হাজারজনকে বলতে হবে, কবে এসেছি। কদিন থাকছি। আবার ওই এক উপদ্রব। কাল শুনলে না?

কী?

কত মাইনে পাও জানতে চাইল! আফটার অল গ্রাম তো।

আচ্ছা খুকু, তোমার বাবা বলছিলেন আঠারোপাড়া গ্রাম। সত্যিই কি আঠারোটা পাড়া আছে?

কে গুনে দেখেছে! ওটা একটা কথা। বড় গ্রামের টাইটেল। আমাদের গ্রাম পুরোটা দেখতে দুদিন লেগে যাবে।

পপুলেশন নাকি পনের হাজার! আই ডাউট।

কী বলছ? ব্লক এরিয়া, তারপর টাউনশিপটা আছে। হাসছ যে?

গঙ্গার ধারে ওই বিশ-ত্রিশটে বাড়ি টাউনশিপ?

লোকে বলে। কারও কিছু করার নেই। তবে ওরা আউটসাইডার। ওরা এসেই ঘাটবাজার এরিয়ার জমির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

তা হলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ঘটনা একেবারে চোখের সামনে সত্যি ঘটছে!

ভ্যাট! সে তো বর্ডার এরিয়ায়।

তা হলে এরা কারা?

আশে-পাশের গ্রাম থেকে প্রপার্টি বেচে এখানে সেটল করেছে। বাবা বলছিলেন। খুনোখুনি, লুঠপাট, অরাজকতা এত বেড়ে গেছে না? এখানে

ওসব ততটা নেই। তা ছাড়া বিজনেস করতেও আসছে। নন-বেঙ্গলিরাও আছে।

হুঁ। বাংলাদেশের বিহারি মুসল

তুমি—তুমি না এমন বোকার মতো কথাবার্তা বলো। মুর্শিদাবাদ জেলা সেই কবে থেকে মারোয়াড়ি বিজনেসম্যান ভর্তি। জৈন, আগরওয়াল এইসব। তারা কাটালিয়াঘাটে টাকার গন্ধ পেয়ে কবে ছুটে এসেছে।

তোমাদের টাউনশিপে মুসলমান নেই?

থাকবে না কেন? বললাম না আশেপাশের গ্রাম থেকে—এবার আর ওসব কথা নয়। কাকলি তর্জনী তোলে। ওই দেখ পরমেশ্বরী গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। ইশ! দেখলেই মন কেমন করে ওঠে। মা মুক্তকেশীর মন্দিরটা নতুন করে ফেলেছে। কিন্তু কল্কেফুলের জঙ্গলটা ভ্যানিশ। কোনও মানে হয়?

উঁচু মাটি থেকে দেখা ঘাটবাজার, টাউনশিপ, শ্মশানতলা আর গঙ্গার সুদৃশ্য ল্যান্ড স্কেপ এখনই মানুষের ভিড়ে বেঁকেচুরে গেছে। গঙ্গায় নৌকারও ভিড় ছিল। প্রচণ্ড মাইক বাজছিল। প্রীতীশ বলে, এখানে একটু বসি। কী বলো?

তুমি কী? কাকলি নাকে রুমাল চাপা দেয়। দুর্গন্ধ পাচ্ছ না? গ্রামের লোকেদের—বিশেষ করে মেয়েদের এই এক ব্যাড হ্যাবিট। সুন্দর সুন্দর নির্জন জায়গা দেখলেই—ছিঃ! চলে এস শিগগির!

ঢালু পায়ে চলা রাস্তায় নেমে ওরা খেলার মাঠের কাছে এল। মাঠে এখনই মানুষজনে ঢেকে গেছে। প্রীতীশ বলে, ওই স্ট্যাচুটা দেখা যাচ্ছে—কার বলো তো?

ওর পাশ দিয়েই তো স্টেশন রোড। তুমি কিছু লক্ষ্য করো না। পরের বার এলে কিন্তু ডিরেক্ট গাড়ি করে আসব। দুর্গাপুর থেকে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে কাটোয়া হয়ে আসা যায়।

আসব। কিন্তু স্ট্যাচুটা কার?

বিদ্রোহী কবির। জানো? ওখানে প্রত্যেকবছর ১১ জ্যৈষ্ঠ বিশাল ফাংশন হয়। মিনিস্টাররা আসেন।

হুঁ, মুসলিম মেজরিটি এরিয়া। রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচুটা কোথায়?

তোমার মাথায়। কাকলি হাসে। খালি নিউজপেপার পড়ে—

না। আমি বলছি, রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু নেই কেন?

স্ট্যাচু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী কম হয় না। পরমেশ্বরীতে, প্রসন্নময়ীতে, তারপর ঘাটবাজারের আঞ্চলিক পাঠাগারে, কলোনিপাড়ায়—কত্তো! প্রভাত-ফেরী হয়। জানো? আমি চিত্রাঙ্গদা করতাম। কাকলি আবার হেসে

ওঠে। বাবা—তোমার পূজনীয় শ্বশুরমশাই নাকি থিয়েটারে ফিমেলরোল করতেন। কল্পনা করতে পারছ। মুসলমানপাড়ায় আমার এক বন্ধু আছে রুবি। ওর বাবা থিয়েটারে হিরোর রোলে আর আমার বাবা হিরোইন। ভাবা যায় না। তুমি কিন্তু রুবিকে দেখে মুসলমান বলে চিনতেই পারবে না। কথাবার্তাও আমাদের মতো। কী দুষ্টু মেয়েরে বাবা। সেদিন দিব্যি বলল কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, তিনটে বাচ্চা—একেবারে মিথ্যে! সকালে কাজিকাকু বলেছিলেন, ওর বিয়েই হয়নি। দাতাপীরের থানে কাল ঘোড়া মানত দিতে গেলে তোমার সঙ্গে রুবির আলাপ করিয়ে দেব। থানের কাছেই ওদের বাড়ি।

প্রীতীশ একটু পরে বলে, নির্লজ্জ মুসলিমতোষণ। রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু নেই।

ওঃ! বিসর্জন দেখতে এসে খালি নিউজপেপারের কথাবার্তা। এস তো!

ভিড়ে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। বাপস! টেরিফিক ট্রাডিশন।

কিন্তু গঙ্গার ধারে না গেলে বিসর্জন দেখা যাবে না। বাজি পোড়ানোও দেখা হবে না। এস। পিচরাস্তা কোনওরকমে ক্রশ করে সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানে ঢুকি। কাকলি বালিকা হয়ে গেল এবং তার ভঙ্গিতে ছিল 'রেডি স্টেডি গো!'

পিচরাস্তার ভিড় ঠেলে ওপারে যেতে কাকলির শাড়ির ভাঁজ ভেঙে যায়। প্রীতীশ বলে, এরা উন্মাদ না কী? একটু ডিসিপ্লিন নেই। মেয়েদেরও লজ্জাটজ্জা নেই। তোমার কপালের টিপ—প্রীতীশ হাসে। কপাল মুছে ফেলো।

কাকলি রুষ্টমুখে বলে, দিনে দিনে এমন অসভ্যতা বেড়ে গেছে জানতাম না।

প্রীতীশ আবার হাসে। চাপা গলায় বলে, সেক্সুয়াল টাচ তো? প্রিমিটিভ বডির টেস্ট।

শাট আপ! তুমি এনজয় করলে বলো।

ওদের দোষ নেই। তোমার যা সেক্সি ফিগার। তার ওপর ফিল্মের হিরোইন ছাপ। আমারই ভেতর এক প্রিমিটিভ ম্যান জেগে উঠছে, তো—

কাকলি রাগতে গিয়ে হেসে ফেলে। সিঙ্গিমশাইদের আমবাগানে কিছু নির্জনতা ছিল। শর্টকাটে একটা কোণ পেরিয়ে গিয়ে সে বলে, এ কোথায় এলাম। আমার সব অচেনা হয়ে গেছে দেখছি। এখানটা এমন তো ছিল না।

নিচের জলে আলুথালু ধানখেত। গঙ্গা অনেক দূরে বাঁক নিয়ে চলে

গেছে। অবার ঘুরে পিচরাস্তার ভিড়টা পেরিয়ে ঘাটবাজারের পেছন দিয়ে শেষে ব্লক অফিস এরিয়ায় গেল ওরা। তারপর আবার ভিড় ঠেলে টাউনশিপে ঢুকল। কাকলি তখন রাগে ফুঁসছে।

প্রীতীশ বলে, বাহ্। বাড়িগুলো তো বেশ করেছে। কিন্তু সামনের রাস্তায় আবার ভিড়। কী করবে দেখ।

কাকলি জোরে শ্বাস ছেড়ে বলে, আমি যে এখানে এদের কাকেও চিনি না। নৈলে কারও বাড়ির ছাদে উঠে বসতাম। এখান থেকে সব ঠাকুর দেখা যায়। ওই রাস্তাটা গঙ্গার প্যারালালে। ভিড় ওখানেই বেশি। ঢোকা ইমপসিবল। ধুশ! কোনও মানে হয়?

প্রীতীশ এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিল। বলে, আমি ম্যানেজ করব?

কীভাবে?

দেখ না তুমি এখানকার মেয়ে। তুমি একটু কোঅপারেট করলেই আই ক্যান ডু দ্যাট ওয়েল।

বাঁদিকে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা একটু ফুলবাগান। গেটের মাথায় বুগেনভিলিয়া। তারপর একতলা বাড়ির ছোট্ট বারান্দা ওপর থেকে নিচে অব্দি ল্যাভেন্ডার ফুলের ঝারোকায় প্রায় ঢেকে গেছে। বাড়িটার ছাদে কাকলির বয়সী এক যুবতী চেয়ার পেতে বসেছিল। হাতে একটা বই। সে প্রীতীশ ও কাকলিকে দেখছিল। চোখে চোখ পড়লে প্রীতীশ স্মার্ট হয়ে বলে, আচ্ছা, এখানে জগমোহনবাবুর বাড়িটা কোথায় জানেন?

সে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। বাড়িটা পরে দোতলা হবে, এইভাবে তৈরি। রেলিং নেই ছাদে। জগমোহনবাবু? পদবি কী?

জগমোহন ধাড়া। প্রীতীশ কাকলিকে অবাক করে বলে। বাজারে নাকি কাপড়ের দোকান আছে।

টাউনশিপে তো ও নামে কেউ নেই। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

দুর্গাপুর। প্রীতীশ কাকলির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, আমি অবশ্যি দুর্গাপুরে থাকি। ও এখানকারই মেয়ে। ইনট্রোডিউস ইওরসেলফ।

কাকলি চালটা নিমেষে ধরতে পারে। একটু হেসে বলে, আমার নাম কাকলি মজুমদার। আমার বাবা প্রমথনাথ মজুমদারকে নিশ্চয় চেনেন। অ্যাডভোকেট। বাবুপাড়ায় আমাদের বাড়ি।

প্রীতীশ বলে, কী প্রব্লেম দেখুন। শ্বশুরমশাইকে জগমোহনবাবু বলে এসেছিলেন, তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে বিসর্জন দেখা যায়। মেয়ে-জামাইকে নিয়ে যাবেন যেন। শ্বশুরমশাই হঠাৎ একটু অসুস্থ। এদিকে কাকলি লোকাল মেয়ে হয়েও বাড়িটা চেনে না। প্রীতীশ মুখটা করুণ করে ফেলে। কী বিচ্ছিরি ভিড় সর্বত্র। এখন না পারছি এগিয়ে যেতে, না পারছি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে।

এর অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন।

আপনারা ইচ্ছে করলে আসতে পারেন। ইউ আর ওয়েলকাম। এখান থেকে মোটামুটি দেখা যায়। শুধু আগরওয়ালাজির দোতলা বাড়িটাই একটু বাধা। তবে ও কিছু না।

প্রীতীশ কাকলিকে বলে, কী করবে তাহলে? তা-ই চলো। উনি ইনভাইট করছেন যখন।

যুবতী নেমে এসে হাসিমুখে গেটখুলে বলে, আসুন। লেট মি ইনট্রোডিউস মাইসেলফ। ভারতী দাশগুপ্ত। আমার হাজব্যান্ড, সন্দীপ দাশগুপ্ত, পাওয়ার স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র। কাল থেকে ওভারডিউটি চলছে ওর। এখানকার মানুষজন যা অ্যাগ্রেসিভ। বিশেষ করে কালীপুজোয় আলো না থাকলে বোমা মেরে সব গুঁড়িয়ে দেবে।

অমায়িক কণ্ঠস্বর এবং হাসি। পরনে নীল তাঁতের শাড়ি আর স্লিভলেস ম্যাচিং কালারের ব্লাউস। গলায় ভুমো ভুমো সাজানো ইমিটেশন মালা ঝুমকো। কপালে নীল টিপ। ঠোঁটেও ম্যাচিং কালার। উদ্ধত খোঁপায় জুঁইফুলের মালা জড়ানো। দু'হাতে ঝকঝকে শাঁখা আর নীল বালা। মুখের লাবণ্য প্রসাধিত, তবে—প্রীতীশের মনে হচ্ছিল, দরকার ছিল না। কাকলির মতো ফর্সা না হলেও একেবারে নিষ্প্রভ রঙ নয়। তার মাথায় আসছিল কবিতার সেই লাইনটা, 'নীলিমায় নীল'—রবীন্দ্রনাথের 'ছবি'। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্টাচু নেই কেন? প্রীতীশের মনে ক্ষোভটা ফিরে এল। এবং মুসলিম-তোষণ ব্যাপারটাও।

ভারতী করজোড়ে নমস্কার করেছিল। প্রীতীশও নমস্কার করে বলে, আমি প্রীতীশ রায়। কাকলি বলে দেয়, আই আই টি ইঞ্জিনিয়ার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে—

ও কাকলি! দ্যাটস ম্যাচ। প্রীতীশ বাগানটুকুর প্রশংসা করে। আপনার রুচি আছে। বাহ্।

ভারতী কাকলিকে বলে, আপনি একটু হেল্প করুন ভাই। চেয়ারটা আমি নেব। আপনি মোড়া।

সে ঘরের তালা খোলে। প্রীতীশ বলে, না না। একটা মাদুর বা সতরঞ্চিই এনাফ।

আপনি প্যান্ট পরে আছেন। বসতে অসুবিধা হবে।

মোটেও না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ছাদে সতরঞ্চি বিছিয়ে ভারতী বলে, আপনারা আসাতে খুব ভাল লাগছে। কী লোনলি ফিল করছিলাম জানেন? টাউনশিপে তো মেশার মতো কেউ নেই। সব আঙুলফুলে কলাগাছ ফ্যামিলি, আর ভীষণ গ্রাম্য। ভীষণ!

বসুন ! বসুন ! চা নিয়ে আসি। তারপর আড্ডাটা জমবে।

কাকলি বলে, না না চা খাবো না। খেয়েই বেরিয়েছি।

প্রীতীশ মুখে দুষ্টু ছেলের হাসি এনে বলে, আমি কিন্তু খাব। বিসর্জনের দেরি আছে। কাকলি, যাও ! তুমি ওকে হেল্প কর।

ভারতী বলে, আপনি বসুন তো ভাই। বেড়াতে বেরিয়ে কেন চা করবেন ? সে পাখির পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। প্রীতীশ চাপা গলায় বলে, দেখলে তো কেমন ম্যানেজ করলাম ? সব বাড়ির ছাদে মেয়েরা গিজ গিজ করছে। আমার দৃষ্টির প্রশংসা কর।

কাকলি কপট রাগ দেখিয়ে বলে, দেখো ! প্রেমে পড়ে যেও না। দেখছি একটু গায়ে পড়া হ্যাবিট আছে।

আমার ?

হ্যাঁ। তোমারও।

সত্যি বলছি, রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন মনে আসছিল, 'নীলিমায় নীল'।

শাট আপ ! মুড নষ্ট কোরো না। যা দেখতে এসেছ, দেখ। আমি কিন্তু তোমাকে ওয়াচ করব।

খুব শিগগির ট্রেতে চা আর স্ন্যাক্সের প্লেট নিয়ে এল ভারতী দাশগুপ্ত। প্রীতীশ বলে বাহ্ ! অসাধারণ ! আড্ডাটা জমবে ভাল।

ভারতী বলে, স্পটে গিয়ে বিসর্জন দেখার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। তাছাড়া বাজির খানিকটা মিস করবেন। কেন জানেন ? গঙ্গার জলের ওপর দিয়ে এক ধরনের বাজি পোড়ায়। ঠিক জালমাকড়সার মত ভেসে গিয়ে আকাশে ওঠে। কী অসাধারণ না ! আপনি তো এখানকারই মেয়ে। বলুন ?

কাকলি বলে, আমি কয়েকটা কালীপুজো মিস করেছি। বাইরে ছিলাম। কাল রাতে কঙ্কালের নাচ দেখতে গেলাম। কিন্তু আগের থ্রিলটা পেলাম না। আপনি দেখতে যাননি ?

না। বাড়ি ফেলে একা যাব কী করে ? ওর তো ওভারডিউটি।...

রাত ন'টা অব্দি বাজিপোড়ানো দেখার পর কাকলি প্রীতীশকে প্রায় জোর করে ওঠাল। দু'জনে সারাক্ষণ 'নিউজপেপার' (কাকলির টার্ম) হয়ে বকবক করছিল। দু'জনেই সবকিছুতে একমত। মুসলিম তোষণ, অরাজকতা, মস্তানতন্ত্র, গুণ্ডামি, কমিউনিস্টদের মুণ্ডুপাত এইসব বিষয়ে একই সিদ্ধান্ত। কান ঝালাপালা কাকলির। বাড়ি ফেরার সময় সে ফেটে পড়ে। সবকিছুর একটা লিমিট থাকা উচিত। বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আমার চোখের আড়ালে কী করে বেড়াও। একটা অচেনা আজেবাজে মেয়ের সঙ্গে—তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

কিন্তু এটি ছিল ধানীপটকা মাত্র। বাড়ি ফিরে প্রমথনাথকে বিসর্জন ও

বাজি পোড়ানোর রিপোর্ট দিতে দিতে সহসা অ্যাটম বোমাটি ফেটেছিল। প্রমথনাথ বলেছিলেন, ভারতী? আরে কী কাণ্ড! ও মেয়েটা তো মুসলমান। শাহজাদপুরের কমিউনিস্ট লিডার মফিদুল ইসলামের মেয়ে। কী যেন নামটা —জাহানারা! কাগজে বড় করে খবর বেরিয়েছিল না? কেলেঙ্কারির একশেষ।···

৮

ধনু পাল পড়ন্ত বেলায় হাঁপাতে হাঁপাতে তিনটে খুদে ঘোড়া নিয়ে এল! ফোকলা মুখে করুণ হেসে সে বলে, আর পীরের ঘোড়া গড়ি না বাবুদাদা। খদ্দের নেই। এদিকে কাল বিসর্জনের দিন ভাঁটিতে আগুন দিই না। আজ ভোরবেলা উঠে কোনরকমে হাত চালিয়ে এতক্ষণে নামালাম। সাতখানা চড়িয়েছিলাম। চারখানা ফেটে গেল। তো মানতের কাজে ভক্তিই মূল কথা। সে আপনি একখানা দিলেও ভক্তি, একশখানা দিলেও—তা বাবুদাদা, কোর্ট খুললেই মামলার দিন। একটু দেখবেন যেন। বউমা করবে স্যুইসাইড, আর খামোকা আমাদের গুষ্টিশুদ্ধ ধরে টানাটানি। এ কী দিনকাল পড়ল বাবুদাদা!

পরশু কোর্ট খুলবে। তুমি—এখানে না, আমার টাউনের চেম্বারে গিয়ে দেখা করো। নথিপত্র ওখানেই আছে। প্রমথনাথ ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করছিল। কাকলি! এসে গেছে। প্রীতীশকে বল। সূর্যাস্তের আগেই থানে চড়াতে হবে। ঘাটবাজারে সাইকেল রিকশ পেয়ে যাবি।

কাকলি তৈরিই ছিল। কিন্তু প্রীতীশের দুপুর থেকে মাথাব্যথা। জ্বরভাব। তার শাশুড়ির মতে, খোলা ছাদে বসে বাজিপোড়ানো দেখেছিল। শিশির লেগেছে। অভ্যাস নেই যে!

অগত্যা প্রমথনাথকেই বেরুতে হয়। পথে যেতে যেতে বলেন, দেখলি তো? ঠিকই ঘোড়া এসে গেল।···

প্রীতীশের শরীরে ম্যাজমেজে ভাবটা অবশ্যি সত্য। একটা অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট খেয়ে ঘামছিল। ফ্যান ঘুরছিল ফুল স্পিডে। তার মাথায় একটা শব্দ ঘুরছে কাল রাত থেকে। 'ইমিটেশন'।

আজকাল আসল গয়নাগাটি পরে মেয়েরা বাইরে যায় না। তার ছোটবেলা থেকে এই শব্দটা জানা। তার দিদি রাখীর কানের লতি ছিঁড়ে সোনার রিং নিয়ে পালিয়েছিল নিউমার্কেটে। একেবারে দিনদুপুরে ভিড়ের মধ্যে এই ছিনতাই।

কাল বিকেলে 'নীলিমায় নীল'-এর ইমিটেশন ঝুমকো আর হার তার চোখে পড়েছিল। কিন্তু আস্ত একটা মানুষ—একটি মেয়ে পুরোটাই ইমিটেশন! এতটুকু বোঝা যায়নি। কোন্ কমিউনিস্ট নেতা মফিদুল ইসলামের মেয়ে জাহানারা ইসলামকে কোন ডিপ্লোমাকোর্সে পাস করা হাফ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ দাশগুপ্ত বিয়ে করে বসেছে এবং সেই মুসলমান মেয়ে 'ভারতী' হয়ে শাঁখা-সিঁদুর পরে আই আই টি-তে পাস প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ারকে ধোকা দিতে পারল। আরও অদ্ভুত, তারই শ্বশুর প্রমথনাথ মজুমদার এই ইমিটেশন হিন্দুর মামলা লড়ে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ দিব্যি চেপে গেল। সবটাই অদ্ভুত।

হৈমন্তী নাতিকে কোলে নিয়ে জামাইকে দেখতে এলেন। এ কী! ফ্যান চালিয়েছ এত জোরে?

প্রীতীশ উঠে বসে বলে, অ্যানালজেসিক খেয়েছিলাম। ভীষণ গরম লাগছে।

শরীর ভাল থাকলে সঙ্গে যেতে। দেখে আসতে। খুব জাগ্রত দাতাপীর। এ বাড়িতে যখন বউ হয়ে এলাম, শ্বশুরমশাই দুজনকে মানত চড়াতে পাঠিয়ে-ছিলেন। তখন বছর বছর পৌষমাসে মেলা বসত। লাখে লাখে লোক। সেই আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ থেকে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে মারোয়াড়িরাও আসতেন। তারপর সাত শরিকে মামলা বাধিয়ে থানকে পতিত ফেলে রাখল। তেমনই ফলও পেল হাতে নাতে। বড় শরিক নওয়াজ চৌধুরীদের রাজপ্রাসাদে ঘুঘু চরছে। সত্যি গো! রাজপ্রাসাদ ছিল। হৈমন্তী নাতির দিকে তাকিয়ে হাসেন। ব্যস; ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি। দোলনায় শুইয়ে দিই।

প্রীতীশ বলে, মুসলিমদের মধ্যে একতা যত, খুনোখুনিও তত। ধর্মের নামে ফ্যানাটিসিজম ওদেরর এক করে। কিন্তু—

হৈমন্তী তার কথার ওপর বলেন, কাকলির বাবা একটা মজার কথা বলে। ওরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে বলে কোর্টকাছারি চলছে। শুধু হিন্দুরা দেশে থাকলে ওকালতি ডকে উঠত। হাসতে হাসতে তিনি দোলনার কাছে যান। তারপর বিছানা গুছিয়ে নাতিকে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে তিনি পাশে চেয়ার টেনে বসেন।

প্রীতীশ বলে, ওই মুসলিম মেয়েটির মামলার ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। বাবামশাই এক্সপ্লেন করলেন না।

মামলা বিয়ে নিয়ে নয়। রামনগর বি টি কলেজে ভর্তির সময় বাবার নামের জায়গায় স্বামীর নাম লিখেছিল। মেয়ে মুসলমান স্বামী হিন্দু। তবে সেটাও কথা না। ধর্মের জায়গায় ঢ্যারা দিয়েছিল। কলেজের তো একটা নিয়ম কানুন আছে। ভর্তি করেনি। তখন ওর বাবা একদিন গোপনে কাকলির বাবার কাছে এল।

বাবামশাইয়ের এসব কেস নেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আশ্চর্য ব্যাপার, কী অকৃতজ্ঞ মেয়ে। শ্বশুরমশাইয়ের হেল্পের কথা চেপে গেল।

হয়তো লজ্জা পেয়েছিল। তবে কমিউনিস্ট লিডার বলেও না, কাঁটালিয়া-ঘাটে ওদের এখন বড় ঘাঁটি। দিনকাল খারাপ বাবা। কার কী মনে থাকে। সবদিক বজায় রেখে চলতে হয়। আড়াল থেকে হেল্প করেছিলেন।

বি টি কলেজ মামলায় হেরে গেল বুঝলাম। তারপর?

শোনা কথা। কলেজে আর পড়তে যায়নি। বাবার তদ্বিরে পরমেশ্বরীতে প্রাইমারি সেকশনের টিচার। এখন পরমেশ্বরী বলছে, বি টি না করলে চাকরি থাকবে না। ও সব ঝামেলায় আমরা থাকি না। হৈমন্তী একটু চুপ করে থেকে বলেন, যদি খবরের কাগজে বড় করে না ছাপত, কিছু হত না। এসব খবর কাগজকে জানাতে আছে? প্রেসটিজের লড়াই বেঁধে গেল। মেয়েটার আইনত ভর্তি হতে আর বাধা নেই। কিন্তু হ্যারাস করলে কত ঠেকাবে?

প্রীতীশের আরও জানার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রাতের রান্নার আইটেম ঠিক করে দেওয়ার জন্য ডাক এল। উঠে গেলেন হৈমন্তী।

প্রীতীশ আবার তাকাল। দূরের দৃষ্টিপাতে 'নীলিমায় নীল'-কে দেখতে থাকল। সহসা ক্রোধে সে ক্ষিপ্ত। বিয়ে করেছ, আপত্তি নেই। কিন্তু শাঁখাসিঁদুর কেন? তুমি যা নও, তা হতে চাইছ কেন? হিন্দু নারী সাজলেও তোমার মধ্যে মুসলিম অবচেতনা থেকে যায়নি কি? একটা জীবন মানে একটা সামগ্রিক অবচেতনা এবং তা যৌথ অবচেতনার অংশ। কোনও-ভাবেই কি মুসলিম যৌথ অবচেতনার হাত থেকে তুমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে? না তা অসম্ভব। হিন্দুত্ব মুসলিমত্ব এসব জিনিস জন্মসূত্রে তোমার বা আমার জৈব সত্তারই অন্তর্গত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক নিয়মেরই একটা নিয়ম মানুষের রিলিজিয়ন। আগুনের নিয়ম যেমন দাহন। তুষারের নিয়ম যেমন শৈত্য। ধর্ম একটা প্রাকৃতিক শক্তি। তুমি তা বোঝো না। তাই তুমি অন্যায় করছ 'নীলিমায় নীল'। সে মনে মনে উচ্চারণ করে। তারপর সিগরেট ধরায়।

আর ওই পীরের ঘোড়া!

ঘোড়ার সঙ্গে পীরের সন্তোষের সম্পর্ক কী? কেন মুসলমান পীর ঘোড়া পেলে খুশি হন? প্রীতীশ একটু নড়ে ওঠে। অষ্টাদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ বিজয়ের গল্পে ঐতিহাসিক সত্যের আভাস আছে যেন বা। একদল ঘোড়-সওয়ারের হাতে তরবারি, তাদের পিছনে আরেকদল ঘোড়সওয়ারের হাতে কোরান। খ্রিস্টানদের অনুকরণ করেছিল কি মুসলমানরা? ওই যে বলা হয়, একহাতে তরবারি অন্যহাতে কোরান। এর একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তা হলে পাওয়া যাচ্ছে। পীরের ঘোড়ার পিছনে তা হলে একটা অলিখিত

ইতিহাস থেকে গেছে।

প্রীতীশ ঠিক করে, কাকলিকে এই আড়ালের কথাটা বুঝিয়ে বলবে। তার বাবা আইনজীবী। পেশার খাতিরে তিনি সবকিছু মেনে নিতে পারেন। কাকলির তো সেই দায় নেই। তার গিয়ে চার্জ করা উচিত ছিল, কেন মেয়েটি গোপন করল কাকলির বাবার হেল্পের কথা। চমৎকার অভিনয় করে গেল।...

প্রমথনাথ মোরাম বিছানো রাস্তায় সাইকেল রিকশ থেকে নামলেন। কাকলির হাতে তিনটে খুদে চতুষ্পদ পোড়ামাটির নিষ্প্রাণ প্রাণী। ঘোড়া না শেয়াল বোঝা যায় না। প্রমথনাথের হাতে ঘাটবাজারের কেনা একটা আগর বাতির প্যাকেট। কাকলি নেমেই বলে, রুবিদের বাড়ি না ওটা?

হুঁ। চিনতে পেরেছিস দেখছি।

চিনবো না কেন? কতবার এসেছি। এখানটা তেমনই নিঝুম হয়ে আছে বাবা। কিছু চেঞ্জ হয়নি।

প্রমথনাথ রিকশওয়ালাকে বলেন, একটু অপেক্ষা কর হে!

কাকলি রুবিদের বাড়ির উল্টোদিকে দাদাপীরের দরগায় ঢোকার সময় একটু থমকে দাঁড়ায়। কাঠমল্লিকার গাছটা মরেনি বাবা। জানো? গ্রীষ্মে ফুলগুলো একটু হলুদ হত। আর কি মিষ্টি গন্ধ!

দেরি করিস নে। প্রমথনাথ হন্তদন্ত হেঁটে যান।

চৌহদ্দির পাঁচিল কবে ভেঙে গেছে এবং ঝোপঝাড় গজিয়েছে। পায়েচলা পথটাও ঘাসে ঢাকা পড়েছে। এখানে-ওখানে পাথরের চৌকো টুকরো পড়ে আছে। উঁচু চত্বরের ওপর পীরের পাথরের কবরে ফাটল এবং ফাটলে চিকোন ঘাস। পলেস্তারা খসে পড়া চত্বরে এবং নিচে ছড়ানো পীরের ঘোড়াগুলি ছত্রভঙ্গ পড়ে আছে। ঘাস-লতা-পাতা-গুল্মে ঢাকা পড়েছে কিছু। আরও কিছু স্যাঁতসেঁতে মাটিতে অর্ধপ্রোথিত। প্রমথনাথ দুঃখিত মুখে বলেন, এ কী অবস্থা! চিন্তা করা যায় না। দেরি করিস নে।

কাকলি দুহাতে তিনটে ঘোড়া বুকসমান উঁচু চত্বরে কবরের সামনে রেখে করজোড়ে মাথা নোয়ায়। প্রমথনাথ পকেট থেকে ঘাটবাজারে কেনা দেশলাই বের করে আগরবাতির প্যাকেট ছেঁড়েন। বাতাস ছিল না। আগরবাতি জেলে কুলুঙ্গিতে গুঁজে তিনি প্রণাম করেন। তারপর মেয়েকে ডাকেন। আয়! কী দেখছিস অমন করে?

কাকলি আনমনে বলে, ছাতিমগাছটা এখনও আছে।

থাকবে না তো যাবে কোথায়? হাইকোর্টের ইঞ্জাংশন জারি আছে না? বৃক্ষাদিসহ এই নয় একর স্থাবর প্রপার্টিতে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ—টিল দি কোর্ট

টেকস এ ফাইনাল ডিসিশন ইন দিস কেস। আয়! দেরি হয়ে যাবে।

কাকলি পা বাড়িয়ে একবার পিছু ফিসে ছাতিমগাছটি দেখে নেয়। একটু হেসে বলে, রুবির সঙ্গে একদিন এসে ছাতিমতলার ওখানে দেখি, এক বুড়ি ঝাঁটা দিয়ে শুকনো পাতা জড়ো করছে। আমাদের দিকে যেই তাকিয়েছে, আমরা অমনি ভয় পেয়ে দৌড়ে—উঃ! সে এক কাণ্ড।

কেন?

কীরকম দেখতে—একেবারে রাক্ষুসির মতো! পালিয়ে এসে রুবিদের বাড়ি ঢুকলাম। ছবিদি—রুবির দিদি আরও ভয় পাইয়ে দিয়ে বলল, তা হলে খাঁদুর মাকে দেখেছিস তোরা। খাঁদুর মা কবে মরে গেছে। কিন্তু অভ্যাস যায় না মলে। এখনও পাতা কুড়ুতে আসে।

প্রমথনাথ হেসে ফেলেন। একবার ছেলেবেলায় আমিও শ্মশানতলায় গিয়ে—

আইনজীবী না? হ্যাল্লো আইনজীবী!

প্রমথনাথ দেখেন, মবিন খোন্দকারের বাড়ির দরজার সামকে কে দাঁড়িয়ে আছে। কাকলি দেখে লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড এক মানুষ। পরনে অগোছালো প্যাণ্টশার্ট। একমাথা কাঁচাপাকা ঝাকড়মাকড় চুল। পাকানো বিশাল গোঁফ। প্রমথনাথ বলেন, ফজুমিয়াঁ যে। এসেছ, সে খবর পেয়েছি।

দাদাপীরের দরগায় আইনজীবী! আমিও একটু আভাস পেয়েছি অবশ্যি। হাবলকাজি আজ টাউনে গিয়েছিল জামাইবাবুর কাছে। আইনের জিভ লম্বা হতে শুরু করেছে।

আরে না, না! আমার মেয়ের মানসিক ছিল। প্রমথনাথ আলাপ করিয়ে দেন। কাকলি: এই হল এক ইউনিভার্সাল মামা। সর্বসাধারণ অবশ্যি মামুজি বলে ডাকে। ফজু মিয়াঁ! আমার মেয়েকে তুমি দেখে থাকবে।

কাকলি তখনই প্রণাম করে। তার স্মৃতি সহসা একটু আলোকিত হয়েছিল।

ফয়েজুদ্দিন খান চৌধুরি তাঁর বিশেষ অট্টহাসি হেসে বলেন, পাগলি রে পাগলি! ইউনিভার্সাল মামা হয়ে আমার পায়ে পায়ে খালি এই বিপদ। কদমবুসি আর প্রণাম। হুঁ, তুই রুবির সঙ্গে পরমেশ্বরীতে পড়তিস। তুই বললাম লায়েক মেয়েকে। রাগ করিস না মা! হ্যাবিট।

কাকলি বলে, না মামুজি! রাগ করব কেন? রুবি নেই বাড়িতে?

এইমাত্র ওকে টাউন থেকে নিয়ে এলাম। ওর মাকে নার্সিং হোমে রেখে এলাম ওর ডামি সাজিয়ে। ফয়েজুদ্দিন প্রমথনাথকে বলেন, মেয়ের বিয়ে কোথায় দিয়েছ হে?

কলকাতায়। জামাই আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার। দুর্গাপুরে থাকে! কালীপুজো দেখতে এসেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটু জ্বরভাব। নৈলে

তারই আসার কথা। কাকলি একা আসবে কী করে?

খুব ভাল! তা পীরের দরগায় মানসিকটা আসলে কার হে আইনজীবী?

প্রমথনাথ শুধু হাসেন। কাকলি বলে, মামুজি! রুবি কী মিথ্যুক জানেন? সেদিন ঘাটবাজারে দেখা হল। সিরিয়াসলি বলল কি না কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, তিনটে বাচ্চা। একবার ডাকুন তো ওকে।

তুই ঢুকে যা না! আমি তোর বাবার সঙ্গে একটু কাজিয়া করি ততক্ষণ।

প্রমথনাথ বলেন, দেরি করিস নে। রিকশ দাঁড়িয়ে আছে।

কাকলি এগিয়ে যায়। সদর দরজা ভেজানো ছিল। সে বাড়ি ঢুকেই গলা চড়িয়ে ডাকে, রুবি!

লাল ফ্রক পরা এক কিশোরী বারান্দার সামনে ঠেলে বেরুনো অর্ধবৃত্তাকার খোলা চত্বরে সিমেণ্টের বেঞ্চের ওপর বসে কুলোয় চাল বাছছিল। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর কাকলি ফের ডাকলে সে অদ্ভুত চেরা গলায় বলে ওঠে, ছোটবুবু! তোমাকে ডাকছে।

রেবেকা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়।

কাকলি কিল দেখিয়ে বলে, তোকে মারতে এলাম জানিস?

রেবেকা অর্ধবৃত্তাকার খোলা চত্বরে এসে আস্তে বলে, আয়!

তোর সঙ্গে আড়ি। তুই কি মিথ্যুক রে! দিব্যি কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, তিনটে বাচ্চা। কাকলি চার্জ করে। তারপর একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে, বসব না রে! টুকুনের জন্য পীরের ঘোড়া মানত করেছিলাম। তাই বাবা নিয়ে এসেছেন। রিকশ দাঁড়িয়ে আছে। তো মামুজির সঙ্গে দেখা হল।

রেবেকা নেমে আসে উঠোনে। বলে, ত্রিনয়নীর ওষুধে কাজ হয়েছে রে। বাবার লাং-ক্যান্সার নয়। ব্রঙ্কিয়াল এজমা মতো। এখন ভাল আছে। আর দিন তিনেক পরে ছেড়ে দেবে। দৈব ওষুধটা বাবার গলা থেকে খুলতে দিইনি।

খুলতে দিস না। আমি তোকে এমনি এমনি কালীজ্যাঠার কাছে নিয়ে যাইনি। কাকলি ওর চুল টেনে দেয়। কিন্তু তুই কেন বললি বিয়ে হয়েছে—তিনটে বাচ্চা।

রেবেকা এতক্ষণে শান্ত হাসে। তারপর ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বলে, এবার আমার কালীপুজো দেখা হল না—কঙ্কালের নাচ, বাজি পোড়ানো। তুই দেখলি নিশ্চয়?

দেখলাম। কিন্তু—ভ্যাট। কঙ্কালের নাচ আগের মত জমলই না। কাকলি চাপা গলায় ফের বলে, বিসর্জন আর বাজি পোড়ানো দেখতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারি জানিস? তোর জামাইবাবু খুব চালিয়াতি করে টাউনশিপে একটা বাড়ির ছাদ ম্যানেজ করল। একটা মেয়ে একলা ছিল। শাঁখাসিঁদুরের

ঘটা আর বকুনি শুনে, তারপয় চা-ফা খেয়ে তোর জামাইবাবু মেয়েটার সঙ্গে— উঃ! সে এক কেলেঙ্কারি। জোর করে টেনে ওঠালাম। তারপর বাড়ি ফিরে বাবাকে সেই কথা যেই বলেছি, বাবা বললেন, আর মেয়েটা তো মুসলমান হিন্দুকে বিয়ে করে হিন্দু সেজেছে। কোন কমিউনিস্ট নেতার মেয়ে। ভারতী দাশগুপ্ত সেজে তোর জামাইবাবুকে আচ্ছা দিয়েছে।

কাকলি হাসতে হাসতে বেঁকে যায়। রেবেকা শুধু বলে, শুনেছি।

তোর জামাইবাবু রাগের চোটে একেবারে শয্যাশায়ী। আমি বললাম, কেমন জব্দ? কাঁটালিয়াঘাটের মাটিতে শুধু কঙ্কালের নাচ নেই, আরও কত মজার মজার জিনিস আছে। চলি রে। কালকের দিনটা আছি। একবার যাস না। পরশু মর্নিংয়ের ট্রেনে চলে যাব। আবার কবে দেখা হবে ভগবান জানেন।

রেবেকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। স্মৃতি তাকে আবিষ্ট করেছিল।

কাকলি বেরিয়ে গিয়ে রিকশতে ওঠে। ফয়েজুদ্দিন বলেন, মিথ্যুককে কী শাস্তি দিলি রে মা?

চুল টেনে দিয়েছি, মামুজি! আশ্চর্য লাগল। কোনও রিঅ্যাকশন নেই।

প্রমথনাথ রিকশতে উঠে বলেন, একবার যেও হে ফজু মিয়াঁ। পরশু থেকে তো আর দেখতে পাবে না বাড়িতে। ভোর ছ'টায় বেরুব। সন্ধ্যায় ফিরব। আর হ্যাঁ—। মনিবদা ঠিকই বলেছে। হাঙ্গামায় জড়িয়ে লাভ কী? তুমি হাবল কাজিকে ওই কথাটা বুঝিয়ে বোলো। আমার নাম কোরো না যেন। ভাববে, আমি আলম মির্জাদের ফরে আছি।

বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাকলি বলে, টুকুনের বাবা বলছিল, রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু নেই কেন? সত্যি। প্রসন্নময়ী স্কুলের সামনে রায়বাবুদের কোন পূর্বপুরুষের স্ট্যাচু আছে। আমাদের পরমেশ্বরী স্কুলেও দত্তবাবুদের ঠাকমার স্ট্যাচু আছে। ঘাটবাজারে নেতাজীর স্ট্যাচু বসবে শুনেছিলাম। এখনও বসেনি। রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু বসানো উচিত ছিল।

প্রমথনাথ হাসেন। রবিঠাকুর মানুষের মনে আসন করে আছেন। স্ট্যাচুর কী দরকার?

ভ্যাট। টুকুনের বাবা ঠিকই বলে, মুসলমানদের ইউনিটি আছে। কাঁটালিয়াঘাটে হিন্দুদের ইউনিটি নেই। বাজি পুড়িয়ে অত টাকা খরচ করে। একটা স্ট্যাচু বসাতে কী এমন খরচ?

আসলে কথাটাও মাথায় আসেনি, তাই।

মুসলমানদের মাথায় এল কেন?

এই জিনিসটা তুই ঠিক বুঝবি নে। প্রমথনাথ গম্ভীর হয়ে ওঠেন। সংখ্যা-

লঘুদের একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করে। তারা ভাবে, সব ভাল-ভাল জিনিস ওরা নিয়ে নিচ্ছে আর আমাদের বেলায় অষ্টরম্ভা। এখন—কাঁটালিয়াঘাটে মুসলিম পপুলেসন প্রি-পার্টিশন পিরিয়ডের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় মিয়াঁমুসলমানরাই ছিল এডুকেটেড ক্লাস। পার্টিশনের পর তাদের মধ্যে যারা চাকরি করত, অপশন নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেল। সিকিভাগেরও কম এখানে পড়ে রইল। ক্রমে ক্রমে এদের অবস্থা শোচনীয়। ও দিকে শেখপাড়া-জোলাপাড়ার মুসলমানদের ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দীক্ষা পয়সা-কড়িতে বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা হয়েছে। তারা হাওয়া বুঝে চলে। কংগ্রেস যখন গভর্নমেণ্টে ছিল, তখন কংগ্রেসের দিকে। আবার বামফ্রণ্ট যখন পাওয়ারে এল, তখন বামফ্রণ্টের দিকে চলে এসেছে। কাঁটালিয়াঘাটে মেজরিটি ভোটার হল গিয়ে মুসলমান ভোটার। তোর স্কুল লাইফের কথা মনে পড়তে পারে। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত অনুষ্ঠান একসঙ্গে হত। তাই না ?

হত। তবে রবীন্দ্রজয়ন্তী আলাদা করেও হত। আমি চিত্রাঙ্গদা করেছি।

প্রমথনাথ হেসে ওঠেন। হ্যাঁ। তারপর কী একটা হয়ে গেল বুঝলাম না। নজরুল জয়ন্তী আলাদা করে হতে লাগল। শেষে শুনি নজরুলের স্ট্যাচু বসছে। বসে গেল।

টুকুনের বাবা বলছিল মুসলিমতোষণ।

ভোট পেতে হলে মন জুগিয়ে চলতে হবে বৈকি! কাঁটালিয়াঘাটের মুসলমানদের মধ্যে পুলিশ আর ডিফেন্সে কম ছেলে চাকরি করে না। স্কুল-টিচারের সংখ্যাও কম নয়। ল পাস করে অন্তত জনাপাঁচেক লোয়ার কোর্ট-আপার কোর্টে প্র্যাকটিস করছে। আমার জুনিয়ার মফিজুদ্দিনকে তো চিনিস। কিন্তু এদের মধ্যে মিয়াঁ মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য। প্রমথনাথ জোরে শ্বাস ফেলে বলেন, একটা হযবরল অবস্থা। রায়বাবুদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে মুসলিম টিচার ঢুকিয়েছে। এবার শুধু আরবি-ফার্সি কোর্স আর একজন মৌলবি ঢোকানো বাকি। তুই চিন্তা কর। মিয়াঁ ক্লাসের দাপট সত্ত্বেও ওরা সংস্কৃত পড়ত। মিয়াঁরা আরবি-ফার্সির জন্য মসজিদে মাইনে করা মৌলবি রাখত। মৌলবির দাবি তুললেই বা রায়বাবুরা শুনবেন কেন ? কিন্তু এ-ও, সত্য, সে দাবি ওরা তোলেনি। এখন শেখপাড়া-মোমিনপাড়া মাদ্রাসা করেছে। একই সিলেবাস। শুধু আরবি-ফার্সির জন্য বাড়তি একশো নম্বর। তাই বলে প্রসন্নময়ী বা পরমেশ্বরীতে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কিন্তু প্রোপোরশনেটলি কমেনি। সব চেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস ?

কাকলি কান করে শুনছিল। কেন না প্রীতীশের সঙ্গে মজা করার জন্য অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সে আস্তে বলে, কী ?

মাদ্রাসায় লোয়ারকাস্ট হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরাও পড়ে। মাদ্রাসায় সকালে

মেয়েদের ক্লাস দুপুর থেকে ছেলেদের ক্লাস।

সে কী! কেন হিন্দুরা পড়ে?

প্রসন্নময়ী-পরমেশ্বরীতে যারা পরপর দুবার ফেল করে, তারা যাবে কোথায়? বামুন-কায়েতের ছেলেমেয়েরা অবশ্যি ড্রপআউট হয়েই থাকে। কিন্তু লোয়ারকাস্টরা চান্স ছাড়ে না। তাছাড়া পলিটিক্যাল মুরুব্বিদের ফুসমন্তর আছে। তবে মাদ্রাসায় মুসলিম স্টুডেন্টদের বেশিরভাগই আউট-সাইডার। ।অন্যান্য গ্রাম থেকে আসে। ওদের একটা সিস্টেম আছে। মসজিদে চাঁদা তুলে খুব গরিব ঘরের ছেলেদের থাকা-খাওয়ার জন্য বোর্ডিং করেছে। হ্যাঁ—একজন হিন্দু শিডুল্ড ক্লাস টিচারও আছে।

মাদ্রাসায়?

হ্যাঁ। মাদ্রাসায়। সরকারি নিয়ম হয়েছে। টিচারদের মাইনে তো সরকার দেয়।

তোমার জামাই—বলেই চুপ করে যায় কাকলি। তার মুখ দুষ্টুমির হাসি ছিল।

আরও মজা আছে রে।

বলো, বলো!

পোড়াকায়েতের এক মাসতুতো দাদার মেয়ে লোকাল স্কুলের ফাইনালে ফেল করেছিল। পরের বছর কাঁটালিয়াঘাট মাদ্রাসা থেকে এক্সটার্নাল স্টুডেন্ট হয়ে মাদ্রাসা-বোর্ডের পরীক্ষায় বসেছিল। পাস করে কলেজে ঢুকেছে।

কলেজ নিল?

আইনত নিতে বাধ্য। আমাদের ছেলেবেলায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রাইমারি একজামিনেশনে মক্তবের ছাত্ররাও আমাদের সঙ্গে বসেছিল। আমার প্রাইমারি পাস সার্টিফিকেট আছে। তাতে ব্র্যাকেটে 'মক্তব' লেখা আছে। 'মক্তব' মানে প্রাইমারি। মক্তবে পাস করে যে-কেউ হাইস্কুলের ক্লাস ফাইভে ভর্তি হতে পারত। তখনকার দিনে ফাইভ-সিক্সকে বলা হত আপার প্রাইমারি।

ঘাটবাজারে ঢোকার পর কেউ ডাকে, প্রমথ! প্রমথ!

এখনই আলো জ্বলে উঠেছে ঘাটবাজারে। আজ মাইক্রোফোন বন্ধ। কিন্তু ক্যাসেটের দোকানে তুমুল হিন্দি বাজছিল। প্রমথনাথ রিকশ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেন, রোখ্‌কে! রোখ্‌কে!

আলমমির্জা বলেন, তোমার বাড়ি থেকেই আসছি। শুনলাম বেরিয়েছো। নামো হে! মেয়ে পথ হারাবে না। কী গো! চিনতে পারছ তো?

কাকলির চিনতে একটু দেরি হয়। মির্জাজেঠু! আপনি কিন্তু রোগা হয়ে গেছেন।

কারণটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো মামণি। প্রমথ। নামো হে।

প্রমথনাথ শুকনো হেসে রিকশ থেকে নামেন। মির্জা রিকশওয়ালাকে দেখে বলেন, তুই মণ্টু না?

আজ্ঞে মিঁয়াসাহেব।

মামণিকে বাড়ি পৌঁছে দিবি। দিয়ে ঘাটোয়ারিজির গদিতে আসবি। মামণি। একে ভাড়া দিয়ো না যেন। এর নাম গলাকাটা মণ্টু।

প্রৌঢ় রিকশাওয়ালা হাসে। তার ওপরপাটির একটি দাঁত নেই। মিয়াঁ-সাহেবের ওই এক কথা! বলে সে সাইকেল রিকশর প্যাডেলে পায়ের চাপ দেয়।

প্রমথনাথ পকেটে হাত ভরেছিলেন। আলমমির্জা সেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে। প্রমথনাথ একটু বিব্রত বোধ করছিলেন। মির্জা রাজনীতির লোক। ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। গোঁফদাড়ি প্রত্যহ চাঁচেন। মাথায় অল্প সিঁথিকরা চুল ফুরফুরে সাদা। গঙ্গার ফেরিঘাটে ঘাটোয়ারি রামলগন চৌবেজির গদিতে গিয়ে বলেন, এস প্রমথ। চৌবেজির ঘাড় ভাঙা যাক।

চৌবেজি মির্জাকে বলেন, আদাব মির্জাসাহেব! তারপর প্রমথনাথকে বলেন, রাম রাম বাবুজি! আসুন। আসুন! জলদি চায় লেকে আ!

মির্জা বলেন, অনেকদিন পরে আজ প্রমথকে পেয়েছি। কী বলেন চৌবেজি? এক হাত হয়ে যাক। হেমন্ত। চলে এস। হাঁ করে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছ নাকি? এই দেখ, কে এসেছে।

হেমন্ত প্রসন্নময়ীর শিক্ষক। আরে দাদা যে! বলে এসে যান।

চৌবেজি তাস বের করেছিলেন। প্রমথনাথ বলেন, খেলা ভুলে গেছি হে! কী খেলবে?

মির্জা বলেন, ব্রিজ।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসা যাবে না। জামাই আছে বাড়িতে। কতদিন পরে ওরা এল। কাল আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

তোমার তো খোন্দকারের মতো অবস্থা! পুড়িয়ে খেতে একটাও ছেলে নেই। তোমার মেয়ে কার কপালে ফোঁটা দেবে? মির্জা তাস শফল্ করতে করতে বলেন, দেখতেই পাচ্ছ। আমাদের সন্ধ্যার আড্ডা ঠিক বজায় রেখেছি। পলিটিকসও করি। তাসও খেলি। তুমি শুধু মামলা-মোকদ্দমার নথিতে পোকা হয়ে ঢুকে রইলে। অথচ দেখ, তোমার পাস্টলাইফ কী ছিল?

হেমন্ত বলেন, পাস্ট ইজ পাস্ট।

চৌবেজিও সায় দেন। ওহি তো বাত্ আছে মাস্টারজি।

প্রমথনাথ জানেন, ঠিক কোনসময়ে মির্জা তাঁর কাজের কথাটা পাড়বেন। তিনি তাই মনে মনে তৈরি হয়েই তাস তুলে নেন এবং টু ডায়ামণ্ডস্ হাঁকেন।…

কাকলি প্রীতীশকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। বাবার কাছে সংগৃহীত তথ্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আওড়াচ্ছিল। মুখে দুষ্টুমি ঝলমল করছিল। কিন্তু প্রীতীশ চুপ। সে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং পাঠিয়ে দিচ্ছিল। জানালার বাইরে।

কাকলি ক্লান্ত হয়ে বলে, কী? বোবা হয়ে গেলে তো?

প্রীতীশ একটু হাসে। নাহ্। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তুমি বলে যাও। শুনতে পাচ্ছি।

পাচ্ছ না। কারণ তুমি ভাবছ।

কী ভাবব?

কাকলি একটু পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঠোঁটের কোনায় হাসি রেখে বলে, আমি ভেবেছিলাম, ফিরে এসে তোমাকে দেখতে পাব না।

অচেনা জায়গায় কোথায় যাব?

একটা বাড়ি তো ভীষণ চেনা হয়ে গেছে। কথা বলার মত মানুষও পাওয়া গেছে।

প্রীতীশ চটে যায়। কী বলছ? একটা অকৃতজ্ঞ মেয়ে। তোমার পরিচয় দিলে। তবু চেপে গেল।

ঠিক আছে বাবা! ঠিক আছে। এই রেগে ওঠাটুকুই দেখতে চাইছিলাম।

প্রীতীশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেলে। তুমি এখানে এলেই কেমন গেঁয়ো হয়ে যাও।

বা রে। গাঁয়ের মেয়ে গেঁয়ো হবে না?

কিন্তু কলকাতা বা দুর্গাপুরে তো তুমি ভীষণ স্মার্ট হয়ে ওঠ। ব্যাপারটা কী?

আমি যে দু'রকমের লাইফ জানি। তুমি শুধু একরকম।

ওঃ? হরিবল্!

কী হরিবল্?

তোমাদের এই কাঁটালিয়াঘাট। মায়ের কাছে যা গল্প শুনছিলাম! ভূতপ্রেত যক্ষ-রক্ষ পিশাচ—

আহা! যেখানে আছ, সেই দুর্গাপুর কী ছিল বলো? কাকলি দাপটে বলে যায়। জঙ্গল আর ভূতপ্রেত যক্ষ রক্ষ পিশাচের ডেরা। ভাগ্যিস বিধান রায় ছিলেন!

বিধান রায় ছিলেন তা ঠিক। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসোর্সেস হাতের কাছে না থাকলে দুর্গাপুর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউন হতে পারত কি?

বাহ্। এখন তো বেশ কথা বলতে পারছ!

তুমি তুলনা করছ, তাই। কাঁটালিয়াঘাটের সেই রিসোর্স কোথায়?

কাকলি মুখ টিপে হাসে। আছেই তো!

কী?

যা দেখে আই আই টি থেকে বেরুনো ইঞ্জিনিয়ারের মাথা ঘুরে গেছে। 'নীলিমায় নীল!'

ও কাকলি! প্লিজ লিভ ইট। তুমি কী বলছ নিজেই তা বুঝতে পারছ না। প্রীতীশ আরও চটে যায়। তুমি মাঝে মাঝে এমন আজেবাজে কথাবার্তা বলো, যার কোনও মানেই হয় না।

কাকলি খুব হাসে। তোমাকে রাগিয়ে দিয়ে যা শুনতে চাইছিলাম, পেলাম না ঠিকই। তবে বোঝা গেল, তুমি এমন ল্যাং জীবনে খাওনি। কী পাকা অভিনেত্রী বোঝো!

ললিতা এসে মৃদুস্বরে বলে, মাঠাকরুন জামাইবাবুকে খেতে ডাকছেন। প্রীতীশ বলে, এখন কী খাব? মোটে সাড়ে ছটা বাজে।

কাকলি বলে, এখানকার নিয়ম। জামাইবাবুরা বিকেল ও সন্ধ্যায় অর্ধভোজন তারপর রাত দশটায় পূর্ণভোজন করবেন। হঠাৎ যে নতুন জামাইবাবু হয়ে গেলে তুমি? জানো না? কাল বিকেলে না হয় বিসর্জন দেখতে গিয়ে—

প্লিজ কাকলি! শুধু এক কাপ চা। সত্যি বলছি, আমার শরীর একটু ফিভারিশ!

ললিতা! মাকে গিয়ে বল্ জামাইবাবুর মন খারাপ। না—আমি গিয়ে বলছি।

কাকলি বেরিয়ে যায়। প্রীতীশ রাগ করে আবার একটা সিগারেট ধরায়। কাকলি কী ভেবেছে তাকে? বাবার বাড়ি এসে নিজে যেমন গেঁয়ো হয়ে যায়, তাকেও সেইরকম গেঁয়ো ধরে নেয়। আর কখনও সে এখানে আসবে না। কাকলি একা আসতে চায়, আসবে।···

প্রমথনাথ ফিরে এলেন রাত নটা নাগাদ। হৈমন্তী তাঁকে প্রথমে একচোট নিলেন। কী আক্কেল তোমার বুঝি না। খুকুকে একলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় আড্ডা জমাতে গেলে! দিনকাল কি আগের মত আছে? পরশুকার ঘটনা। সতু মুখুয্যের মেয়ের হাত ধরে টেনেছিল কোনও এক মোদোমাতাল—ছোটলোকদের দাপট। আর তুমি—এদিকে জামাইয়ের শরীর খারাপ! কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। পাঁচু ঠাকুরপো এসেছিল খুকুদের নেমন্তন্ন করতে।

অনেকগুলি কাটাছেঁড়া কথাবার্তার পর হৈমন্তী শান্ত হয়ে আস্তে বলেন, পাঁচুঠাকুপোরকে বলেছি জামাইবাবুর শরীর খারাপ। আমার তো ইচ্ছে নেই খুকু ও বাড়ি ভাইফোঁটা দিতে যাক। হুঁ, এখন এসেছে নেমন্তন্ন করতে। খুকুর বিয়েতে ভাংচি দিয়ে দিয়ে শেষ অব্দি যখন দেখল ইঞ্জিনিয়ার জামাই

পেয়েছে, তখন অন্যমূর্তি। বড়াই করে সবাইকে বংশের গুণকীর্তন করার সুযোগ পেয়েছে কি না।

খুকু কী বলছে?

সব ভুলে গেছে। টাউনে থেকে থেকে স্বভাব বদলেছে না? যাবে বলে দিল তক্ষুণি।

প্রমথনাথ হাসেন। ঠিক আছে। তো ও দিকে এক কাণ্ড। দাতাপীরের থানের মামলায় আলম মির্জা আমাকে ধরেছে। হাবল কাজি আর মবিন খোন্দকারের সঙ্গে সালিশি নিষ্পত্তি করে দিই যেন। এ তো ভালই। তারপর কথায় কথায় মফিদুলের মেয়ের প্রসঙ্গ উঠল। এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আলম মফিদুল একই পার্টির লোক। ও দিকে পরমেশ্বরীর সেক্রেটারি নগেন দত্তও তাই। কিন্তু মফিদুলের মেয়ের ব্যাপারে সব শেয়ালের এক রা। মেয়েটার মাস্টারি বোধ করি থাকবে না।

তুমি আর ও সবে জড়িও না কিন্তু।

মাথা খারাপ? মফিদুল শাহজাদপুরের লোক। আমাকে কাঁটালিয়াঘাটে বাস করতে হবে না? বলে প্রমথনাথ জামাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন, ও খুকু।

পাড়ার কয়েকটি মেয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে এসেছিল। কাকলি জাঁকিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। প্রমথনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে পর্দা তোলে। তুমি এতক্ষণে আসছ?

মির্জার পাল্লায় পড়ে অনেকদিন পরে তাস খেলছিলাম। জামাইবাবুর শরীর কেমন?

ভাল। আসবে তো এস না! আমরা তোমার জামাইবাবুর ব্রেনওয়াশ করছি।

প্রমথনাথ ঘরে ঢুকলে আসর ভেঙে গেল। মেয়েগুলি আইনজীবীকে দেখেই উঠে পড়ে। তিনি বলেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক রে! চলে যাচ্ছিস কেন?

ছকু গোঁসাইয়ের মেয়ে আরতি লিড নিয়ে বলে, রাত হয়েছে জেঠু। বাড়িতে বকবে।

কাকলি তাদের বিদায় দিতে যায়। প্রমথনাথ বলেন, আর জ্বরটর আসেনি তো?

প্রীতীশ বলে, আজ্ঞে না।

প্রমথনাথ একটা চেয়ারে বসে পড়েন। তারপর হাসতে হাসতে বলেন, আসার পথে টাউনশিপে মফিদুলের মেয়ের কাছে গিয়েছিলাম। যেতে হয়েছিল। মফিদুল জেলা পরিষদের মেম্বার। আমাকে সব দিক বাঁচিয়ে

চলতে হয়। তো ভানু—মানে সন্দীপ দাশগুপ্ত ছিল। মফিদুলের মেয়ে বলে কী, আপনার মেয়ে জামাইকে ইচ্ছে করেই একটু ভড়কি দিয়েছি।

ভড়কি মানে?

লোকাল কথা। ধোঁকা দেওয়া বা ঠকানো। প্রমথনাথ খুব হাসেন। মফিদুলের মেয়ে বলে, পরিচয় দিলে আপনার মেয়ে-জামাই তক্ষুণি কেটে পড়ত। একলা সময় কাটছিল না। ওরা এসে পড়ায় খুব আনন্দ পেয়েছিলাম'। শুনে আমি বললাম, পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছি। ও বলল, আপনার মেয়ে-জামাইয়ের রিঅ্যাকশান কী? আমি বললাম, ওরাও আনন্দ পেয়েছে। আমাদের কাঁটালিয়াঘাটে চিরকাল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় আছে। এ-ও এখানকার একটা ট্রাডিশম।

প্রীতীশ একটু ইতস্তত করে বলে, আমার প্রশ্ন হিন্দুকে বিয়ে করেছে, সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু শাঁখাসিঁদুর পরা বা একেবারে হিন্দু বউ সেজে থাকার কী মানে হয়? সেই অধিকার তো অহিন্দুর নেই। তাও বুঝতাম, যদি দীক্ষা টিক্ষা নিয়ে হিন্দু হত—আজকাল কোথাও কোথাও এমনটা হয়েছে, নর্থইণ্ডিয়ায়।

প্রমথনাথ একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, মফিদুলের মেয়ের ওটা সম্ভবত স্বজাতির ওপর কালাপাহাড়ি রাগ থেকে হয়েছে। মফিদুলও বেকায়দায় পড়েছিল। হ্যাঁ—ওর দুই ছেলে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু তাদের কনভার্ট করেছে মুসলমান ধর্মে। মুসলমানরা এটা বিরাট কৃতিত্ব মনে করে।

প্রীতীশ সোজা হয়ে বসে। দ্যাটস মাই পয়েণ্ট বাবামশাই। 'পয়েণ্ট' শব্দটার ওপর সে জোর দেয়। রুষ্ট মুখে বলে, এভাবেই একদিন দেখবেন এরা মুসলিমিস্তান দাবি করবে। আমি নিউজপেপারে পড়েছি এ জেলায় এখন সেভেণ্টিপার্সেণ্ট মুসলিম পপুলেশন।

সে তো নতুন কথা নয়। প্রি-পার্টিশন পিরিয়ডেও মুসলমান মেজরিটি ছিল। এক সপ্তাহের জন্য এই জেলা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলো জানো? আমরা পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ তুলেছিলাম। প্রমথ রগড়ে চোখ নাচিয়ে বলেন, তারপর ওদের ইদের নামাজের দিন রেডিওতে ডিক্লেয়ার করল,—সে এক মজার কাণ্ড। বাবুপাড়া থেকে মিছিল বেরুল। বড়রায়বাবু বন্দুক থেকে চারটে ছররা গুলি ছুড়ল গঙ্গার ধারে। পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ নেমে গেল। মুসলমান পাড়াতেও নেমে গিয়ে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ল। হিন্দু মেজরিটির জেলা খুলনা গেল পাকিস্তানে। আর মুসলিম মেজরিটির জেলা মুর্শিদাবাদ এল হিন্দুস্থানে। রগড়। তবে গ্রামাঞ্চলে এ সব নিয়ে জনসাধারণ মাথা ঘামায়নি। এখনও ঘামায় না। সিক্সটি ফোরের কথা মনে আছে। টেনথ জানুয়ারি কলকাতায় রায়ট বেধেছিল—

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের ব্যাপারে। পাকিস্তানে হিন্দুদের রক্ত মেখে ওরা নাচছিল। একটা বইয়ে পড়েছি।

প্রমথনাথ নিজের খেয়ালে বলেন, টেন্‌থ্‌ জানুয়ারি রাতে ঘাটবাজারে কবিগানের আসর বসেছিল। আব্দুল জব্বার আর হরিমাখন চাটুজ্জে এই দুই কবিয়ালের লড়াই। কবির লড়াইয়ের বিষয় ছিল রাম-রাবণ। জব্বার রাম, হরিমাখন রাবণ। আজকাল অবশ্যি আর এসব লোকে শোনে না। সিনেমা টিভি ভিডিওর রমরমা।

প্রীতীশ শ্বশুরের সঙ্গে তর্কের ভঙ্গিতে বলে, শুনলাম মুসলমান পাড়ায় দুটো বিশাল বিশাল নতুন মসজিদ উঠেছে।

প্রমথনাথ বলেন, টাকা। জমিতে বছরে দু-দুবার হাইইয়েল্ডিং ফসল। ওদিকে রেশম তাঁতের ডেভালপমেন্ট। তার ওপর এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে। কেন? কালীপুজোয় দুরাত্রে দুলাখ টাকার বাজি পুড়ল। আজকাল তেইশখানা কালীপ্রতিমা হয়। ষোলখানা দুর্গাপ্রতিমা। আন-কালচার্ড লোকেদের হাতে পয়সাকড়ি হলে যা হয়। ধর্মের নামে ফুর্তি ওড়ায়।

প্রীতীশ বুঝতে পারে একজন ঘোর পেশাদার এবং বিশেষত আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলছে। সে চুপ করে যায়।···

পরদিন বিকেলে কাকলির পীড়াপীড়িতে প্রীতীশকে শ্মশানতলার দিকে বেড়াতে যেতে হল। চলে যাওয়ার আগে স্মৃতির জায়গাগুলি কাকলি তাকে দেখাতে চায়। রিকশ দাঁড় করিয়ে রেখে কাকলি গঙ্গার বাঁকের মুখে গিয়ে বলে, এ কী! এদিকটায় তো এমন জঙ্গল ছিল না।

প্রীতীশ বুঝতে পেরে বলে, অ্যান্টি-ইরোশন প্রজেক্ট। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কীর্তি। কিন্তু আমার ধারণা, এসব জায়গায় ছিনতাই হয়। কোথাও কোনও লোক দেখতে পাচ্ছি না।

কাকলি হাসে। মজুমদার বাড়ির মেয়ে-জামাইয়ের ছিনতাই হবে না।

কী বলছ? ওরা কাকেও খাতির করে না।

বাবাকে করে। কাকলি চাপা গলায় বলে। বাবার এ ব্যাপারটা তুমি জানো না। যত রাজ্যের খুনে-মস্তান, চোর-ডাকাতের হয়ে মামলা লড়েন। এস! তোমাকে দেখাই, স্কুল পালিয়ে আমরা কোথায় বুনো কুল খেতে আসতাম। গ্রীষ্মে কত বৈঁচি পাকত জানো? কুনাইপাড়ার একটা মেয়ে ছিল। ফুল্লরা। তাকে চারআনা পয়সা দিলে বৈঁচিকাঁটার জঙ্গলে ঢুকে একগাদা বৈঁচি এনে দিত। শাড়ি ছেঁড়ার ভয়ে আমরা ঢুকতাম না।

ভাঙনরোধী জঙ্গলের পাশে বাঁধের ওপর দিয়ে কে সাইকেল চালিয়ে

আসছিল। ওদের পেরিয়ে গিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি খুকু না?

কাকলি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, চিনেছি। তুমি সানুদা! ও গো! আলাপ করিয়ে দিই। মুসলমান পাড়ার সানুদা। সানুদা, বুঝতেই পারছ এই ভদ্রলোক কে?

প্যান্ট-শার্ট পরা ঋজু ছিমছাম চেহারার যুবকটি নমস্কার করে বলে, আমার নাম মীর সানোয়ার আলি।

প্রীতীশ কপালে একটা হাত ঠেকিয়ে বলে, আমি প্রীতীশ রায়।

কাকলি বলে, সানুদা! তুমি কোথায় যেন মাস্টারি করছ গো?

কুতুবপুর হাই স্কুলে। সানু একটু হাসে। এদিকে এভাবে বেড়াতে এসেছ! ঠিক হয়নি। আজকাল আর সে গ্রাম নেই খুকু। চলে এস। ফরেস্টের ভেতর চোলাই মদের ঘাঁটি করেছে। আসুন প্রীতীশবাবু।

প্রীতীশ একটু অবাক হয়েছিল। মীর সানোয়ার আলি নিঃসঙ্কোচে করজোড়ে হিন্দুর মতো নমস্কার করল! কিন্তু সেই মুহূর্তে গেঁয়ো গুণ্ডা মাতালের ভয় তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সানুর পাশে পাশে সে হাঁটে। কেন না তার বদ্ধমূল ধারণা, মুসলমানরা স্বভাবত দুর্ধর্ষ এবং এ মুহূর্তে আক্রান্ত হলে এই যুবকটিই বাঁচাতে পারবে।...

তথাকথিত 'টাউনশিপ' ডানদিকে, গঙ্গা বাঁদিকে। মাঝখানে বাঁধের মত উঁচু একফালি মোরাম ঢাকা রাস্তার দুধারে দূরে দূরে একটা করে শালকাঠের লাইটপোস্ট। ফরেস্ট বাংলোয় আমলা বা রাজনীতিকরা মাঝে মাঝে এসে থেকে যান বলেই এই নাগরিক বন্দোবস্ত। ওরা দক্ষিণ দিকে গঙ্গার সমান্তরালে হেঁটে যাচ্ছিল। এই রাস্তা খেয়াঘাটের সামনে দিয়ে ঘুরে বাজার পেরিয়ে স্টেশনরোডে মিশেছে। কাকলির কথায় রিকশওয়ালাকে বিদায় দিয়েছিল প্রীতীশ।

কাকলিই কথা বলছিল বেশি। প্রীতীশ বিয়ের পর মাত্র একবার দুদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। তখন অত বুঝতে পারেনি তার স্মার্ট ও চঞ্চল তরুণী স্ত্রীর মনে এখনও এক পল্লীবালিকা এক্কাদোক্কা খেলছে। এবার বেশ কয়েকটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য সেটা স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। এত বেশি স্মৃতি নিয়ে ছটফট করা, অতীতের তুচ্ছ নিরর্থক ঘটনার স্থানগুলি দেখেই বিহ্বলতা—'ও গো! শোনো কী মজার কাণ্ড হয়েছিল'—এইসব দেখে ও পুনঃপুনঃ শুনে প্রীতীশ কাকলিকে নতুন করে আবিষ্কার করছিল, যে—কাকলি প্রকৃত কাকলি। অথচ কলকাতা বা দুর্গাপুরে কাকলি কাঁটালিয়াঘাটকে চেতনার তলায় চেপে রাখে। ফ্যাশান পত্রিকা পড়ে। মেয়েদের ক্লাবের ফাংশন নিয়ে মেতে থাকে। প্রীতীশের ছুটিছাটায় পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে

প্ররোচিত করে। টুকুনের জন্মের পর ওর মধ্যে ঈষৎ হাউসওয়াইফ-আদলও এসে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে কালীপুজো দেখার জন্য প্রমথনাথের তাগিদ সহসা ওকে এভাবে স্মৃতির দিকে টেনে আনল এবং ওর সমগ্র সত্তা স্মৃতিময় হয়ে উঠল কেন, প্রীতীশ বুঝতে পারছিল না। কাকলি শাঁখা পরে না। এখানে এসে শাঁখা পরেছে, সে কারণেও ওকে একটু অচেনা লাগছে। প্রীতীশ ভাবছিল, সে নিজে হিন্দুত্বের যে আদর্শ পোষণ করে, তাতে শাঁখার ব্যাপারটা গৌণ এবং একান্তই বাঙালিপনা। তা ছাড়া শাঁখা চেহারার স্মার্টনেসকে মিইয়ে দিয়ে গ্রাম্যতা এনে ফেলে। ঠিক আছে। গ্রামের রীতি, কালীপুজো, মা হৈমন্তীর অ্যাপ্রোচ সবই মেনে নেওয়া গেল! কিন্তু এ কোন কাকলি? 'ও গো শোনো' বলার পরই এক মুসলিম যুবককে সাক্ষী মানা, 'তাই না সানুদা?' এবং মুহুর্মুহু 'সানুদাকে জিজ্ঞেস করো সত্যি কি না'—প্রীতীশের কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। সে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এই অবস্থাটা নাগরিক জীবনে দেখার সুযোগ পায়নি।

বিশেষ করে মুসলিমদের সম্পর্কে তার একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এতদিনে সেটা একটু নড়ে উঠেছিল। সানুকে প্রশ্নে জেরবার করে 'মুসলিম অ্যাটিচুড' জেনে নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। কারণ এই একটা চমৎকার সুযোগ। এভাবে খুব কাছাকাছি এসে কোনও মুসলিমকে তার নিজের জায়গায় পেয়ে যাওয়া সেখানে এক মুসলিমের পক্ষে অকপট হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা। মুসলিম-মেজরিটি জেলার এক মুসলিম মেজরিটি জনপদ।

কিন্তু কাকলি সুযোগ দিচ্ছে না। আচ্ছা সানুদা! রুবিকে তো তুমি পড়াতে। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছিল। তারপর আর পড়ল না কেন? ছবিদি তো বি এ পাস করে করেছিল। আবার জানো? সেদিন ঘাটবাজারে আমাকে সিরিয়াসলি বলল, কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, তিনটে বাচ্চা —কাকলি হেসে অস্থির হয়। কাল বিকেলে বাবা নিয়ে গেলেন দাতাপীরের থানে মানত দিতে। ওর মামার সঙ্গে দেখা হল। তারপর ওদের বাড়িতে ঢুকে চার্জ করলাম। কোনও রিঅ্যাকশান নেই!

সানু আস্তে বলে, জানি না।

কী জানো না? রুবি তোমার কথা বলত আর সার-সার করত। আজ সার পড়াতে এসে এই করল, আজ সার এই করল—হেন তেন। ওর সার বলতে তো তুমিই ছিলে। এ নিয়ে আমরা ওকে খেপাতাম। আজ তোর সার কী করল রে? বলে সে প্রীতীশের দিকে ঘোরে। ও গো! রুবির সঙ্গে তোমার আলাপ করাতে পারলাম না। আসতে বললাম, এল না। এলে দেখতে পেতে, আমাদের লাইফটা কেমন ছিল।

সানু বলে, ওর বাবার অসুখ। নার্সিং হোমে আছেন।

শুনলাম। কিন্তু ও পড়াশুনো ছাড়ল কেন ?

জানি না।

বাজে কথা। তুমি ওর সার। তুমি নিশ্চয় জানো। বলছ না। ঠিক আছে আমি ফিরে গিয়ে লম্বা চিঠি লিখে জেনে নেব। ওগো, এখানে একটু দাঁড়ানো যাক। দেখ! কী অসাধারণ গঙ্গা।

প্রীতীশ সিগারেট অফার করে সানুকে। সানু বলে, থ্যাঙ্কস।

প্রীতীশ সিগারেট ধরিয়ে বলে, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আপনি নমাজ পড়েন না।

সানু হাসে। আমি খুব একটা ধার্মিক নই। তা ছাড়া ধর্মের দিকে মন দেওয়ার সময়ও পাই না।

আপনাদের সমাজে তো শুনি মৌলবিদের কড়া শাসন।

নাহ্। কে ওঁদের মানে ? ওঁরা আমার মতই স্যালারিড পার্সন মাত্র।

কী বলছেন ? শরিয়তি আইন নিয়ে নিউজপেপারে—

তার কথার ওপর সানু বলে, পলিটিকস। আপনি মুসলমানপাড়ায় চলুন। দেখবেন প্রকাশ্য রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করছে। অথচ মদ ইসলামে নিষিদ্ধ। তাছাড়া—বিদ্রোহী কবির স্ট্যাচু দেখেছেন নিশ্চয় ? কোরানে স্ট্যাচুও নিষিদ্ধ। আসলে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টে বিভিন্ন পার্টি কিছু মুসলমানকে সামনে দাঁড় করায়। নিউজপেপারকে দিয়ে তাদের মুসলিম লিডার বানায়। তারাও পাবলিসিটির লোভে নেচে ওঠে। মুসলমানদের এই একটা স্বভাব আছে। একটু তোল্লাই দিলেই নিজেদের একেকজন শাহেনশা ভাবে।

বাট হোয়াট অ্যাবাউট ফান্ডামেণ্টালিজম ?

আমার সামান্য জ্ঞানে যা বুঝি, সবটাই পলিটিক্যাল গেম। ও সব নিয়ে আমাদের মত কমন পিপল মাথা ঘামায় না। সানু প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছে। ফের বলে, আমি রেগুলার ইংলিশ ডেলি পড়ি। নিউজপেপারও পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। তিলকে তাল করে। তালকে তিল। খুকু চেনে, আমাদের এক কমন মামা আছেন। মামুজি। তিনি বলেন, খবরদার, খবরের কাগজ ছুঁবিনে।

প্রীতীশ একটু চুপ করে থাকার পর বলে, কমিউন্যাল রায়ট হয়। কেন হয় বলুন ?

সে-ও পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। মারা পড়ে নিরীহ শ্রমজীবী গরিব মানুষ।

দেখুন, আমি কলকাতার মুসলিমদের লক্ষ্য করেছি। তারা—

সানু দ্রুত বলে, নন-বেঙ্গলি মুসলিমদের কালচার আলাদা। বাংলাদেশ হল কেন ?

না। আমি বলতে চাইছি, ইণ্ডিয়ান মুসলিমরা মেইনস্ট্রিমে কেন আসতে চাইছে না?

মেইনস্ট্রিমের ডেফিনিশন আমি জানি না। মেইনস্ট্রিম বলতে যদি সোসিও ইকনমিক অ্যাণ্ড কালচারাল ব্যাপার হয়, মুসলমানরা তার বাইরে তো নেই। মেইনস্ট্রিম বলতে যদি আপনি হিন্দুধর্ম বোঝাতে চান, তা হলে আলাদা কথা। এই ধরনের জিগির তুললে মুসলমানরা ভয় পেয়ে সেপারেট আইডেন্টিটির দিকে ছুটবে।

না। মানে, ইণ্ডিয়াননেস বলে যে জিনিসটা আছে—

'হোয়াট ইজ ইন্ডিয়াননেস ইন ইণ্ডিয়া'? সানু হাসে। আমার এক বন্ধু সন্দীপ দাশগুপ্তকে অবিকল কোট করলাম। এই টাউনশিপে থাকে সে।

প্রীতীশ রাগ চেপে বলে, ভদ্রলোক মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করেছেন। উনি একথা বলতেই পারেন।

কাকলি রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর বসে গঙ্গার জলে ঢিল ছুড়ছিল। সানু ডাকে, খুকু! এখানে একটা ডিবেট হচ্ছে। তুমি পরমেশ্বরীতে ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছিলে।

কাকলি হাসিমুখে একবার ঘুরে আবার খেলায় মন দেয়। সানু প্রীতীশকে বলে, ওদের কে কাকে বিয়ে করেছে, বিশ্বাস করুন আমি এখনও বুঝতে পারি না। এনিওয়ে! আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকি, তারা কেউ কারও ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাই না। যদি বা ঘামাই সেটা পরস্পরকে কো-অপারেট করার জন্য। আপনি জানেন? কলকাতায় এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা আপনি বাড়িতে কী ভাষায় কথা বলেন? তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ এবং অধ্যাপনা করেন। বুঝুন! বাংলাভাষার স্লোগান তুলে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হল। তবু এ প্রশ্ন ওঠে কেন? অজ্ঞতা! স্রেফ অজ্ঞতা।

কিন্তু আপনাদের তালাকপ্রথা কি যুক্তিসম্মত? বলুন!

না। শরিয়তি কিছু প্রথা আছে। এ যুগে অচল। শুধু অচল নয়, বর্বরোচিত।

প্রীতীশ হেসে ওঠে। কিন্তু এ কথা আপনি বলতে পারবেন কোনও মৌলবি বা সমাজপতির সামনে?

কেন পারব না? বলা তো হচ্ছে!

সে আর ক'জন বলছে? বললেও কি কাজ হচ্ছে?

দেখুন প্রীতীশবাবু! সমাজে আভাঁ গার্দদের সংখ্যা সর্বযুগে সর্বত্র মুষ্টিমেয়।

কিন্তু ফ্যানাটিসিজম ? মুসলিমরা ফ্যানাটিক নয় কি ?

ওটা মানুষের মজ্জাগত। ধর্ম বলুন, রাজনীতি বলুন, যে-কোনও আইডিওলজিরই ফ্যানাটিক না হলে চলে না।

হিন্দু আইডিওলজিতে ফ্যানাটিসিজম নেই। তাই দেখুন, ভারত সেকিউলার রাষ্ট্র হতে পেরেছে।

প্রীতীশবাবু ! এটাই তো ভারতের গর্বের বস্তু। এটাই ভারতীয়তা। ভানু—মানে সন্দীপকে আমি ঠিক এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভানু বলে, হিন্দুধর্মেও ফ্যানাটিসিজম আছে। একটু অন্যভাবে আছে। বুঝি না !

পাকিস্তান ক্রিকেটে জিতলে ভারতীয় মুসলিমরা আনন্দ করে।

আমি জানি না। কারণ খেলাধুলো সম্পর্কে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তবে ওটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই মুসলিমদের পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত।

আপনি বলছেন ? প্রীতীশ নড়ে ওঠে। বলতে পারছেন ?

সানু জোর দিয়ে বলে, অবশ্যই বলব। আরও বলব, সরকারই বা তাদের দেশদ্রোহের অভিযোগে শাস্তি দেন না কেন ?

অপরচুনিস্টরা সরকারে আছে। কারণ পাওয়ার ইজ মানি।

একজ্যাক্টলি ! ঠিক এই কথাটিই আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছিলাম।

প্রীতীশ সিগারেটের ফিল্টারটিপ গঙ্গার জল লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেলে। তারপর বলে, পাকিস্তান ইসলামিক স্টেট। বাংলাদেশও তাই। এখন কথা হচ্ছে, ভারতে হিন্দু মেজরিটি। ভারত হিন্দুস্টেট হতে চাইলে আপনি কোনও যুক্তিতে তা নস্যাৎ করবেন বলুন ?

যুক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তিটি মনে করিয়ে দিই। 'তুমি অধম। তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন' ? প্রীতীশবাবু ! রহিম চুরি করছে এই যুক্তিতে রামকেও কি চুরি করতে বলবেন ?

এটা চুরির প্রশ্ন নয়। এই দুটো দেশ ইসলাম নিয়ে গর্ব করছে। ভারত হিন্দুত্ব নিয়ে গর্ব করতে চাইলে সেটা দোষের হবে কেন, বলুন ?

গর্ব করার জন্য রাষ্ট্রের অনেক কিছু আছে। ধর্ম নিয়ে যে রাষ্ট্র গর্ব করে, সেই রাষ্ট্রকে তা হলে আপনি সমর্থন করেন ?

করি। মানে, এই উপমহাদেশের পারস্পেকটিভে।

জাস্ট এ মিনিট। তাহলে আপনার এই যুক্তি অনুসারে আপনি পাকিস্তান আর বাংলাদেশকে সমর্থন করেন বলে ধরে নিতে হবে। এখন পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে নন-মুসলিমদের ওপর ইসলামিক স্টেট হওয়ার দরুন নির্যাতন আর

পীড়ন চললে তা আপনার যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই না প্রীতীশবাবু ?

হিন্দু রাষ্ট্র কখনই অহিন্দুদের ওপর নির্যাতন করবে না। সহনশীলতাই হিন্দুধর্মের প্রধান গুণ।

এটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত মত প্রীতীশবাবু। হিন্দুরাষ্ট্রে হিন্দু সরকারে যাঁরা থাকবেন, তাঁরা কী করবেন বা না করবেন, তার গ্যারাণ্টি কি আপনি দিতে পারেন ?

কেন পারব না ? হিন্দুধর্মের আইডিওলজি ? আর তার ইতিহাস, ঐতিহ্য—

ওয়েট ! ওয়েট ! ভারতী—মানে জাহানারা সে রাতে মামুজিকে বলছিল ইসলাম আর মুসলিম যেমন একজিনিস নয়, তেমনই কমিউনিজম আর কমিউনিস্ট একজিনিস নয়। আমি বলছি, হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুও একজিনিস নয়। কেন নয়, তার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আপানাকে দিতে পারি !

কাকলি উঠে এল এতক্ষণে। এম্মা ! তোমরা তর্কাতর্কি করছিলে যেন ?

সানু হাসতে হাসতে বলে, করছিলাম। আমাদের গ্রামের জামাই। গ্রামাঞ্চলে কী হিন্দু কী মুসলিম, এই আচারটা এখনও চালু জানো তো ? জামাইদের একটু রগড়ে দেওয়া। তোমার বরকে একটু—ও মশাই ! রাগ করলেন না তো ?

কাকলি বলে, বাহ্ ! আই আই টি থেকে বেরুনো ইঞ্জিনিয়ারকে কাঁটালিয়া ঘাট যত রগড়ে দেয়, তত ভাল ! দেশটা কোন ধাতুতে গড়া, চিনে যাক।

মাই গুডনেস ! আপনি আই আই টি ইঞ্জিনিয়ার ? সানু জিভ কাটে। সরি ! আমি নগণ্য স্কুল টিচার। ক্ষমা করবেন।

প্রীতীশ হাসবার চেষ্টা করে বলে, নেভার মাইণ্ড। এ কিছু না।

চলো খুকু ! ফেরা যাক। ঘাটবাজারে একটা রিকশা করে নেবো।

কাকলি বলে, তুমি কোথায় বিয়ে করেছ সানুদা ? বাবা বলছিল, বিয়ে না করলে নাকি চাকরি পেতে না। সত্যি ?

সানু সহসা দমে যায়। তা হলে সবাই জেনে গেছে, কুতুবপুর স্কুলে তিরিশ হাজার টাকা ডোনেশনের বিনিময়ে শিক্ষকতা জোটাতেই তাকে বিয়ে করতে হয়েছে। সে আস্তে বলে, কুতুবপুরে বিয়ে করেছি অবশ্যি। করতে হয়েছিল ! হাত পুড়িয়ে রান্না করা, টিউশনি, আবার নিজের পড়াশুনো।

প্রীতিশ বলে, কেন ? আপনার বাড়িতে আর কেউ নেই ?

না। কলেজে পড়ার সময় মা মারা যান। তারপর বাবা। একা স্ট্রাগল করে—যাকগে ওসব কথা। আপনার সঙ্গে আলোচনা করে খুব ভাল লাগল। খুকু ! তোমরা থাকছ তো ?

কাকলি বলে, না গো! কালই মর্নিংয়ে চলে যাবে।

তোমাদের মিনিদি এসেছিলেন জানো?

শুনলাম। এত দেখতে ইচ্ছে করে। এই ভদ্রলোককে বলো সানুদা! মিনিদি এই গঙ্গায় সুইমিং রেসে ডিস্ট্রিক্ট্ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন না?

মিনি বেগম কলকাতায় থাকেন। ওঁর স্বামী বড় বিজনেসম্যান। একেবারে সায়েব। সারা বছর নানা দেশে ঘোরেন। কলকাতা থেকে নিজে ড্রাইভ করে আসেন।

এই সায়েবকে এত বলি দুর্গাপুর থেকে নিজে ড্রাইভ করে এসো। নিজের গাড়ি আছে। অফিসের গাড়ি আছে। কিন্তু কিছুতেই রিস্ক নিতে চায় না। এত ভিতু। শুধু মুখেই বিগ-বিগ টক!

কাটোয়া থেকে রাস্তাটা এ সময় খুব খারাপ থাকে। শীতকালে অবশ্য আসা যায়। সানু কথাটা বলেই দ্রুত নমস্কার করে প্রীতীশকে। চলি! খুকু! চলি। ভাল থেকো।

প্রীতীশও এবার নমস্কার করছিল। কিন্তু তার আশ্চর্য লাগল, সাইকেল থেকে দুটো হাত তুলে নমস্কার করল মীর সানোয়ার আলি। কিন্তু সাইকেলটা পড়ে গেল না। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, এই যুবক শিক্ষকের সাইকেল কি তার জৈব সত্তারই অন্তর্গত? সাইকেলটার পড়ে যাওয়া উচিত ছিল।

রিকশতে চেপে কাকলি বলে, তুমি কী মিস করলে জানো না!

কী?

সেই একতলা বাড়ির ছাদটা তোমার ডানদিকে তিনটে বাড়ির পরেই ছিল।

ধুশ্!

এবং সেই 'নীলিমায় নীল'!

ধুশ্!

ধুশ্ নয়, ধস্! ধ দন্ত স। গঙ্গায় আগে ধস্ ছাড়ত। এখন পাড় বেঁধে দিয়েছে পাথর দিয়ে। তুমি ডাইনে তাকালেই ধুশ্ ধস্ হয়ে যেত। আমি আড়চোখে লক্ষ্য রেখেছিলাম।

তুমি না—প্রীতীশ হেসে ফেলে।

একটু পরে সে গম্ভীর হয়ে যায়। মুখোমুখি তর্কের সময় অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ পয়েন্ট মাথায় আসে না। এতক্ষণে আসছে। ইসলামিক ফান্ডামেন্টা-লিজমকে নিছক 'পলিটিক্যাল গেম' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? মীর সানোয়ার আলি বলল যে, কমন পিপল এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাজে কথা। সারা বিশ্বে মুসলিম মেজরিটি দেশে কড়া পর্দা, বোরখা, শরিয়ত, কোরান-নামাজ-আচার অনুষ্ঠান কমন মুসলিমদের মধ্যেই প্রচন্ডভাবে ফিরে

আসছে। প্যান-ইসলামিজম ডালপালা ছড়িয়েছে। ভি এস নইপলের 'অ্যামং দি বিলিভারস' বইটা এই গ্রাম্য স্কুলটিচারকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কাঁটালিয়াঘাটে মুসলিমদের মধ্যে ফান্ডামেন্টালিজমের ভাইরাস ছড়িয়েছে কি না, তা লক্ষ্য করার চোখ থাকা চাই। স্কুলটিচারটির সেই চোখ আছে কি? সাউথ এশিয়ায় মুসলিমরা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান মেনে এসেছে যুগ যুগ ধরে। রামায়ণ মহাভারত ছিল ওদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নইপল নিজের চোখে দেখে এসেছেন, এখন সেখানে ইসলামিক কমিউন গড়ে উঠেছে। হিন্দু মন্দির স্থাপত্য-ভাস্কর্য ভেঙে ফেলছে ইসলামি গেরিলারা। ভারতে এর রিঅ্যাকশান ঘটতে বাধ্য। এতকাল হিন্দুরা সহ্য করেছে। আর সহ্য করবে কেন?

কাকলি বলে, কী? চুপ করে গেলে যে?

এত বেশি হাঁটার অভ্যাস নেই। ভীষণ টায়ার্ড।

মাঝে মাঝে হাঁটাচলা ভাল। কাকলি মুখ টিপে হাসে। নিউজপেপার হয়ে পড়লে রিয়্যাল লাইফের স্বাদ পাওয়া যায় না। স্বীকার করছি, তুমি না হয় ওই মেয়েটির কথা ভাবছিলে না, সানুদার সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিলে। কিন্তু তোমার খুব কাছেই একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। তুমি নদীটাও মিস করলে। আজে বাজে নদী নয়। এ নদীর নাম গঙ্গা। তুমি যে এত হিন্দুত্ব নিয়ে বকবক কর, তোমার একটুও ইচ্ছে হল না হিন্দুর পবিত্র নদী গঙ্গার জল একবার ছুঁয়ে দেখি? তুমি কী গো?

তুমি ছুঁয়েছ তো?

ছোঁব না? আমি গঙ্গার কোলে বড় হয়েছি।

ব্যস! ব্যস! তাহলে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

এবার কাকলি প্রীতীশের মতই বলে ওঠে, তুমি না—এবং সে জোরে হেসে ওঠে।

রিকশাওয়ালা দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয়। চড়াই রাস্তায় সাইকেল রিকশ চালাতে তার পিঠ কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল। অগত্যা সে পথে নামে। হ্যান্ডেল ধরে টেনে নিয়ে চলে।

কাকলি বলে, ফিরে গিয়ে তো সব ভুলে যাব। জানো? এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। দুরকম লাইফ যার তার যত আনন্দ তত কষ্ট। তোমার একরকম লাইফ। তুমি এটা বুঝবে না।

কষ্ট লাগলে তুমি তখনই এখানে চলে আসতে পারো। আমি কি বাধা দেব ভাবছ?

ভ্যাট! আমি কী বলতে চাইছি, আর তুমি কী বুঝছ!

আমারও দুরকম লাইফ নয় কি? কলকাতা আর দুর্গাপুর কি এক?

আমি কিছু তফাত বুঝতে পারি না। তবে সত্যি বলছি, কলকাতায় আমার দম আটকে যেত। দুর্গাপুরে গিয়ে ভাল লেগেছিল। এখনও ভাল লাগে।

আমার ভাল লাগে না। মাঝেমাঝে ভাবি, চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যাই।

কী বলছ তুমি? কলকাতা মুমূর্ষু নগরী!

প্রীতীশ হাসে। তুমি রাজীব গান্ধীকে কোট করছ। আবার আমাকে তুমি নিউজপেপার বলো!

প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। আমি ওঁর ফ্যান জানো তো?

আশ্চর্য! মেয়েরা দেখছি সবাই ওঁর ফ্যান!

কী স্মার্ট কথাবার্তা বলেন, বলো?

তোমরা মেয়েরা ওঁর রূপমুগ্ধ আসলে।

তুমি না—কাকলি দ্বিতীয়বার প্রীতীশের নকল করে।...

৯

সানু ঘাটবাজারে অজন্তা বুক সেন্টারে ইংরেজি খবরের কাগজ নিতে গিয়েছিল। শচীনবাবু কাগজের স্থানীয় এজেন্ট। কলকাতা থেকে এখানে কাগজ আসতে বিকেল হয়ে যায়। শচীনবাবু কাগজটা কাউন্টার টেবিলের তলা থেকে বের করে বলেন, ভানু তোমার নাম করে চাইতে এসেছিল। বললাম, সানু অলরেডি নিয়ে গেছে। নিজে একটা কাগজ রাখতে পারে না। অত টাকা মাইনে পায়।

সানু বলে, আসলে বাড়ি করতে ভানু ফতুর হয়ে গেছে। দেনা-টেনা করে—

যাঃ! ওর বউও তো চাকরি করে পরমেশ্বরীতে।

ভারতীর মাইনে আটকে দিয়েছে না? বি টি না করলে ওর চাকরি থাকবে না।

এরকম নিয়ম আছে নাকি?

আছে। না থাকলেও করে দিলে আটকাচ্ছে কে শচীনদা?

ভানুর শ্বশুর তো কমরেড! লিডার! শচীনবাবু খ্যা খ্যা করে হাসেন। হিন্দু জামাইকে না হয় অ্যাভয়েড করতে পারে। আফটার অল মেয়েটা তো নিজের ঔরসজাত। নগেন দত্তকে ধরে মাস্টারি জুটিয়ে দিয়েছিল। এখন মাইনে আটকে দিয়েছে বলছ। কমরেড মফিদুল ইসলাম করছেটা কী?

সানু আস্তে বলে, আমি ঠিক জানি না। আচ্ছা, চলি শচীনদা।

ও সানু! মবিন খোন্দকার নাকি টাউনে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন? অসুখটা কী?

ব্রঙ্কিয়াল এজমা শুনেছি।

তুমি যাওনি দেখতে? তোমার কীরকম যেন আত্মীয় হন—তুমিই বলেছিলে।

দূর সম্পর্কের জ্যাঠা। বলে সানু সাইকেলে চাপে। সন্ধ্যার ভিড়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়।

বিদ্রোহীকবির প্রতিমূর্তির কাছে পেঁৗছে কাকলির কথাটা তার মনে পড়ে যায়। রেবেকা—রুবি তাকে এখনও সার বলে। স্কুল লাইফে রুবি কাকলিদের কাছে তার 'সার'-এর গল্প করত, সানুর জানা ছিল না। এক সপ্তাহ আগে সে বিকেল বেলায় সে প্রায় দুবছর পরে কী এক খেয়ালে রুবিদের বাড়ির সামনে থেমেছিল। ভুলে গিয়েছিল খোন্দকার হঠাৎ একদা তাঁর ছোট মেয়ের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অপমানের চেয়ে টাকাকড়ির ব্যাপারটা তাকে আঘাত দিয়েছিল বেশি। ওই সময়টা ছিল তার জীবনের এক চরম দুঃসময়।

খোন্দকার তার দূরসম্পর্কের চাচাজি। সাইকেল থামিয়ে তাঁকে 'চাচাজি' বলে ডাকতেই পুরনো দিনের মত স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল। তারপর রেবেকা এসে বলেছিল, 'ভাল আছেন সার?' তখনই সানুর মনে কী একটা ঘটে যায়। একটা হারানো সুর বেজে উঠেছিল। না—এটা প্রেম-ভালবাসা নয়। অন্য কী এক সম্পর্ক, যার ব্যাখ্যা করা যায় না। রেবেকার মা রোকেয়া বেগম ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রেবেকা কেন টুয়েলভথ ক্লাসে হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনার সময় খোন্দকার বলেছিলেন, 'আমারই রং ডিসিশন'। সানুকে টিউশনি থেকে ছাড়ানো তাঁর ভুল হয়েছিল বলে স্বীকার করেছিলেন। তারপর সহসা রেবেকা এসে আগের মতই বলল, 'আচ্ছা সার, আমাকে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে দেবেন?' ঠিক অমনি করে সে গন্ধরাজ হাসনুহেনা বুগেনভিলিয়া মালতীলতা এইসব চাইত। জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলের ধারে সার বেঁধে সানুর এনে দেওয়া চারাগুলিন এখন ঝাঁপালো পুষ্পবতী হয়েছে। সন্ধ্যায় হাসনুহেনার সৌরভের মধ্যেও একটা স্বর্ণচাঁপার প্রার্থনা সানুকে বিচলিত করেছিল। কিন্তু পুরো একটা দিন খুঁজে হন্যে হয়ে টাউন থেকে একটা স্বর্ণচাঁপা যদি বা আনল, রেবেকার কাছে তা পেঁৗছুল না। সানুর বউ রোজিনা চারাটা কবরে দেওয়ার মতো পুঁতে দিল বাথরুম আর রান্নাঘরের মাঝখানে। নার্শারির গুলাইবাবু বলেছিলেন, 'মশাই! চাঁপার খুব মিসটিরিয়াস ক্যারেক্টার।' রোজিনা,

বড়লোকের মেয়ে, কদর্য চিৎকার করে বলেছিল, 'তার চাইতে মিসটিরিয়াস ক্যারেক্টার মীর সানোয়ার আলির।' আর স্বর্ণচাঁপার চারাটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না সানুর।

সহসা তার সাইকেলের গতি মন্থর হয়ে উঠলে সানু চমকে ওঠে। এইখানে রেবেকাদের বাড়ি। এইখানে এসে তার অজ্ঞাতসারে তার সাইকেলের চাকা কেন যে থেমে যেতে চায়!

রাঢ়ের খান্দানি মিয়াঁবাড়ির আবশ্যিক অংশ 'দেউড়ি'-র মাথা থেকে একটা বালব আলো ফেলেছে লাল মোরাম বিছানো রাস্তায়। আলো থেকে দ্রুত অন্ধকারে গিয়ে ঢোকে সে। মীরপাড়ার বাঁকে সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তায় উঠে নিজের বাড়ির সামনে পেঁছায়। তারপর দরজার কড়া নাড়ে। আর এইসময় তার আবার কাকলির কথাটা মনে পড়ে যায়। রেবেকার পড়াশুনো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিজেকে দায়ী ভাবতে ভাবতে সে মনে মনে বলে, আমি এত অসহায়!

মায়মুনাবুড়ি দরজা খুলে আস্তে বলে, নাতনি আবার খেপেছে কেন দেখ গে দুলামিয়াঁ!

সানু উঠোনে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে টালি চাপানো মাটির ঘরের বারান্দায় ওঠে। টিভি বন্ধ। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। রেজিনা বিছানায় শুয়ে আছে। সে ডাকে রিজু!

সাড়া না পেয়ে পাশে বসে মাথায় হাত রেখে বলে, শরীর খারাপ নাকি?

তার হাতটা জোরে সরিয়ে দেয় রেজিনা। ছুঁয়ো না আমাকে!

কী ব্যাপার?

আমি কাল কুতুবপুর যাব।

বেশ তো! যাবে। কাল থেকে স্কুল খুলছে। আমাকে তো যেতেই হবে। সাইকেলে যাব না। বাসে গিয়ে তোমাকে পেঁছে দিয়ে স্কুল করব।

রেজিনা চোখ খুলে ভংচি কাটার ভঙ্গিতে বলে, মায়মুনানানিকে নিয়ে যাব ভেবো না। একা বাড়িতে থাকবে, আর—ইশ্! সে চান্স পাচ্ছ না কিন্তু।

কিসের চান্স?

খোন্দকারের ব্যাডকারেক্টার মেয়েটা এসে 'সার' বলে বাড়ি ঢুকবে। আর তুমি একা বাড়িতে প্রেম করবে!

রিজু! সানু উঠে দাঁড়ায়। সত্যি বলছি, এবার আমাকে বাধ্য হয়ে—

রেজিনা উঠে বসে তার কথার ওপর বলে, তালাক দেবে তো? দাও! তা-ই দাও। কদিন পরে দিতে। আজ এখনই দাও।

সানু জীবনে যা করেনি, এ মুহূর্তে তা-ই করে। মাথা ঠিক রাখতে পারে না। রেজিনার গালে চড় মারে। পরবর্তী মুহূর্তে তার হাত পাষাণ পাথর

হয়ে ঝুলে থাকে।

আর রেজিনা বিকট পুরুষালি গলায় কেঁদে ওঠে। তুমি আমাকে চড় মারলে? ছোটলোক! ইতর! হাশিম মীরের মেয়ের গায়ে হাত ওঠালে তুমি? আমার বাপের দয়ায় তুমি বেঁচে আছ। আমার বাপের দশ হাজার ইট বুকে নিয়ে দালান তুলবে বলে খোয়াব দেখছ। আর আমারই গায়ে হাত! ওই হাতে পোকা পড়বে। খসে যাবে।

মায়মুনা নড়বড় করতে করতে ছুটে আসে। অ নাতনি! চুপ চুপ! লোকে শুনছে। আ ছি ছি! বড়ঘরের বেটি। ভালমানুষের মেয়ে। শিক্ষিত মুখে অশিক্ষিত কথা।

সানু আস্তে বলে, মাফ করো। তারপর বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে।

রেজিনা বিছানায় মুখ গুঁজে প্রচণ্ড কাঁদতে থাকে। মায়মুনা তাকে সামলাতে চেষ্টা করে। রেজিনা কান্নার মধ্যে বলে, আমার হাতে ডকুমেন্ট। খোন্দকারের মেয়ের চিঠি। এই ডকুমেণ্ট যাবে আব্বার হাতে। তালাক দিলে বুঝি আর বিয়ে হবে না আমার? ভেবেছে কী? আমি জানতাম। আমাকে তো বিয়ে করেনি, করেছে একটা চাকরিকে। এবার কী করে চাকরি থাকে, তাই দেখব। নানি! আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও। এ পাপের বাড়িতে আমি থাকব না।

মায়মুনা হাসতে হাসতে বলে, পাগলামি করে না। এখন যাবে কিসে গো? এরুপ্লেনে? দামাঁদ মিয়াঁ না হয় রাগের বশে একটুখানি চড়-চাপ্পড় মেরেছে। পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে অমন একটু আধটু—হুঁ! আয়মাদারদের ঘরেও বুঝি এমন হয় না? সে কুতুবপুরের আঞ্চলিক ভাষায় চলে যায়। কেন না তার ধারণা এইভাবে হাশিমমীরের আদরিনী কনিষ্ঠা কন্যার মন ছোঁয়া যাবে। সে বলে, আ রি নাতনি! তোর দাদোজি তোর দাদিজিকে তাড়ি খেঞে এস্যে কী কত্তো তবে শুন। তোর দাদিজি জায়নামাজে নামাজ পোহেড়ছে সোনজেবেলাঞে—আর তাড়ির নিশায় মাতাল তোর দাদোজি এস্যে হঠাৎ করেঞে ধাক্কা মেরেঞে বুললে কী, অ্যাই খুদাউলি! খুদা তোকে খিলাঞে (খাওয়ায়), না আমি খিলাইাঁ? কী মানুষ রি নাতনি! মরার সুময়েও কলমা পড়ানো যেল না! মৌলবি রাগ করেঞে উঠেঞে গেল। লিজের চক্ষে দেখা রি! কুরানের কিরয়্যা। চোখছরতের কিরয়্যা।

মায়মুনা এবার সানুর উদ্দেশে বলে, তা দুলামিয়াঁ! তোমার বাপু খামোকা মেজাজ খারাপ হল কেন বলোদিকিনি? তুমি তো কখনো কারও সঙ্গে চড়া গলায় পর্যন্ত কথা বলো না। শুনেছি, ছাত্তরদের গায়ে হাত তোলোনা বলে কুতুবপুরওলারা রাগ করে। হঠাৎ করে তুমিই বা খেপলে কেন শুনি?

রেজিনা ভাঙাগলায় চেঁচিয়ে ওঠে। খেপবে না? পীরিতের চাঁপাফুল কার উঠোন থেকে কার উঠোনে এসে বসে গেল। সেই থেকে সারের মাথায় আগুন!

সানু বলে, আঃ! কী হচ্ছে? মাফ তো চেয়ে নিলাম। বলো, পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে?

নির্লজ্জ তুমি। তা-ও পারো বৈকি! অভিনয় করে করে তো এতদিন কাটাচ্ছ।

আমি বুঝি না! আজ কেন তুমি অকারণে—

চুপ! আজ আবার টাউনে চাঁপা আনতে গিয়েছিলে তুমি! আমি জানি না?

না। আমি গিয়েছিলাম চণ্ডীতলা। এখানে রাজমিস্ত্রি গরজ দেখাচ্ছে। তাই চণ্ডীতলার রজ্জাকের কাছে গিয়েছিলাম। ওর বাড়িতে বেলডাঙার রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে। ফিরতে বেলা হয়ে গেল! পথে প্রমথবাবু উকিলের মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা। কথাবার্তা বলতে একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি যা ভেবেছ, তা ভুল! তা ছাড়া তুমি তালাক শব্দটা উচ্চারণ করলে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে।

ইশ! সার কবে 'মুচুলমান' হয়েছে জানতাম না!

'মুচুলমান' বলায় সানু এখন বুঝতে পারছিল, রেজিনা চড়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছে। সানু হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে। মায়মুনা বেরিয়ে যায়। আই গো! ডাল পুড়ে গন্ধ উঠেছে! বলে সে রান্নাঘরের দিকে থপথপ করে ছোটে।

সানু রেজিনার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালের দিকে আনতে গেলে রেজিনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। কখনো আমাকে ছোঁবে না! আদর দেখাতে আসছে। অভিনয় আর অভিনয়! মিথ্যার পর মিথ্যা। রাজমিস্ত্রি? চাঁপার টব এনে বলেছিলে, নিবারণদার বউয়ের টব।

সে আঁচলে চোখ মুছে টিভি চালিয়ে দেয়। সানু আলনা থেকে লুঙি টেনে নিয়ে প্যান্ট-শার্ট ছাড়ে। তারপর বলে পরশু হেড রাজমিস্ত্রি আসবে। সত্যি বলছি।

রেজিনা শক্তমুখে বলে, কাল আমি কুতুবপুর যাচ্ছি। তোমার সত্যির সতীত্ব জানা গেছে!

সানু হাসে। 'ডকুমেন্ট'-সহ যাচ্ছ তো? ওই নির্দোষ চিঠিটা দেখলে শ্বশুরসাহেব হাসবেন কিন্তু।

রেজিনা কথাটা গ্রাহ্য করে না। একই ভাবে বলে, কাল আমি যাচ্ছি। এক উইক থাকতে পারি। দু উইক থাকতে পারি। কিচ্ছু ঠিক নেই।

এক মাসও থাকতে পারি তাই না ?

হুঁ। তুমি তো সেটাই চাইছ। আবার চাঁপাফুলের টব এনেছ। ট্রেনিং দেবার সময় তো চাই।

সানু দ্রুত বেরিয়ে আসে। বাথরুমের দিকে যায়। বাথরুমে ঢোকার সময় ঘুরে একবার স্বর্ণচাঁপার চারাটা দেখে নেয়। কম আলোয় বোঝা যায় না চারাটার কী অবস্থা। কিন্তু তার বিশ্বাস, ওটা মরে যাবে। কেন না এই স্বর্ণচাঁপা যে মাটি চেয়েছিল, তা পায়নি। নার্শারির ভদ্রলোক বলেছিলেন মশাই চাঁপা খুব মিসটিরিয়াস ক্যারেক্টার। যায়-তার হাতে জিয়োয় না। যদি বা জিয়োয়, ফুল ফোটায় না।

না। স্বর্ণচাঁপাটা বাঁচবে না। তার বাঁচা উচিত নয়।

সকাল নটা পাঁচের ট্রেনে যাওয়ার জন্য রেজিনা তৈরি হয়েছিল। ট্রেনে গেলে তার বাবার বাড়ির দূরত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু বাসে বড্ড ভিড় হয়। সানু অনেক রাত অব্দি তাকে বুঝিয়ে বাগ মানাতে পারেনি। বড়লোকের মেয়ের জেদ। এই মাটির ছোট্ট বাড়িতে মেয়ে থাকতে পারবে না বলেই হাশিম মীর একতলা বাড়ি করে দিতে চেয়েছেন। দশহাজার ইট কবে এসে গেছে। আরও দশ হাজার ইট যে কোনও দিন এসে যাবে। বালি-সিমেন্ট আসতেও দেরি হবে না। কাল হেড রাজমিস্ত্রি এসে মাপজোক করে যাবে। এমন সময়ে রেজিনার বাড়ি ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু সে যাবেই।

সানু সাইকেলে চেপে সাইকেল রিকশ ডাকতে বেরুচ্ছিল। বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির ওখানে একদঙ্গল রিকশ দাঁড়িয়ে থাকে। কেন না ওটা স্থানীয় টার্মে 'তেমাথা'—স্টেশন রোড, কুতুবপুর-কাঁটালিয়া ঘাট রোড এই দুটি পিচরাস্তা এবং সাবেক গ্রামে ঢোকার মোরাম রাস্তার সঙ্গমস্থল।

মীরপাড়া থেকে বেরুনোর সময় তার কানে এল মাইক্রোফোনের ঘোষণা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। মোরাম রাস্তায় পৌঁছে সে একটু দাঁড়াল। দরগা পাড়ার দিকে সাইকেল রিকশতে ব্যাটারিচালিত মাইক বসিয়ে কে ঘোষণা করছে, 'মোমিন-মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! বেরাদারে ইসলাম! আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে, দরগাপাড়ার খোন্দকার মবিনউদ্দিন আহমেদ সাহেব গত-রাত্রে ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন্‌। তাঁহার লাশ টাউন হইতে জলদি পহুঁছাইবে। বাদ মগরেব তাঁহার দাফন-কাফন সমাধা হইবে। আপনারা আল্লাহ্‌তায়ালার এই নেককার বান্দার জানাজার নামাজে শামিল হইবার জন্য তৈয়ার থাকিবেন। পুনরায় বলা যাইতেছে, বাদ মগরেব আপনারা দলে দলে গোরস্তানে হাজির থাকিবেন।

সানু সাইকেল থেকে নেমেই ভাস্কর্য হয়ে যায়। সাইকেল রিকশ এগিয়ে

আসে। দরগা পাড়ার সুলতান মিয়াঁর পাশে শেখপাড়ার মসজিদের মৌলবি সাহেব বসে আসেন। মৌলবিসাহেবই ঘোষণা করছেন। 'মোমিন মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ। বেরাদারে ইসলাম···

তাহলে রেবেকা পিতৃহীন হয়ে গেল! রেবেকা বলেছিল, আববুর লাংক্যান্সার। স্বর্ণচাঁপা আমি নেব না সার। পরে 'ব্রঙ্কিয়াল এজমা'-র উল্লেখ করে কাজের মেয়ে সামিরুনকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। 'স্বর্ণচাঁপা না নিলে আপনাকে অপমান করা হয়। তা কি আমার উচিত?' সামিরুনের হাতে টবটা পাঠাতে লিখেছিল। সেই চাঁপা রেজিনা পুঁতেছে এবং চিঠিটা তার 'ডুকমেন্ট' হয়ে গেছে। রেবেকা লিখেছিল, 'ভাতিজিকে আমার সালাম ও কদমবুসি জানাবেন। তাড়াতাড়ি লিখলাম। ইতি। আপনার স্নেহের রেবেকা।'

তবু সেই নিষ্পাপ সরল এবং প্রার্থনার চিঠি, যার শীর্ষে সম্ভাষণ ছিল সার' শব্দটি, রেজিনার কাছে 'ডকুমেন্ট' হয়ে গেল।

কিন্তু এ মুহূর্তে কী করছে রেবেকা? তার জীবন থেকে 'সার' চলে গিয়ে কিছু ফুলগাছ আর আব্বুকে আঁকড়ে ধরে সে দিন কাটাচ্ছিল। এখন কি ফুলগাছগুলি তার বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট? না পাওয়া স্বর্ণচাঁপার বিস্ময় বিষাদের দিনে সহসা তার আব্বুর মৃত্যু এসে গেল। আব্বু বেঁচে থাকলে আর একটি স্বর্ণচাঁপা সে সারের হাত থেকে নিতে পারত। এই ব্যর্থতা রেবেকার নয়, তার সারেরই ব্যর্থতা। কেন সাহস করে সেদিন সন্ধ্যায় রেবেকাদের বাড়ি ঢুকে স্বর্ণচাঁপার টবটা তাকে দিয়ে আসেনি সানু? তুই সত্যিই নির্লজ্জ, ভীরু সানু! আজ আর কোন মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়াবি? দাঁড়ালেও কি সে-রাতের মতো সারকে দুহাতে জড়িয়ে কেঁদে উঠবে রেবেকা, 'সার! আব্বু চলে গেলে আমি বাঁচব না'?

মাইকে ঘোষণা শুনে রাস্তায় ভিড় জমে উঠেছে। বৃদ্ধরা পুনঃপুনঃ উচ্চরণ করছে, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন!' দেখতে দেখতে যতদূর চোখ যায়, মোরাম রাস্তার এক বাঁক থেকে আরেক বাঁক পর্যন্ত মানুষজন। এ কি খান্দানির প্রতি শ্রদ্ধা, নাকি ইসলামি বেরাদারির নবজাগরণ, প্রীতীশবাবু যা বলছিলেন?

সানু নড়ে ওঠে। সাইকেল ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। রেজিনা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। বলে, কে এমন মারা গেছে যে অ্যানাউন্স করে বেড়াচ্ছে? কুতুবপুরেও আজকাল এই এক ঢঙ। ছোটবেলায় এমন শুনিনি। কই রিকশ?

সানু গম্ভীর মুখে গলার ভেতর বলে, খোন্দকার চাচাজি মারা গেছেন।

রিকশ কোথায়?

সানু জীবনে এই প্রথম বিকৃত মুখে চেঁচিয়ে ওঠে, চাচাজি মারা গেছেন

শুনতে পাচ্ছ না ? সারা গ্রাম শোকে ভেঙে পড়েছে, আর রিক্‌শ-রিক্‌শ-রিক্‌শ ! নিজে গিয়ে রিক্‌শ ডেকে আনো ।...

১০

একটা যুগ শেষ হয়ে গেল !

যুগ কী বলছ হে ? যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। খানকয়েক স্মৃতি পড়ে আছে। তার একটা মুছে গেল !

মাদ্রাসায় ফুলডে ছুটি দিল। তা দিতেই পারে। স্বজাতি। কিন্তু প্রসন্নময়ী আর পরমেশ্বরী হাফডে ছুটি দিতে পারত ! কাঁটালিয়াঘাটের কালচারট্রাডিশন—

আর কালচার-ট্রাডিশন ! ওসব কথা ভুলে যাও হে প্রমথ ! আমার পূর্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠা করা স্কুল প্রসন্নময়ী। সেখানে হরি মোড়লের ছেলে মটর মাতব্বর। পরমেশ্বরীতে নগেন দত্ত। নগেনের বাবা ষষ্ঠী তেলেভাজা বেচত। মানীর মান বোঝে ? এই দেখ, শোনামাত্র রিক্‌শা করে চলে এসেছি। এক পা হাঁটাচলার সাধ্যি নেই। তবু কেন এসেছি বোঝো !

আজ ভোরের ট্রেনে খুকুরা দুর্গাপুরে চলে গেল। একই ট্রেনে গিয়েছিলাম। আজ কোর্ট খুলেছে। সন্ধ্যায় ফিরে ঘাটবাজারে খবর পেলাম। তারপর ধড়াচুড়ো ছেড়ে আমিও রিক্‌শা করে এসেছি।

গোরস্থানের পাশের রাস্তায় বাবুপাড়ার কয়েকজন প্রবীণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েকটি সাইকেল রিক্‌শা অপেক্ষা করছিল। গোরস্থানে তার টেনে নিয়ে অনেকগুলি উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বালানো হয়েছিল। টুপি পরা নানা বয়সী মানুষজন গিজগিজ করছিল। পাশের বাঁজা ডাঙায় জানাজার নামাজ পড়া হয়েছে। এখন খোন্দকারের কাফন পরা লাস কবরে ঢোকানো হচ্ছে।

প্রমথনাথ বলেন, ভবতারণদা ! নগেনকে তোমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। পরমেশ্বরীর নাম ছিল শাহনাজ গার্লস হাইস্কুল। পার্টিশন না হলে নওয়াজ চৌধুরির ছেলেরা দখল ছাড়ত কি ? ওরা পাকিস্তানে চলে গেল বলেই না—

বড় রায়মশাই তাঁর কথার ওপর বলেন, নগেনের সে বিবেক-বুদ্ধি থাকলে তো ? মবিন খোন্দকার আর নওয়াজ চৌধুরিদের বংশে আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। খোন্দকারের বাবা-ঠাকুর্দাও গার্লস স্কুলের জন্য কম করেনি। হাফ-ছুটি ডিক্লেয়ার করতে পারত। হুঃ ! কোনও পলিটিক্যাল পার্টি-লিডার

মরলেই ছুটি দিয়ে দেয়।

দ্বিজেন সিংহকে আড়ালে লোকে 'পোড়াকায়েত' বলে। তিনি এক পা এগিয়ে এলেন। আচ্ছা বড়রায়মশাই! আপনি বোধ করি খোন্দকারের চেয়ে বয়সে বড়। তাই না?

মবিনের সেভেনটি ওয়ান হয়েছিল। আমার চলছে সেভেনটি নাইন। কবে খসে পড়লেই হল। তবে যৌবনের সেইদিন কি ভোলা যায়? আমাদের নাট মন্দিরে থিয়েটার হত। মবিন ছিল সব বইতে মেইন পার্ট। তারপর ধরো, লাইব্রেরি। স্পোর্টিং ক্লাব। মবিন সবেতেই লিড নিত।

আচ্ছা বড়রায়মশাই, ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, মিয়াঁদের নাকি আলাদা গোরস্থান ছিল?

ছিল। আমিও শুনেছি। মুসলমানদের মধ্যেও কাস্টিজম ছিল। এখনও কিছু কিঞ্চিৎ আছে। আমি জানি। মবিনের মধ্যে আবার একটু বেশি-বেশি ছিল।

সেই গোরস্থানটা কোথায় ছিল জানেন?

হয়তো গঙ্গার তলায় চলে গেছে। সে কি আজকের কথা? নাইটিন্থ সেঞ্চুরি কি তারও আগে।

কথাটা কানে গেলে গাঙ্গুলিমশাই বলেন, না হে ভবতারণ! মিয়াঁদের গোরস্থান ছিল সুলতানি মসজিদের পাশে। মসজিদের জায়গায় এখন বটের গাছ। আর সেই গোরস্থানের জায়গায় এখন দুধু মিয়াঁদের বাঁশবন। আমি নিজে দেখেছি, বাঁশবনের ভেতর ইটের অজস্র চাবড়া পড়ে আছে। ফার্স্ট সেটেলমেন্টের রেকর্ডে আর একশায় গোরস্থান লেখা আছে। সেটেলমেন্ট রিচেকিংয়ের বছর দুধুমিয়াঁ নিজের দখল দেখিয়ে বাগান বলে রেকর্ড করেছিল। সিক্সটি টু-এর কথা।

মাথায় টুপি, পরনে লুঙি-পাঞ্জাবি, হাবলকাজি গোরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাড়ান। আরে প্রমথ যে! বড় রায়মশাইও এসেছেন দেখছি। খুব ভাল লাগল।

প্রমথনাথ বলেন, গোরস্থানে আমাদের ঢুকতে মানা আছে কি কাজি?

না, না! জুতো খুলে ঢুকে যাও। বড় রায়মশাই! ঢুকতেন নাকি?

আমি একটা ফুলের তোড়া এনেছিলাম। তো—

চলুন! চলুন! সিঙ্গি! গাঙ্গুলিদা! মবিন ভাইয়ের আত্মা শান্তি পাবে তোমাদের দেখলে।

হাবলকাজি ভিড় সরিয়ে ওঁদের নিয়ে যান। জুতোগুলির কাছে একজনকে পাহারায় রেখে যান। প্রমথনাথ কাদামাটির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে করজোড়ে চোখ বোজেন। বড় রায়মশাই কবরে ফুলের তোড়া রাখেন। গাঙ্গুলিমশাই,

'পোড়াকায়েত' এবং আরও কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক নমস্কার করেন। তার পর দল বেঁধে ফিরে আসেন। প্রমথনাথের পাশে এসে হাবলকাজি চাপা স্বরে বলেন, কবর পাকা করা হবে। শেখপাড়া-মসজিদের মৌলবিসাহেব একটু বাগড়া দিচ্ছেন। কবর পাকা করা নাকি অসিদ্ধ। এদিকে দুনিয়া জুড়ে পাকা কবরের ছড়াছড়ি। এই গোরস্থানেও কয়েকটা আছে।

জুতো পরে রাস্তায় ওঠার পর বড়রায়মশাই কাজিকে ইশারায় ডাকেন। চাপা গলায় বলেন, কাল তোমাদের মাথা-মাথা লোককে নিয়ে প্রসন্নময়ী আর পরমেশ্বরীতে ডেপুটেশন দাও। রামাশ্যামা রাজনীতিওয়ালার জন্য ছুটি ডিক্লেয়ার করে। ন্যায্য ডিম্যাণ্ড ছাড়বে কেন, হে?

কাজি বলেন, কী হবে বড় রায়মশাই? খামোকা ঝামেলা! তাতে আজকাল যা অবস্থা, কমিউন্যাল অ্যাঙ্গেলে চলে যাবে।

আমরা আছি পেছনে। ভবতারণ রায় একটু বাঁকা হাসেন। ছৈরদ্দিকে সঙ্গে নিয়ে যেও। দেখবে কী হয়! মটর বলো, নগেন বলো, ছৈরদ্দিকে দেখলে কাপড়ে চোপড়ে হয়ে যাবে।

দেখি।

গোরস্থান থেকে এবার টুপি খুলে লোকেরা বেরিয়ে আসছিল। একটু পরে সবগুলিন আলো নিভে গেল। মাঝে মাঝে টর্চের আলোর ঝলক এবং চাপা গুঞ্জন। এতক্ষণ ঘোর স্তব্ধতা ছিল।

সানু তখনও কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে তার কাঁধে ভারী হাত চেপে বসে সহসা। সে বলে, মামুজি!

ফয়েজুদ্দিন আস্তে বলেন, আর কী? চলে আয়। আর এখানে থাকতে নেই। জানিস না মানুষকে কবর দিয়ে আড়াই কদম সরে গেলেই নাকি কেরামন কাতেবিন নামে দুই ফেরেশতা কবরে ঢুকবে জেরা করতে? তিনি খুদে টর্চ জেবলে গোরস্থান থেকে সানুর কাঁধে হাত রেখে রাস্তার দিকে হাঁটছিলেন।

রাস্তা ক্রমে জনশূন্য। গোরস্থান থেকে দ্রুত খুঁটি, তার আর বালব খুলে নিয়ে ছেলে-ছোকরারা ততক্ষণে চলে গেছে। সানু বলে, শুনেছিলাম চাচাজি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। হঠাৎ এ কী হল মামুজি?

ফয়েজুদ্দিন বলেন, কাল সন্ধ্যায় বেড থেকে উঠে হাঁটাচলা করছিলেন। রুবির মায়ের সঙ্গে খুব জোক করেছেন। রুবি একা বাড়িতে থাকবে। তাই আমি এখানে ছিলাম। ভোরের বাসে টাউন থেকে টুলু এসে খবর দিল— ডাক্তার তো অন্তর্যামী নন। রাত তিনটে কুড়িতে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক।

আপনার সঙ্গে রুবি গিয়েছিল?

ফয়েজুদ্দিন একটু পরে শ্বাস ছেড়ে বলেন, তাজ্জব রে। মেয়েটাকে বুঝতে পারি না আজও। খবর পেয়ে কেমন শক্ত আর শান্ত হয়ে গেল। শুধু বলল,

আমি জানতাম। সান্ত! আমার এই ভাগনিটা কী ধাতুতে গড়া কে জানে! ভেবেছিলাম ওকে সামলানো দায় হবে। কিন্তু তুই শুনলে অবাক হবি, আশ্চর্য ঠাণ্ডা মাথায় মাকে সামলানোর দায়িত্ব নিল। চোখে একফোঁটা পানি নেই! বাড়ি ভর্তি কুটুমসোদর এসে গেছে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছিল রুবি। কালোর বউ, হাবলকাজির ছোট মেয়ে গুলশন, সুলতান মিয়াঁর বউ রহিমা—এদের রান্নাবান্নায় লাগিয়ে দিল। বলে কী, যারা বেঁচে আছে, তাদের কি না খেয়ে মরতে হবে?

ছবিকে খবর দেওয়া হয়নি?

টাউন থেকে ট্রাঙ্ককল করে খবর দিয়েছি। আসা কি সহজ কথা? ওয়েস্ট দিনাজপুর থেকে আসতে সময় লাগবে। কী করব? বাপের মরা মুখ দেখতে পেল না। কলকাতা থেকে মেজ দুলাভাই অবশ্য সন্ধ্যার আগেই এসে গেছেন। ফয়েজুদ্দিন একটু পরে ফের বলেন, তামাশা দ্যাখ্ সান্ত! ছোট দুলাভাই—রুবির আব্বু খান্দান খান্দান করতেন। কথায় কথায় ছোটলোক-ভদ্রলোক আর চাষা-চাষা রব ছিল মুখে। তাই না?

হ্যাঁ। জানি।

আজ দেখলি সেই চাষারাই ধুমধাম করে তাঁকে গোরে শোয়াল। মোমিন-পাড়ার লোকেদের জোলা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন। তাদের বাড়ির ছেলেরা গোরস্থান আলোয় ঝলমলিয়ে দিল। কজন মিয়াঁ ছিল রে?

বাবুপাড়া থেকে অনেকে এসেছিলেন দেখলাম। বড় রায়মশাই ফুলের তোড়া দিলেন কবরে।

দুলাভাইয়ের ইয়াং এজের সঙ্গী সাথী তাঁরা। স্মৃতির একটা টান আছে না? সেই টান হিন্দু-মুসলমান জিনিসটা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু আলম মির্জা মারা গেলে ঘাটবাজারে ঝাঁপ পড়ে যাবে। পরমেশ্বরী-প্রসন্নময়ী ছুটি ডিক্লেয়ার করবে। সদর থেকে নেতা-পাতিনেতারা ছুটে আসবেন। কেন? না—মির্জা রাজনীতির লোক। যাক্ মরুক গে! তবু ভাল লাগল। বড় রায়বাবু, প্রমথ, পোড়াকায়েত আরও কারা এসেছিলেন।

মীরপাড়ার মোড়ে পেঁছে সান্ত বলে, আমার চিন্তা ছিল রুবির জন্য।

শি ইজ অলরাইট। তুই আজ স্কুলে যাসনি? আজ তো তোর স্কুল খুলেছে।

যাইনি।

বউবিবি কেমন আছে?

বাপের বাড়ি গেল দুপুরের ট্রেনে। মায়মুনানানি সঙ্গে গেছে।

অমন টোনে বলছিস কেন? কাজিয়া করে গেছে নাকি রে?

সান্ত চুপ করে থাকে।

তোর লাকটাই স্ট্রাগলের লাক। কী বলব? এদিকে দ্যাখ আমার কী লাক! দুলাভাই আমার হাতে রুবিকে সঁপে দিয়ে গেছেন, রুবি যেন খান্দান পায়। না পেলে আইবুড়ি হয়ে থাক জীবনভর।

হ্যাঁ। সেদিন আপনি বলছিলেন।

সানু! আমি এক উড়ো পাখি। মাঝে মাঝে যে ডাল পাই, কিছুক্ষণ বসে যাই। তো দ্যাখ্, দুলাভাই আমার পায়ে শেকল পরিয়ে গেলেন! রুবির শেকল। বড় জ্বালায় পড়ে গেছি বাপ। এ শেকল ছিঁড়ি কী করে বুঝি না।

মামুজি! আপনি ওদের মাথার ওপর না থাকলে ওরা হেল্পলেস! যে টুকু জমিজমা প্রপার্টি আছে, লুঠ হয়ে যাবে।

চল্! তোর বাড়ি গিয়ে একটু রেস্ট নিই। দুলাভাইয়ের বাড়িতে এখন মাতন চলেছে। টেকা দায়! তোর বাড়ি গিয়ে শুধু এক কাপ চা খাব।

আপনার আজ বোধ করি খাওয়াদাওয়া জোটেনি!

তোর পেট, না আমার পেট? চল্…

গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে ডিএম জেলাপরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসারদের বৈঠক ডেকেছিলেন। কুতুবপুরের হাশিম মীর জেলা পরিষদের সদস্য। বৈঠক শেষ হলে নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্ম সেরে তাঁর বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। গাব্দাগোব্দা চেহারার বেঁটে মানুষ। পাতলা গোঁফ। দাড়ি রাখেন না। মাকুন্দে গাল। প্যান্ট শার্ট পরেন। মোটর সাইকেলের ব্যাকসিটে বডিগার্ড নিয়ে ঘোরেন। বডিগার্ড একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল। তবে তাঁর আরও বডিগার্ড আছে। তারা এলাকার দুর্ধর্ষ তরুণ প্রজন্ম।

ট্রাক ঢোকার জন্য চওড়া কোলাপ্সিবল গেটের পর বিশাল খলিয়ান বাড়ি। একধারে টানা টালির চালের গোয়াল ঘর, অন্য ধারে মাহিন্দার-চাকরবাকরদের সপরিবারে বসবাসের জন্য একতলা, সারবন্দি দালান। কেল্লাবাড়ির মতো দোতলা চৌকো অন্দরমহল একদিকে এবং অন্যদিকে সাবেক 'বাংলা ঘর'। এ অঞ্চলে এই কথাটা পুরনো খান্দানি জীবনযাত্রার প্রতীক, কেননা আয়মাদারদের বৈঠকখানা বা আড্ডা-মজলিস বাসগৃহের বাইরে একটু তফাতে থাকার রীতি চালু ছিল। 'বাংলা'-ঘরটা পূর্বপুরুষের আমলে তৈরি মাটির দোতলা ঘর এবং করোগেটেড টিনের চালে ঢাকা। চালের গড়ন ওল্টানো ময়ূরপঙ্খি জাহাজের মতো—লোকে 'ময়ূরপঙ্খি'-ই বলে। টিনের চাল সময়ের ছোপে কালো হয়ে গেছে। জায়গায়জায়গায় জোড়াতাপ্পি আছে। তবু 'বাংলা ঘর' রাঢ়ের প্রাচীন খান্দানি ট্রাডিশনের স্মৃতি। হাশিম মীর ভাঙব-ভাঙব করে প্রবীণ হয়ে গেলেন। ছেলেরা ভাঙতে চাইলেও ভাঙতে দেননি। এলাকার

মাটি শক্ত। বাইরের দেওয়ালে বছর বছর আলকাতরা মাখানো হয়। বারান্দা এবং চওড়া ঘরের ভেতর সিমেন্ট করা মেঝে। দেওয়ালে বালি-মাটির পলেস্তারা চুনকাম করা। ঢুকলে বোঝা যায় না এটা মাটির ঘর। একপাশে একালের সোফাসেট, অন্যপাশে গদিতে সাদা চাদর পাতা তিনটে একত্রিত তক্তাপোশ। তার ওপর অনেকগুলি তাকিয়া। দুটো ফ্যান, বাহারি দেওয়ালবাতি, সুদৃশ্য কাচের শেলফে সাজানো দেশি-বিদেশি পুতুল। রাঢ়ের আশরাফরা একদা ওই গদিতে বসে আড্ডা দিতেন। আতরাফরা মেঝেয় ঠাঁই পেত। হাসিম মীর তাঁর যৌবনেই সেই প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। কেন না তাঁর স্বপ্ন ছিল এম এল এ হওয়া। বাংলা কংগ্রেস আমলে কিছুকালের জন্য স্বপ্ন সফল হয়েছিল। সত্তরের দশকে তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দেন। এম এল এ হওয়ার স্বপ্ন এখনও থেকে গেছে। তবে বয়স ঊনসত্তর হয়ে এল।

ঊনসত্তরেও হাশিম মীর শক্তসমর্থ মানুষ। সবসময় হাসি মাখানো মুখ। দেখলে বা কথা বললে মনেই হয় না এমন মানুষের কোনও শত্রু আছে। কিন্তু তবু শত্রু আছে, কেননা তিনি রাজনীতি করেন এবং আজকাল রাজনীতি করতে গেলেই বডি গার্ড দরকার হয়। একবার শত্রুর গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়েছিল।

তিনি চল্লিশ বছর বয়সে এক রূপসী আতরাফ কন্যার প্রেমে পড়ে তাকে ঘরে তুলেছিলেন। কিন্তু আশরাফনন্দিনী মানেকা বেগমের অত্যাচারে সেই রূপসী রাতারাতি পালিয়ে যায়। হাশিম মীর নিজের 'কেরিয়ারে ব্ল্যাক স্পট' পড়ার আশংকায় তাকে দ্রুত তালাক দিয়েছিলেন। বিশেষ কথা, সালেমা ছিল নিরক্ষরা। হয়তো প্রেমের ব্যর্থতা হাশিম মীরের রাজনীতিতে আরও বেশি জড়িয়ে পড়ার কারণ।

এমন এক মানুষ হাশিম মীরের ছোট মেয়ে রেজিনার পঁচিশ বছর বয়সেও উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল না, এটি আরেক ব্যর্থতা। আসলে রেজিনার ঈষৎ পুরুষালি গড়ন, কর্কশ কণ্ঠস্বর, গায়ের রঙ—তাছাড়া স্কুল ফাইনালে টেনেটুনে পাশ কোনও 'উপযুক্ত পাত্র'-কে টানতে পারেনি। তাঁর পাঁচ মেয়ের মধ্যে চার মেয়েই গ্রাজুয়েট এবং তারা রূপবান পুরুষ পেয়েছে। কিন্তু রেজিনার নিজের দোষও কম ছিল না। নিজের বর সম্পর্কে তার কিছু কল্পনা ছিল। সিনেমা আর টিভি দেখে-দেখে সে একজন পর্দার নায়ককে মনের ভেতর মডেল করেছিল। তার সঙ্গে চেহারা মোটামুটি মিলে গেলেই সে বিয়ের সময় 'এজিন' দেবে, যা শরিয়ত অনুসারে আবশ্যিক। কোনও পাত্রপক্ষ তাকে পছন্দ করে গেলে সে বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করত, আমি এজিন দেব না! বিষ খেয়ে মরব, তবু এজিন দেব না। মেয়ে 'এজিন' (সম্মতি) উচ্চারণ না করলে বিয়ে সিদ্ধ হবে না।

হাশিম মীর বা মানেকা বেগম জানতেন তাঁদের এই কন্যা কী ধাতুতে গড়া। সে যা বলছে, সত্যিই তা করবে এবং কেলেঙ্কারির ঢি ঢি পড়ে যাবে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, এই মেয়ের আত্মায় এক পাগ্‌লি আছে—কেননা একটুতেই সে ভাঙচুর শুরু করত, বাড়ি কাঁপিয়ে দিত কর্কশ চিৎকারে। তাকে বংশপরম্পরা বাঁদি মায়মুনা ছাড়া কেউ সামলাতে পারত না। অবশেষে রেজিনার বিয়ের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন হাশিম মীর। সহসা একদা এই বোনের পঁচিশ বছর বয়সে দানিয়েল হোসেন, মীরের কনিষ্ঠ পুত্র সে, তার কলেজের এক সহপাঠী বন্ধু কাঁটালিয়াঘাটের মীর সানোয়ার আলিকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল।

মীর সানোয়ার আলি—সানুর যেদিন কুতুবপুর স্কুলে ইন্টারভিউ ছিল। দৈবাৎ রাস্তায় দুজনের দেখা।

দানিয়েল তার বোনের কথা ভেবে বন্ধুকে ডেকে আনেনি। খলিয়ান বাড়িতে সাইকেল নিয়ে সানু যখন ঢুকছিল, তখন রেজিনা দোতলার জানালায় বসে জোরে রেকর্ড প্লেয়ার বাজাচ্ছিল। বাংলা ঘরের সামনে রেজিনা সানুকে দেখেই বাজনা কমিয়ে দেয়।

বাড়িতে পর্দাপ্রথা কবে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু বাঘিনী যেমন আড়াল থেকে শিকারের দিকে লক্ষ্য রাখে, রেজিনা সেইভাবে লক্ষ্য রেখেছিল। কেননা তার গোপন মডেলের সঙ্গে তার ভাইয়ের বন্ধুর অনেক মিল ছিল।

হাশিম মীর ছিমছাম গড়নের সুশ্রী আর শান্ত যুবকটিকে খলিয়ানবাড়ির অন্যপ্রান্ত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি অন্দরমহলে ঢোকার সময় দানিয়েল বলেছিল, আব্বা! কী কাণ্ড দেখুন! স্কুলের সেক্রেটারি রতনকাকু একে বলেছেন, ওয়েল কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেট। তবে তিরিশ হাজার টাকা ডোনেশন লাগবে। এ কী চলছে বলুন তো?

এর পর হাশিম মীরের প্রথম প্রশ্নই ছিল, কী গো ছেলে, বিয়ে শাদি করেছ?

জি না।

কেন গো?

জি, নিজেরই জোটে না কিছু, তো বিয়ে করে অন্যকে কষ্ট দেব?

হুঁ।

এই সময় সানু তাঁর পায়ে কদমবুসি করছিল, কেননা এই প্রবীণ তার সহপাঠীর বাবা। আর হাশিম মীর তার কাঁধে হাত রেখে সহাস্যে বলেছিলেন, ও ছোটকু! তোর বন্ধুর কী খাতিরদারি করলি? শুধু চা-বিস্কুট? ওরে! কুতুবপুরের মীরের বাড়িতে কাঁটালিয়াঘাটের এক মীরের বাচ্চা এসেছে! হারামজাদা! ভেতরে গিয়ে আম্মাকে বল্ শিগগির!

সানু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে পনের কিলোমিটার সাইকেল চালাতে হবে। বেলা পড়ে আসছে। শীতের বিকেলে ঠান্ডাহিম উত্তরের হাওয়া তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। গায়ে যেমন তেমন শার্টের ওপর হাতকাটা একটা পুরনো সোয়েটার।

হাশিম মীর বাড়ি ঢুকতেই মায়মুনাবুড়ি চাপা স্বরে বলেছিল, মীরের ব্যাটাকে একটা চুপকথা বলি। ছোটকুর সঙ্গে কে এসেছে, আপনার বিটি তাকে লুকিয়ে-চুকিয়ে দেখছে গো!

হুঁ।

ফোকলা মুখে বুড়ি ফিসফিসিয়ে উঠেছিল, টোপ ফেলে দেখতে দোষ কী? সতীনের ঘরই করবে। করছে না কেউ? মীরের বিটি সতীন জব্দ করা মেয়ে।

ধুর বুড়ি! ছেলেটার বিয়েশাদিই হয়নি!

তবে আর কথা কিসের? বড় করে টোপ ফেলুক মীরের ব্যাটা।

এভাবেই তিরিশ হাজার টাকা ডোনেশন, স্কুলের মাস্টারি, পাকা বাড়ি এইসব বৃহৎ টোপে এক গরিব ঘরের উচ্চশিক্ষিত বেকার সুশ্রী যুবক সানু হাশিম মীর এবং এক পঁচিশ বছর বয়সী 'পাগলি আত্মা'-র করতলগত হয়েছিল। খুবই সহজে। প্রায় এক কথাতেই।...

এদিন সন্ধ্যায় হাশিম মীর অন্দরমহলে ঢুকে একটু অবাক হয়েছিলেন। বিশাল বাড়ি সুনসান স্তব্ধ। রান্নাঘরে দুই বউমা আর নানা বয়সী কয়েকজন 'বাঁদি' রাতের রান্নায় ব্যস্ত যদিও, কিন্তু তারা এতক্ষণ কিছু চুপ কথা বলছিল ফিসফিসিয়ে—মীরকে ঢুকতে দেখেই তারা পুতুল হয়ে যায়। বারান্দায় ইজি চেয়ারে মানেকা বেগম গম্ভীর মুখে বসেছিলেন এবং তাঁর ঘাড় মালিশ করছিল এক কিশোরী 'বাঁদি'—তারও হাত থেমে যায়। মীরের দিকে চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকে।

মানেকা স্বামীর অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ তুলে দেখেন না। হাশিম মীর একটু কেসে বলেন, হাঁ-চাঁ নেই কেন সব? কাজিয়া-ফ্যাসাদ হয়েছে নাকি?

দুই বউমার মধ্যে ইদানীং মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি হয়, মীর তা জানেন। বড় ছেলে শেফায়েত হোসেন, ডাকনাম বড়কু, বাজারে তাদের হার্ডওয়্যার-বালি-সিমেন্টের দোকানসংলগ্ন বাড়িটা তৈরি হয়ে গেলেই চলে যাবে। তবু দুই জা-র বিরোধ চলেছে। হাশিম মীর তেমন কিছু ভেবেই কথাটা বলেন।

কিন্তু মানেকা চুপ।

মীর ঠান্ডা মাথার মানুষ। ফের বলেন, পাঁচটা হাঁড়ি এক জায়গায় থাকলেই একটু ঠোকাঠুকি হবেই। তা—

সহসা মানেকা চাপা গর্জন করেন, কমিন! কমজাত! ছোটলোকের পয়দা!

আমাকে গাল দিচ্ছ?

মীরের মুখে কৌতুক ছিল। কিন্তু মানেকা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন, এত সাহস গায়ে হাত তোলে? আমার মেয়ের গায়ে হাত? ওই হাত টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। জিপগাড়ি পাঠিয়ে তুলে আনব। জানে না কার মেয়ের গায়ে—

আহা! খুলে তো বলবে?

কিশোরী বাঁদি দুলারি কাটা-কাটা কথায় এবং তোতলামি করে বলে, বাবাজি! ছোট দুলামিয়াঁ, না? ছোট বুবুকে, না? চড় কিল মেরে, না? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মায়মুনা নানি টেরেনে চাপিয়ে এনে—রিকশা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছোটবুবু বেহুঁশ—তা পরে, না?

রিজু?

জি বাবাজি! ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে ওষুধ খাইয়ে তবে না?

কোথায় সে?

ছোট চাচিজির ঘরে। মায়মুনা নানি বসে আছে। আপনি যেয়ে দেখুন কী অবস্থা।

মানেকা ফের চেঁচিয়ে ওঠেন, এক্ষুনি লোক পাঠাও। বোম মেরে উড়িয়ে দিয়ে আসুক। দ-শ হাজার ইট! দ-শ হাজার ইট বুকে চাপিয়ে দিয়ে আসুক। নেমকহারাম! মিনিমুখো! ভেতর-ভেতর লম্পট, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

হাশিম মীর আস্তেসুস্থে দোতলায় ওঠেন। ছোট বউমার ঘরের পর্দা তুলে দেখেন, রেজিনা কাত হয়ে খাটে শুয়ে আছে। তার পায়ের কাছে মায়মুনা বসে আছে। মীরকে দেখে বিধবা বৃদ্ধা বাঁদি মাথায় ঘোমটা টানে। তারপর বিছানা থেকে নেমে ইসারায় তাঁকে বাইরে নিয়ে যায়। বারান্দায় গিয়ে সে ফিসফিস করে বলে, তত কিছু নয় বাপ। নিজের বিটিকে তো আপনি ভালই জানেন। দুলামিয়াঁর তত দোষ নেই। এদানিং কিছুদিন থেকে নাতনি কথায়-কথায় খেপে যাচ্ছিল। একটা চাঁপাফুলের গাছ বাপ। সামান্য একটা ফুল গাছ নিয়ে—

মীর ভুরু কুঁচকে বলেন, চাঁপাফুলের গাছ মানে?

মবিন খোন্দকার গো! আজ তেনার ইন্তেকাল হল। তো দুলামিয়াঁ তেনার ছোট মেয়ের মাস্টারি করতেন—এখনকার কথা নয়। সেই মেয়ের

অবশ্য একটু বদনাম আছে। দুলামিয়াঁর একটুখানি ভুল হয়েছিল। বললেই পারতেন, কার জন্যে চাঁপাফুলের গাছ এনেছেন। কথাটা লুকোছাপা করে বলেছিলেন, বাবুপাড়ার বউদিদির জন্যে এনেছেন। তার দুই ছেলের মাস্টারি করেন তো! তা পরে খোন্দকারের মেয়ে চিঠি পাঠালে। আর বাস! সেই শুরু।

হাশিম মীর ঘরে ঢুকে মেয়ের কাঁধে হাত রেখে ডাকেন, ও রিজু!

মায়মুনা বলে, ওষুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমোক। ডাক্তারবাবু বলেছেন, জোর করে জাগিও না।

হাশিম মীর মেয়েকে দেখছিলেন। সহসা লক্ষ্য করেন, রেজিনার হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা দোমড়ানো একটা কাগজ। সাবধানে মুঠো থেকে খুলে নিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ভাঁজ খোলেন। বুকপকেট থেকে রিডিং গ্লাস বের করে পড়েন। এক্সারসাইজ খাতা থেকে ছেঁড়া লাইনটানা কাগজে লেখা চিঠি। 'সার' সম্ভাষণ করে লেখা। কয়েকবার খুঁটিয়ে পড়ার পর তাঁর মনে হয় চিঠিটা নির্দোষ। কিন্তু 'স্বর্ণচাঁপার চারা'—

হুঁ। ইংরিজিতে যাকে বলে 'বিটুইন দি লাইনস', কিছু কথা যেন আছে। একটা ঘটনার আভাসও আছে। কোনও এক রাতে সানু মেয়েটিকে চাঁপাফুলের চারা দিতে গিয়েছিল। মেয়েটি নেয়নি। কারণ তার মন ভাল ছিল না—'আব্বুর লাং-ক্যান্সার।' কিন্তু বাবার 'ব্রঙ্কিয়াল এজমা মতো' হয়েছে জানার পর মামার সঙ্গে টাউনে নার্সিং হোমে যাওয়ার সময় তাড়াতাড়ি করে চিঠি লিখে 'সামিরুন'-কে পাঠিয়েছে। তার হাতে স্বর্ণচাঁপার চারা দিতে লিখেছে। চিঠিটি গোপনীয় নয়। কাজেই 'ভাবিজিকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও কদমবুসি জানাবেন' এই লাইনটা লিখতেই হয়। 'ইতি আপনার স্নেহের রেবেকা'—এইভাবেই শেষ করতে হয়। অথচ 'স্বর্ণচাঁপার চারা' চুপকথাটি ফাঁস করে দিচ্ছে। কেন স্বর্ণচাঁপার চারা? কেনই বা মীরের ছোট জামাই একটা মেয়েকে রাতের বেলায় স্বর্ণচাঁপার চারা দিতে গিয়েছিল?

হাশিম মীর চিঠিটা পকেটে ভরে জোরে শ্বাস ছাড়েন। ইশারায় মায়মুনাকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান। বলেন, গায়ে হাত তুলেছিল?

মায়মুনা হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমি চোখে দেখিনি বাপ! রান্নাঘরে ছিলাম। তবে নাতনি কেঁদে-কেটে চেঁচাচ্ছিল, তুমি আমাকে চড় মারলে? খুব হুজ্জুত হচ্ছিল। দুলামিয়াঁ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি নাতনিকে খুব বুঝালাম। তার রাগ তো জানেন বাপ!

মীর নিচে নেমে তাঁর ঘরে ঢোকেন। চিঠিটা বের করে আবার পড়েন। তারপর দেওয়ালে বসানো পূর্বপুরুষের বিলিতি আয়রনচেস্ট খুলে চিঠিটা তার

ভেতর রেখে দেন। শার্ট খুলে বুকের বাঁ পাঁজরে আটকানো কোষবদ্ধ খুদে ফায়ার আর্মসের বেল্ট খুলে বালিশের ফাঁকে রাখেন হাশিম মীর। লাইসেন্সড আর্মস্।

একটু পরে তিনি লুঙি-গেঞ্জি পরে উঠোনের কোনায় বাথরুমে ঢুকে যান।

রাত নটায় জিপ গাড়িতে ছোটকু ফিরল ইটখোলা থেকে। একটু পরে বড়কু মোটরবাইকে ফিরল হার্ডওয়ার স্টোর্স থেকে। ততক্ষণে রেজিনার ঘুম ভেঙেছিল। মায়মুনা তাকে খাওয়ার জন্য সাধছিল। রান্নাঘরের পাশে ডাইনিংয়ে খেতে বসার সময় হাশিম মীর দুই ছেলের সঙ্গে মিটিং করছিলেন। ছোটকুই সিদ্ধান্ত নিল। স্কুল খুলেছে। কাল আমি সানুর সঙ্গে আগে কথা বলি। এখন আগ বাড়িয়ে কিছু করতে গেলে স্ক্যাণ্ডাল রটবে।

বড়কু ফুঁসে ওঠে, কিসের কথা? হাত কেটে নিয়ে তারপর কথা। শুওরের বাচ্চার অডাসিটি! না খেতে পেয়ে ধুঁকছিল।

হাশিম মীর ধমক দেন, মুখ বুজে থাকবি বলে দিচ্ছি! সবসময় মেজাজ খারাপ করলে চলে না।

ছোটকু বলে, বড় ভাই বোঝেন না এ একটা সেন্সিটিভ ইস্যু।

মীর একটু পরে বলেন, ছোটকু কথা বলুক। আমিও কাঁটালিয়াঘাটে ভেতর-ভেতর খবর নিই। সেখানে আমার লোক আছে। কুটুমসোদরও আছে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

কী ব্যবস্থা? ছোটকু আস্তে বলে, এক হাতে তালি বাজে না। ব্যবস্থা না হয় নিলেন। তারপর? রিজুর ফিউচার লাইফের কী হবে?

বড়কু খেঁকিয়ে ওঠে, থাম তুই। চাঁপাগাছের ব্যাপারটা তোর মাথায় ঢুকবে না।

বড় ভাই! আপনাদের ওপরটা মর্ডান। ভেতরটা প্রিমিটিভ। সানুকে আমি যতটা জানি, আপনারা জানেন না। প্লিজ আব্বা! আমার হাতে সব ছেড়ে দিন।

হাশিম মীর বলেন, বেশ। দিলাম। তারপর তিনি জল খেয়ে বেসিনে হাত ধুতে যান। বাঁধানো দাঁত খুলে ফেলেন।

মানেকা বেগম এসে রুষ্ট মুখে বলেন, নিজে তো গপ গপ করে গিললে। মেয়েটা আমার না-খাওয়া না-দাওয়া বিছানায় পড়ে কাঁদছে! ধিক তোমাকে!

মীর ফোগলা মুখে কিছু বলেন। বোঝা যায়, এবার মেয়ের কাছে যাবেন। দাঁত ধুতে যেটুকু দেরি।

১১

পরদিনও সানু স্কুলে আসেনি। হেড মাস্টার অবনী ঘোষাল বলেন, সানোয়ার আলি তো কখনও অ্যাবসেন্ট করে না। ঝড়বৃষ্টি হোক, কি বন্‌ধ ডাকুক, সানোয়ার এসে যায়। একমিনিট লেট পর্যন্ত না। হি ইজ এ গুড টিচার। হেডমাস্টার মশাই কণ্ঠস্বর চেপে ফের বলেন, ছোটকু! তুমি আমার প্রাক্তন ছাত্র। তোমাকে বলা চলে বাবা! স্কুলটাকে পলিটিক্যাল খোঁয়ার করে ফেলেছে দিনে দিনে। সানোয়ার কিন্তু এ সবের বাইরে থাকে। হ্যাঁ, স্টুডেন্টস্ লাইক হিম। কাজেই আমার ধারণা ওর শরীর খারাপ বা বাড়িতে কোনও মিসহ্যাপ হয়ে থাকবে।

দানিয়েল হোসেন হাসে। সার! ও আমার ভগ্নীপতি! বাড়িতে কিছু হলে জানতে পারতাম!

তা-ও তো বটে। হেডমাস্টার মশাইয়ের মনে পড়ে যায়। আজ হয়তো খবর দেবে স্কুলে। তা ও ছোটকু! তোমাদের ইটখোলা থেকে হাজার দেড়েক ইট পাঠাতে পারো? দরদাম ট্রাক্টর ভাড়া সমেত কত পড়বে হিসেব করে বল পাঠিও। পাঁচিল মেরামত না করলেই নয়।

পেয়ে যাবেন সার! তবে কয়েকটা দিন ওয়েট করতে হবে। এখন অফ সিজ্‌ন। গভর্মেন্ট কন্ট্রাক্টারের অর্ডার সাপ্লাই করে মনে হয়, কিছু স্টক বেঁচে যাবে। মাত্র দেড় হাজার তো? চিন্তা করবেন না।

অবনীবাবু হাসেন এবং হাত নাড়েন। না বাবা! কন্ট্রাক্টারি ইট নয়। তিন নম্বরকে এক নম্বর করে চালাও।

পাঁচিলের জন্য তো সার? ওই ইটই—

না বাবা! আমার তো জানো, ওই এক হ্যাবিট। যা করব, তা সলিড।

তা হলে সার জানুয়ারি পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। তখন চিমনি ভাটার প্রোডাকশান শুরু হবে।

তবে তা-ই।

ছোটকু—দানিয়েল হোসেন স্কুলের গেট পেরিয়ে জিপে ওঠে। ইটখোলা প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে গাঙ্গেয় সমভূমিতে। এ অঞ্চলের মাটিতে ইট হয় না। শাহ্‌জাদপুরের পর গাঙ্গেয় উপত্যকা শুরু। শুধু কাটালিয়াঘাট ব্যতিক্রম। রাঢ়ের একটা অংশ ওখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। উঁচু রুঢ় মাটি ক্রমে অবনত হয়ে গঙ্গাকে বুকে নিয়েছে।

জিপে যেতে যেতে সহসা একটা চিন্তা এল মাথায়। 'সলিড' কথাটি

অবনী ঘোষালের একটা মনোভাব প্রকাশ করছে। উনি পাঁচিলের জন্যও এক-নম্বর ইট চান। একটা মানুষকে এভাবে চেনা যায়। হাশিম মীর কোনও এক রেবেকার চিঠি দুই ছেলেকে গোপনে পড়ে শুনিয়েছেন। তাতে 'স্বর্ণচাঁপা' কথাটা আছে। স্বর্ণচাঁপাও কি কিছু চিনিয়ে দিচ্ছে? সানুকে এবং রেবেকো নামে কোনও মেয়েকে? রেজিনা চিৎকার-চেঁচামেচি করে বলছিল, ব্যাড ক্যারেক্টার মেয়ে। স্কুল পালিয়ে প্রেম করে বেড়াত। 'তোমাদের দুলামিয়াঁ তাকে পড়াত। হুঁ, সার! সা-আ-র!' শব্দটা যতটা বিকৃত করা যায়, রেজিনা তা করছিল।

ছোটকু বলে, রবিউল! তোরা এখান থেকে বাস ধরে ইটখোলায় চলে যা। আমি একটা কাজে কাঁটালিয়াঘাট যাব। ওখান থেকে শাহজাদপুর হয়ে ফিরব। ফিরে গিয়ে খাব কিন্তু।

রবিউল আর কাশেম সামনের সিটে ছিল। তারা নেমে যায়। পেছনে ছিল রঘু, পটল আর আমির। রবিউল তাদের বলে, এই বাবুর ব্যাটারা! নেমে আয়। বাস ধরতে হবে। ছোট মিয়াঁ যাবেন কাঁটলেঘাটের মড়া দেখতে।

ওরা নেমে খুব হাসাহাসি করে। কাঁটালিয়াঘাটের শ্মশান বিখ্যাত। 'কাঁট্‌লেঘাটের মড়া' কথাটা তাই সবখানে একটা পুরনো রসিকতা। বুড়োরা বলে, 'কাঁট্‌লেঘাটে কে মড়া কে জ্যান্ত বুঝা কঠিন হে!' এ-ও এক প্রবচন। কালীপুজোর রাতে অমাবস্যা তিথিতে কঙ্কালের নাচ দেখতে এত দূর থেকে মানুষজন এখনও ছুটে যায়।

এরপর বারো কিমি ক্ষতবিক্ষত সংকীর্ণ পিচ রাস্তা রেল ব্রিজের তলা দিয়ে বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তিকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেছে কাঁটালিয়াঘাটের বাজার এলাকায়। মোরাম রাস্তায় জিপ ঘুরিয়ে ছোটকু এগিয়ে যায়। রেজিনার বিয়ের সময় মোরাম ছিল না। বিয়ের পর দুবার এসেছিল সে। শেষবার দশ হাজার ইট বোঝাই দুটো ট্রাকের পিছনে। মীরপাড়ায় ট্রাক ঢোকাতে সে এক ঝামেলা। তবে তখন শীতকাল।

দাদাপীরের দরগা দেখে ছোটকুর মনে পড়ে যায়, সানু ও রেজিনা সন্ধ্যায় পীরের থানে আগরবাতি জ্বালতে এসেছিল। তাদের সঙ্গে সে-ও এসেছিল। দরগা তেমনই নির্জন নিঝুম আর পোড়ো হয়ে আছে। মীরপাড়ার বাঁকে গিয়ে ছোটকু রাস্তাটা লক্ষ্য করে। জায়গায়-জায়গায় কাদা আছে। তবে জিপ যাবে। সে হর্ন দিতে দিতে সানুর বাড়ির দরজায় পৌঁছায়। ততক্ষণে পিলপিল করে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসেছে।

সানুর বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। জিপ থেকে নেমে সে একবার টিভি অ্যাণ্টেনার দিকে তাকিয়ে নেয়। টালির চাল দেখা যাচ্ছে। এই বাড়িতে

তার বোন থাকে। এতদিন ছিল এখানে।

আজ তার একটু অবাক লাগে। একটু দুঃখ তাকে ছোঁয়। তারপর তার মনে পড়ে যায় মায়মুনাবুড়ির বিবরণ। 'সেই চাঁপা গাছ নাতনি পুঁতে দিলে নিজের বাড়িতে।' স্বর্ণচাঁপার চারাটা এই বাড়ির ভেতর আছে। দেখতে ইচ্ছে করে ছোটকুর।

লুঙি-পাঞ্জাবি পরা এক প্রবীণ মানুষ মুখে ঘন কাঁচাপাকা দাড়ি, চেহারা দেখে 'মিয়া' বলেই মনে হয় ছোটকুর, এগিয়ে এসে বলেন, চেনা-চেনা লাগে বাবাকে?

ছোটকু বলে, সানু আমার দুলাভাই!

ও বাপ! তুমি হাশিম মীরের ছেলে? আমি তোমাদের লতায়-পাতায় সম্পর্কে চাচা হই গো! আমি মীর ফজলে হক। ফজল মীর বললেই তোমার আব্বা সাহেব চিনবেন। এস, এস! বড্ড রোদ!

সানু—মানে, দুলাভাই নেই দেখছি!

সানুর তো তোমাদের ওখানেই স্কুলে থাকার কথা।

স্কুলে যায়নি।

তা হলে বোধ করি ঘাটবাজারের ওদিকে কোনও বন্ধুবান্ধবের কাছে আড্ডা দিচ্ছে। এখনই এসে যাবে। তুমি আমার গরিবখানায় এস বাপ!

না চাচাজি! আমি ঘাটবাজার হয়ে যাচ্ছি। সানু এলে বলবেন ছোটকু—দানিয়েল হোসেন এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অবশ্যি—

ছোটকু জিপে উঠে স্টার্ট দেয়। ব্যাক করে মোরাম রাস্তার দিকে চলে। ফজল মীর জিপের বাঁদিক ঘেঁষে হন্তদন্ত আসতে আসতে চাপাগলায় বলেন, দুটো কথা আছে বাপ! লতায়-পাতায় সম্পর্ক। না বললে ভবিষ্যতে যদি কিছু ঘটে যায়, হাশিম মীর বলবে ফজলভাই থাকতে এমন হল?

মোরাম রাস্তায় পৌঁছে ছোটকু বলে, বলুন!

এভাবে বলা যায়? তুমি দুদণ্ড আমার ঘরে বসে সরবত-পানি খেলে পরে বলতাম। ফজল মীর ছেলেমেয়েদের ভিড়কে ধমক দেন। বাবার কালে জিপ-গাড়ি দেখিসনি? যা সব! ভাগ! ভাগ!

ছোটকু বলে, আপনি গাড়িতে উঠুন চাচাজি! নজরুলের স্ট্যাচুর কাছে নামিয়ে দেব।

ফজল মীর জিপের সামনে দিয়ে ঘুরে ডানদিকে ওঠেন। চলো! বলছি! দাদাপীরের দরগা পেরিয়ে তবে কথা হবে।

পীরের দরগার পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি বলেন, ওই হল মবিন খোন্দকারের বাড়ি। কাল এশার নামাজের পর তার দফন-কাফন হল। বাড়িটা চিনে রাখো বাপ! বলছি।

ছোটকু আস্তে ড্রাইভ করছিল। ফজল মীর বলেন, দোষ সানুর নয়। তবে ভালকে মন্দ করতে কতক্ষণ লাগে? খোন্দকারের ছোট মেয়ে রুবিকে সানু পড়াত। তারপর নিশ্চয় কিছু নজরে এসেছিল, তা না হলে হঠাৎ সানুকে ছাড়িয়ে দেবে কেন? মেয়েটার ক্যারেক্টার বরাবরই ভাল ছিল না। ফার্স্ট হত। মাথা ছিল। সব ঠিক আছে। কিন্তু খান্দানি মিয়াঁবাড়ির মেয়ে টো টো করে পাড়া বেড়ায়। স্কুল যাবার নাম করে কোথায় কার সঙ্গে—তো যাক গে সে সব কথা। আমি সম্পর্কে সানুর চাচা হই। বাড়ির পাশে বাড়ি। প্রায়ই কানে আসে, তোমার বোনের সঙ্গে সানুর খিটিমিটি লেগেই আছে। ক'দিন আগে তোমার চাচি বললেন, চাঁপাফুলের চারা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে।

ছোটকু তাকায়। আস্তে বলে, চাঁপাফুলের চারা?

হ্যাঁ। খবর তো চাপা থাকে না বাপ! হাওয়ার আগে ভেসে যায়। খোন্দকারের মরণরোগ। সে আছে টাউনের নার্সিং হোমে। এদিকে তার মেয়ে সানুর কাছে চাঁপাফুলের চারার জন্য বায়না ধরেছে। বাবা দানিয়েল হোসেন! ঘিয়ের পাশে আগুন। ঘি গলে যাবে না? বলো? না—সানুর দোষ নেই। তবে ওই যে বললাম, ভালকে খারাপ করতে কতক্ষণ? ফজল মীর দম নিয়ে বলেন, পরশু মগরেবের নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরলাম। ফিরেই শুনি, তোমার চাচি বলছেন, সানু হাশিম মীরের মেয়েকে মারধর করেছে। ছাদের ঘর থেকে তোমার চাচি সব শুনেছে। মেয়েটার কান্নাকাটি, চ্যাঁচামেচি—আর কী বলব? খোন্দকার মরে গেল। এখন রুবি স্বাধীন। ওর মামুজি ফজু মিয়াঁ তো বাউণ্ডুলে। আজ এখানে আছে, কাল অন্য জায়গায়। খোন্দকারের বউও রুগি মানুষ। মেয়েটাকে শাসন করবে কে? সানু পাকেচক্রে শয়তানি হারামজাদির ফাঁদে পড়েছে—এই হল আসল কথা।

ছোটকু জিপ থামিয়ে বলে, ঠিক আছে। আমি চলি।

ফজল মীর নেমে গিয়ে বলেন, প্রাইভেটে বললাম। আমার নাম কোরো না যেন বাপ! দিনকাল খারাপ। দলাদলি খুনোখুনি চলছে চারদিকে। খোন্দকারের মেয়ের হাতে গুণ্ডাবদমাস থাকলেও থাকতে পারে। তোমরা আমার নিজের লোক বলেই সাবধান করে দিলাম। বোনকে আর এখানে পাঠিও না। কখন রাগের বশে—বুঝলে না? খোন্দকারের মেয়ে তোমার বোনকে সুখে থাকতে দেবে না।

আচ্ছা চাচাজি! চলি!

যা বললাম, এ আমার একার কথা নয়, বাপ! সারা গ্রাম জানে। এমন কি, হিন্দুপাড়া, ঘাটবাজার, টাউনশিপ—সবখানে তুমি শুনতে পাবে। চাঁপা-ফুলের বাস ছুটেছে মানিক!

ফজল মীর খুব হাসেন। ছোটকু জিপ ঘুরিয়ে রেলব্রিজের তলা দিয়ে

এগিয়ে যায়। তারপর আর একটা মোরাম রাস্তা ধরে শাহজাদপুরের দিকে ছুটে চলে। লাল ধুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘাসে, ধানের পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে। শাহজাদপুরের পাশে চওড়া পিচ রাস্তায় পেঁছে সে জিপের গতি বাড়ায়।…

সেদিন ইটখোলা থেকে বাড়ি ফিরে ছোটকু কাকেও ফজল মীরের কথা বলেনি। আগে সানুর সঙ্গে কথা বলতে চায় সে।

পরদিন সে ইটখোলায় যাবার সময় আবার স্কুলে গেল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, সানোয়ার আলি একটা ছেলেকে দিয়ে মেডিকেল লিভের অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছে—উইদ এ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট। বলছিলাম না? শরীর খারাপ না হলে সানোয়ার কখনও কামাই করে না।

সেদিনই ছোটকু ইটখোলায় গিয়ে শুনল, কাঁটালিয়াঘাট থেকে দু দফায় একটা ট্রাক পাঁচ-পাঁচ করে দশ হাজার একনম্বর ইট নামিয়ে দিয়ে গেছে। ছোটকু শক্ত হয়ে গেল। সিগারেট ধরিয়ে ইটের পাঁজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। ম্যানেজার মোহনবাবু এসে বললেন, আপনার জামাইবাবু এই চিঠি দিয়ে ইট ফেরত পাঠিয়েছেন। খামের মুখ আঁটা দেখে খুলিনি। ট্রাকের কুলিরা বলল, আপনার বাবা নাকি জামাইবাবুকে বলে এসেছিলেন, স্পেশাল একনম্বর ইট পাঠাবেন। এগুলো বেচে দিতে হবে।

ছোটকু শুধু বলে, হুঁ। তারপর খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে। সানু লিখেছে,

প্রিয় ছোটকু,

ক্ষমা কোরো। আমি আর কারও কাছে ঋণী থাকতে চাই না। প্রীতিসহ—

সানু…

ফজু মিয়াঁ! তুমি একটু বসো। আগে এদের বিদায় করি। বলে প্রমথনাথ হাঁকেন, কানুহরি! ও কানু!

মুহুরি কানুহরি সাড়া দেয়, আজ্ঞে!

ভেতরে গিয়ে বলো, ফজু মিঁয়ার জন্য এক কাপ চা পাঠিয়ে দেবে।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, না প্রমথ! চা-ফা খাবো না। আমি বসছি। তুমি কাজ সেরে নাও।

প্রমথনাথ টেবিল থেকে সেদিনকার খবরের কাগজ ছুড়ে দিয়ে বলেন, তা হলে কাগজ পড়ে টাইম কিল করো!

ফয়েজুদ্দিন গায়ে সাপ পড়েছে এমন ভঙ্গি করেন। তক্তাপোশের গদিতে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন তিনি। কাগজটা গদির অন্যপ্রান্তে ছুড়ে ফেলে বলেন, তুমি

আমার সর্বনাশের তালে আছ দেখছি। জিনিসটা বিষাক্ত ভাইরাস।

সে কী! তুমি কাগজ পড়ো না?

আমার মাথা খারাপ? কামরূপেতে কাক মলো, কাশীধামে হাহাকার করা পোষায় না। যত সব উদ্ভুটে কাণ্ড-কারখানা। বুঝলে প্রমথ! মানুষের সর্বনাশ করতে এই জিনিসটার জুড়ি নেই।

প্রমথনাথ হাসতে হাসতে সামনের চেয়ারে বসা মক্কেলের দিকে তাকিয়ে সহসা গম্ভীর হন। এই গাম্ভীর্য একজন আইনজীবীর। ভোর ছটার ট্রেনে টাউনের চেম্বারে গিয়ে বসা, তারপর কোর্ট-বার লাইব্রেরিতে দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি ফেরা এবং অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে ফের লোকাল চেম্বারে লোকাল মক্কেলদের নিয়ে রাত দশটা অব্দি কাটানো—এই তাঁর রুটিনবাঁধা জীবন। তাঁর দুরকম কণ্ঠস্বর আছে। সামনের চেয়ারে বসা মক্কেলের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে, হাত তিন-চার তফাতে সোফা আর তক্তাপোশে বসে থাকা মক্কেলরা শুনতে পায় না। তরুণ বয়সে ফিমেল রোলে দুর্দান্ত অভিনয় করতেন প্রমথনাথ। সেই কণ্ঠস্বর এখনও আছে। ওটা সামনের মক্কেলের সঙ্গে আইনি আলাপে ব্যবহার করেন।

ফয়েজুদ্দিনের অভ্যাস মস্ত গোঁফে তা দিয়ে সময় কাটানো। দুদিন দাড়ি চাঁছা হয়নি। খোঁচা-খোঁচা বেরিয়ে আছে। পরনের চিরাচরিত অগোছালো প্যাণ্টশার্টও ঈষৎ ময়লা হয়ে গেছে। ভগ্নীপতি মবিন খোন্দকারের মৃত্যু, তারপর কয়েকদিনের নানাধরনের ধকল তাঁকে ক্লান্ত করেছিল। নিজেকে বলেন উড়ো পাখি। এখন সেই পাখির পা আটকে গেছে।

মক্কেলদের বিদায় দিতে রাত সাড়ে নটা বেজে গেল। তারপর প্রমথনাথ তাঁর লোকাল মুহুরি কানুহরিকে ছুটি দিয়ে ভেতর থেকে দরজা এঁটে দিলেন। এস হে ফজু মিয়াঁ।

ফয়েজুদ্দিন সামনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

আইনজীবী ব্রিফকেস খুলে একটা বড় খাম বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, 'হেবানামা' মোহামেডান ল-র শক্ত ঘুঁটি। আমার জুনিয়র মফেজুদ্দিন, তাছাড়া আরও দুজন মোহামেডান ল-এক্সপার্টের সঙ্গে ডিসকাস করেছি। খোন্দকার গতবছর কাদের বখ্শ্ সাহেবের মতো ঝানু অ্যাডভোকেটের পরামর্শে এই হেবানামা করে গেছে। কাদের বখ্শ্ বেঁচে নেই। তাতে কী? মুসলিম পারসোনাল ল-এর যে অংশ তোমাদের কোরানিক বেসিসে দাঁড়িয়ে আছে, এই ডিড তার আওতায় পড়ে।

আমি আইনকানুন বুঝি না হে! খুলে বলো, আমার ভগ্নীপতির প্রপার্টি কে পাচ্ছে?

আইনজীবী হাসেন। মুসলমানের বাচ্চা হয়ে 'হেবানামা' বোঝো না?

গিফ্‌ট্‌ টু ওয়াইফ। দেখলাম বসতবাটি ডোবাপুকুর নিয়ে পনের কাঠা আর ধানী জমি সাত বিঘে দু কাঠা এই স্থাবর সম্পত্তি প্লাস অস্থাবর যা কিছু আছে, সবটাই খোন্দ্‌কার তাঁর ওয়াইফকে গিফ্‌ট ডিডে দিয়ে গেছেন। রেজিস্টার্ড ডিড। এখন ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে সেভিংস অ্যাকাউণ্টের টাকাকড়ি তোলার জন্য তোমার বোনকে একটা সাকসেসন সার্টিফিকেট নিতে হবে। সে কিছু না। হেবানামার কপি দাখিল করলেই পেয়ে যাবে। আমি করে দেব'খন।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, আমার বড় ভাগনি আফ্‌সানা—মানে ছবি, প্রপার্টির শেয়ার চাইছে। তার হাজব্যান্ড্‌ সাব রেজিস্ট্রার। সে চলে গেছে ওয়েস্ট দিনাজপুরে তার কাজের জায়গায়। ছবি তার বাচ্চাকে নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। তার মা বলছে, তোর বিয়েতে তিনবিঘে জমি বেচতে হয়েছিল। লাখ টাকা খরচ হয়েছে। রুবির বিয়েতে আবার মোটা টাকা খরচ হবে। তারপর আমার কী হবে? ছবি কান করছে না।

ছবি প্রপার্টি আইনত পাবে না। তার মা যদি খুশি মনে কিছু দেয়, তা হলে আলাদা কথা।

আমার বোনের মৃত্যুর পর কে প্রপার্টি পাবে?

সে খুব ভজকট ব্যাপার। ছেলে নেই যে। তাই তুমিও একটা শেয়ার দাবি করতে পারো। তবে 'হেবানামা' আমাদের হিন্দু প্রপার্টি অ্যাক্টের উইলের চেয়ে শক্ত জিনিস। আমাদের উইল তো কোর্টে প্রোবেট করাতে হয়। হেবানামায় তার দরকারই হয় না। কারণ তোমাদের পার্সোনাল ল পার্লামেন্টে পাস করে কোডিফায়েড হয়নি। কাস্টমারি ল। বড় ভাগনিকে বুঝিয়ে বলো সে কথা।

বুঝতে না চাইলে কী করে বোঝাব? গ্রাজুয়েট মেয়ে। কিন্তু ছোট বোনের বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বী।

তোমার ছোট ভাগনি কী বলছে?

ফয়েজুদ্দিন তাঁর বিশেষ অট্টহাসি হেসে বলেন, ছবি তার মায়ের সঙ্গে লাগলে রুবি তার ঘরে ঢুকে জোরে টিভি চালিয়ে দেয়। নয়তো রেকর্ড প্লেয়ার বাজায়। আমার অবাক লাগছে প্রমথ! বাবা অন্ত প্রাণ মেয়ে ছিল রুবি। বাবার মৃত্যুর পর আশ্চর্য শক্ত হয়ে গেছে। বললে বিশ্বাস করবে না, এক-ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলেনি!

একটু পরে প্রমথনাথ বলেন, এটা কিন্তু ভাল ঠেকছে না ফজু মিয়াঁ! এটা একধরনের অ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার। অবশ্যি খুকুর কাছে শুনেছি, বরাবর নাকি একটু হুইমজিক্যাল টাইপ ছিল। কিন্তু না—ভবিষ্যতে একটা সাইকো-লজিক্যাল রিপারকাশান ঘটতে পারে। এটা ঠিক নয়। মোটেও

ঠিক নয়।

মেরে কাঁদাব নাকি হে? ফয়েজুদ্দিন হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ান। হেবানামা ভর্তি খামটা হাতে নিয়ে ফের বলেন, কী একটা বইতে পড়েছিলাম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাপ। এতদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার মতো উড়ো পাখি ফাঁদে পড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

প্রমথনাথ বিদায় দিতে রাস্তায় নামেন। আস্তে বলেন, হেবানামা এমন ডিড, তা রেজিস্ট্রি না করলেও একই থেকে যায়। মোহামেডান ল-এক্সপার্ট রায়হান সাহেব বলছিলেন, কাগজে-কলমে নয়, শুধু জনা তিনেক সাক্ষীর সামনে মুখে উচ্চারণ করলেও হেবানামা কার্যকর হয়ে যায়। ইসলামিক স্টেটে নাকি এমন বিধানও আছে, কোনও লোক জেস্চার পোস্চারে, হাবেভাবেও যদি জানিয়ে দেয়, তার প্রপার্টি তার ওয়াইফকে দিয়ে দিল, তা হলে আর তা খন্ডানোর সাধ্য নেই কারও। কেন? আমাদের এখানেও একটা কেস হয়েছিল। শুনে যাও।

ফয়েজুদ্দিনকে দাঁড়াতে হল।

শেখপাড়ায় কানিকুড়ু শেখ নামে একটা লোক ছিল। একদিন ব্যাটাচ্ছেলের কী মতি হল, লোক ডেকে মুখের কথায় বিবিকে সব প্রপার্টি 'হেবা' করে দিয়েছিল। তার বছর দু-তিন পরে রাগের বশে বউকে মারধর করেছিল। ছেলেরা তখন লায়েক হয়েছে। কানিকুড়ুকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। কানিকুড়ু মামলায় হেরে মনের দুঃখে ফকির নিল। গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখতাম, পরনে কালো আলখাল্লা, গলায় রঙবেরঙের পাথরের মালা আর হাতে মস্তবড় এক চিমটে নিয়ে বসে আছে। ধুনির আগুনে গাঁজার কলকেয় আগুন দিয়ে—প্রমথনাথ হেসে ওঠেন। আজকাল আর দেখি না। কোথায় চলে গেছে, নাকি মারা পড়েছে। ট্র্যাজিক ব্যাপার।

চলি প্রমথ। আবার হয়তো আসতে হবে।

এসো। আমি তো আছি। চিন্তা কোরো না।···

ফয়েজুদ্দিন বাবুপাড়ার ঘিঞ্জি গলি রাস্তায় হেঁটে যান। রাস্তা ঢালু হতে হতে ঘাটবাজারের সমতলে নেমে গেছে। ঘাটবাজারে আলো ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। রাত দশটায় দোকানপাট বন্ধ। শুধু চায়ের দোকান আর ভিডিও পার্লারে মানুষজনের ভিড়। ফয়েজুদ্দিনের পাশ কাটিয়ে সাইকেলে কেউ যাচ্ছিল। হঠাৎ সাইকেল থামিয়ে সে বলে, মামুজি!

আরে সানু যে! এত রাতে কোথায় ছিলি বাপ?

আপনার ভানু-ভারতীর কাছে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

আমার কী রে? আমি ওদের কে?

সানু সাইকেল থেকে নামে। ওরা বলছিল মামুজি চলে গেছেন নাকি?

বললাম আছেন। ভারতী দুঃখ করছিল, মামুজি আছেন। অথচ আসেন না।

যাব কী করে? পায়ে শেকল পড়েছে। ডানা ঝাপটাচ্ছি। ছবিকে নিয়ে ঝামেলা চলেছে।

ছবি আছে নাকি এখনও?

মাটি কামড়ে পড়ে আছে। প্রপার্টির ভাগ নিয়ে তবে যাবে। এদিকে দুলাভাই সব প্রপার্টি দিয়ে গেছেন তার মাকে। প্রমথ উকিলের কাছ থেকে আসছি। প্রমথ বলল, 'হেবানামা' মানে গিফ্‌ট্‌ টু দি ওয়াইফ। কোরানিক ল। কোনও কোর্টের সাধ্য নেই, তা খন্ডায়।

সানু পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, ছবি এমন করছে কেন? আফটার অল এখন তার আম্মার মানসিক অবস্থা তার বোঝা উচিত।

বোঝে না। তোকে একদিন বলেছিলাম না? মুসলমানের রক্তে কী একটা আছে। সবটাতেই এস্‌টিমিস্ট্‌। হিন্দুরা বলে, মুসলমানরা ধর্মের নামে নাকি—দূর! দূর! ধর্ম নিয়েই মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। দুলাভাই হেবানামা করে গেছেন। এবার দেখবি, এই কোরানিক লকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ছবি তার মায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে। সাপোর্টারও পেয়ে যাবে। কোন মৌলবিকে দশ-বিশ টাকা দিয়ে একটা ফতোয়া জোগাড় করলেই হল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর সানু বলে, ছবি রুবির সঙ্গেও ঝগড়া করছে নাকি?

করলে তুই ঠেকাবি নাকি রে?

ওঃ মামুজি!

এমন টোনে বলছিস যেন—যাকগে মরুকগে! তোর খবর কী বল?

সানু আস্তে বলে, স্কুলে মেডিক্যাল লিভের অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছি। আর—চাপা শ্বাস ছেড়ে সে ফের বলে, শ্বশুরসাহেবের দশহাজার ইট ফেরত পাঠিয়েছি। রিজুর টিভি, ভি সি পি, রেকর্ড প্লেয়ার, আলমারি যা কিছু আছে, কাল সকালে পাঠিয়ে দেব। আগরওয়ালজির ট্রান্সপোর্টে ম্যাটাডোর ভাড়া করা আছে।

ফয়েজুদ্দিন থমকে দাঁড়ালেন। এই হল সেই মুসলমানি রক্ত! হারামজাদা! এই মুসলমানি রক্ত তখন কোথায় ছিল? কষ্ট করে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারিসনি? আমি বুড়ির চিঠিতে রুবির স্কুল পালানো আর পড়াশুনো বন্ধের খবর পেয়েই বুঝেছিলাম কী হয়েছে। এসে দেখি, তুই হাশিম মীরের পাল্লায় পড়ে গেছিস! আমি কি ছোটলোকের বাচ্চা, না ইতর যে তোকে তখন বলব মীরের বেটিকে তালাক দে? কী অধিকারে বলব? কেন বলব?

খামোকা একটা মেয়ের লাইফ বরবাদ করব আমার ভাগনির লাইফের জন্য ?

প্লিজ মামুজি ! ওসব কথা থাক।

একটু পরে ফয়েজুদ্দিন জোরে শ্বাস ছেড়ে বলেন, তুই কাজটা ঠিক করিসনি সানু ! পানিতে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদে নেমেছিস। হাশিম মীর সাংঘাতিক লোক। তার পয়সা আর পলিটিক্যাল পাওয়ার যত, তত মাস্‌ল্‌ পাওয়ার।

আমি মরিয়া হয়ে গেছি, মামুজি ! অকারণ একটা মিথ্যা স্ক্যান্ডাল কেন সহ্য করব বলুন ?

বুঝলাম। কিন্তু তোর ডিসিশনটা কী ?

ডিসিশন নিতে আমার কোনওদিনই দেরি হয় না। নিয়ে ফেলেছি। মীরের মেয়েকে আমি—

সর্বনাশ ! এরপর যে কথাটা তুই উচ্চারণ করবি আমি জানি। না সানু ! এটা ঠিক হবে না। তোর শ্বশুরের গ্রামে তোর স্কুলের চাকরি। ওরা সব পারে।

চাকরি আমি ছেড়ে দেব।

তারপর ? আবার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরবি !

কয়েকটা টিউশনি পেলেই চলে যাবে।

তোর মাথাখারাপ ? এই কাঁটলেঘাটে কটা টিউশনি পাবি ? নিবারণ রায়ের দুটো ছেলেকে পড়িয়ে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেতিস—তুই বলছিলি !

দেখা যাক।

ফয়েজুদ্দিন তাঁর প্রকাণ্ড হাতের ভারী থাবা কাঁধে রাখেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলেন, আমার বোনের মাথার ওপর কেউ নেই। সাত বিঘে দু কাটা ধানী জমিতে লাঙল ভাড়া করে চাষ করাতেন দুলাভাই। মাহিন্দার কালো বলছিল, এক বিঘেতে একবার লাঙলের দর পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা। সারের খরচ, সেচের খরচ, নিড়েন থেকে কাটাই-মাড়াই পর্যন্ত খরচ করে দুদফায় যা ধান পাওয়া যায়, তা মা-মেয়ের খাওয়াপরার জন্য হয়তো যথেষ্ট। কিন্তু এখন আর দুলাভাই বেঁচে নেই। কালো এতদিন তাঁর ভয়ে-ভক্তিতে চলেছে। এবার সে কোন মূর্তি ধরবে বলা কঠিন। এখন কথা হল—

তিনি চুপ করে যান হঠাৎ। সানু কোনও প্রশ্ন করে না।

সুলতানি মসজিদের ধ্বংসস্তূপে গজিয়ে ওঠা বটতলায় পৌঁছে ফয়েজুদ্দিন বলেন, বুড়ি বলছিল, সানু একবার এল না। আয়, একটু দেখা করে যা।

সানু দ্বিধায় পড়ে যায়। বলে, আজ রাত হয়ে গেছে মামুজি ! বাড়িতে তালা আটকানো আছে।

দু মিনিটের জন্য একটু দেখা করে আসবি। বাড়িতে চুরি হলে এতক্ষণে

হয়ে গেছে। আর চুরি যদি হয়, তা হাশিম মীরের মেয়ের জিনিস। ফয়েজুদ্দিন হেসে ওঠেন।

তবু সানু ইতস্তত করছিল। রেজিনার দাদা দানিয়েল হোসেন জিপ হাঁকিয়ে তার খোঁজে এসেছিল। সে কলেজে সানুর সহপাঠী এবং বন্ধু ছিল। কুতুবপুরের মীর পরিবারে সে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু ফজল মীর নাকি তার জিপে উঠেছিলেন। এই প্রতিবেশী এবং আত্মীয় ভদ্রলোক সানুর বাবার সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতেন। সানুর সঙ্গেও বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধ আছে। তিনি দানিয়েলকে তার সম্পর্কে কিছু বলেছেন সম্ভবত। তা না হলে দানিয়েল তার চিঠির প্রতিক্রিয়ায় এমন চুপ করে যেত না। আবার ছুটে আসত কিংবা কারও হাতে লম্বা চিঠি পাঠাত। এখন সানুর মনে হচ্ছিল, মবিন খোন্দকারের বাড়ির দেউড়ি থেকে যেটুকু আলো ছড়াচ্ছে, তার বাইরে যেন অন্ধকারে ফজল মীর ধূর্ত চোখে তাকিয়ে আছেন।

সদর দরজায় কড়া নাড়ছিলেন ফয়েজুদ্দিন। একটু দেরি করে দরজা খুলল সামিরুন। ফয়েজুদ্দিন বলেন, কী রে? ঘুমিয়ে পড়োছিলি নাকি?

না মামুজি! টিভিতে একখানা ভাল বই হচ্ছে। বলেই কালোর ভাইঝি সানুকে দেখতে পায়। অমনই সে একটু ফুঁসে ওঠে। সার! সেদিন আপনাদের বাড়ি যেয়ে খামোকা গালমন্দ খেলাম। পায় তো কেটে খায় এমন চোখ মুখ করে তেড়ে এল। আমার কী দোষ? ছোটবুবু পাঠাল। তাই—

ফয়েজুদ্দিন বলেন, লে হালুয়া! এ ছুঁড়ি আবার সানুকে সার বলে কেন?

সামিরুন দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ওঠে। তারপর উধাও হয়ে যায়। উঠোনে সাইকেল দাঁড় করিয়ে সানু বারান্দার দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে তীব্র ঝাঁঝালো হাসনুহেনার সেই সৌরভ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে মুখ ঘুরিয়ে জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিলের দিকে হাসনুহেনার ঝাড়টিকে খোঁজে। ওখানে আলোর সীমান্তের ওধারে সবই অস্পষ্ট আর একাকার। কেন যেন তার মনে হয়, ওইখানে রেবেকা আছে।

ফয়েজুদ্দিন ডাকেন, বুড়ি! এই দ্যাখ, কে এসেছে!

রোকেয়া বেগম বারান্দার ডাইনিং টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। অন্য চেয়ারে তাঁর বড় মেয়ে ছবি। মাঝখান থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা অর্ধবৃত্তাকার খোলা চত্বরে উঠে ফয়েজুদ্দিন সানুকে ডাকেন।

ছবি গম্ভীর মুখে বলে, আম্মি আপনার জন্য খাচ্ছেন না। এতক্ষণ দেরি করে?

সানু এসেছে।

দেখছি তো। আসছে না কেন সানুভাই?

সানু অগত্যা বলে, তুমি ডাকছ না, তাই।

ছবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তুমি কি মেহমান নাকি যে ডাকতে হবে?

রোকেয়া অভিমান করে বলেন, এমন একটা ঝড়পানি গেল। ভাবলাম সানু এসে মাথার কাছে দাঁড়াবে। কী বলব বাবা? অ্যাদ্দিনে এসেছ চাচিজির সাদা থানের কাপড় দেখতে—

তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। সানু গিয়ে তাঁর পায়ে কদমবুসি করে। আস্তে বলে, আমি বাড়ি ঢুকিনি চাচিজি! কিন্তু বাইরে ছিলাম। মামুজি জানেন।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, বাড়ি ভর্তি আউরত। বেগানা মরদ ঢোকে কী করে? সব বিদায় হয়েছে। এবার এসেছে।

বসো বাবা! রোকেয়া চোখের জল মোছেন সাদা থানের আঁচলে। আমার পাশে বসো।

সানু অবাক চোখে দেখছিল রোকেয়াকে। বিধবার পোশাকে সহসা এক মহিলা খুব দূরের আর অচেনা মানুষ হয়ে গেছেন। কানে সেই পাথরবসানো ফুল নেই। হাতে চুড়ি আর কাঁকন নেই। মায়ের কথা মনে পড়ে যায় সানুর। সেদিন গোরস্থানে কবরের তলায় কাফনমোড়া খোন্দ্‌কারকে শুইয়ে দিয়ে প্রথা অনুসারে স্বজনদের একবার কাফন সরিয়ে মুখ দেখানো হয়েছিল। তারপর আবার কাফনে মুখ ঢাকা দিয়ে পশ্চিম দিকে কাত করে দেওয়া হয়েছিল। তবু মৃত্যু সম্পর্কে সানুর নতুন কোনও বোধ জাগেনি। এই মুহূর্তে সাদা থান কাফন হয়ে ফিরে এল। মৃত্যুর রঙ কি সাদা? সে আজীবন ভেবে এসেছে মৃত্যুর রঙ কালো। কিন্তু বৈধব্যের চিহ্ন সাদা থান সাদা রঙ দিয়ে বোঝাতে চায় মৃত্যুকে। পর-পর এই দুবার মৃত্যু নিজেকে দেখাল, সে সাদা। জীবন যেন ব্ল্যাকবোর্ড, যার ওপর মৃত্যু চকের সাদা দাগের মতো ফুটে ওঠে, সানুর এরকম উপমা মাথায় এল, কেন না সে একজন 'সার', সত্যিকার 'সার'।

রেবেকার ঘর থেকে টি ভি-র শব্দ ভেসে আসছিল। ছবি এখন একটু তফাতে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সানু তার দিকে তাকায়। বেশ গায়ে-গতরে হয়েছে ছবি। বোনের চেয়ে উজ্জ্বল ফর্সা আর রূপসী ছিল সে। এখন তার গৃহিণীর রূপ, যা এমনই বৈষয়িক যে আর তাকে সানুর অপার্থিব কিছু মনে হয় না। ঈষৎ সঙ্কোচে মনে মনে আড়ষ্ট হয় সানু। একদা ছবির প্রতিই তার গোপন আকর্ষণ ছিল। ছবির বোনকে পড়াতে এসে সে ছবিকেই খুঁজত এবং যতক্ষণ থাকত, তার মনের একখানে ছবি থাকত প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে। সেই প্রতিমা তুলে নিয়ে গিয়েছিল এক সাব-রেজিস্ট্রার। তারপর কি সেই শূন্য বেদিতে রেবেকা এসে দাঁড়িয়ে ছিল? কে জানে!

ছবির চোখে চোখ পড়ার পর সানু বলে, ভাল আছ ছবি?

যেমন রেখেছ তোমরা !

ফয়েজুদ্দিন ভুরু কুঁচকে একটু হাসেন। কী কথার কী জবাব! হ্যাঁ রে! আজ এখনও রাত জাগছিস যে? বিচ্ছু মেয়েটা আজ তোকে জাগতে দিয়েছে দেখছি।

ছবি চুপ করে থাকে। সানু বলে, আমি উঠি মামুজি! চাচিজি! বাড়িতে কেউ নেই। উঠি।

রোকেয়া বলেন, নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছি বাবা! তার মধ্যে কানে এল—হ্যাঁ, তোমাদের পাড়ার নুরুন্নাহার বলছিল! বউ-বিবি নাকি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে? রাঁধা-বাড়ার কষ্ট! পুরুষমানুষ হাত পুড়িয়ে রাঁধা-বাড়া করবে, না মাস্টারি করবে?

সানু উঠে দাঁড়ায়। ফয়েজুদ্দিন বলেন, চল! দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসি। কালোর ভাইঝি টি ভি দেখছে।

সদর দরজায় গিয়ে সানু একটু হাসে। ছবি তেমনই আছে মামুজি! একই রকম শার্প!

শার্প কী বলছিস! আগুনের তলোয়ার হয়ে গেছে। উহুঁ, ভুল বললাম। আগুনের তলোয়ারে পানি ঢাললে নিভে যায়। ইলেকট্রিক সোর্ড!

ফয়েজুদ্দিন দরজার ফাঁকে মুখ বের করে ফের বলেন, কাল সকালে কোথায় থাকবি? বাড়িতে, নাকি অন্য কোথাও?

সানু সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে বলে, নটা অব্দি বাড়িতে আছি। ম্যাটাডোর আসবে। রিজুর জিনিসপত্র বোঝাই হবে।

ফয়েজুদ্দিন রাস্তায় নেমে এলেন। একটু দেরি করলেই পারতিস। আমার মনে হচ্ছে, এটা দুলাভাইয়ের মত রং ডিসিশন! রুবির প্রাইভেট টিউশনি ছাড়ানো রং ডিসিশন, সে কথা নিজের মুখে তোর সামনে স্বীকার করেছিলেন কি না বল? লেট দেম টেক দেয়ার ওন ডিসিশন, সানু! তুই কেন আগ বাড়িয়ে—

মামুজি! এ আমার সম্মানের প্রশ্ন।

তুই জানিস, আমি চিরদিন স্পষ্টভাষী। হাশিম মীরকে বলার সুযোগ দিচ্ছিস, স্ক্যান্ডাল মিথ্যে রটনা নয়, সত্য। মাঝখান থেকে আমার ভাগনি অকারণে দোষী থেকে যাবে। তুই পুরুষমানুষ। তোর কী? রুবির দিকটা চিন্তা কর!

সানু আস্তে বলে, লোকে মিথ্যাকে সত্যি ভাবতে পারে। কিন্তু সত্যি যা, তা সত্যি। আমি তো রিজুকে তাড়িয়ে দিইনি! সে, নিজের ইচ্ছায় গেছে। তা ছাড়া মামুজি! আমার জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করতে চাই। বিড়ি বেঁধে খাব। নয় তো রিকশা চালাব।

নাহ্। সে-রাতে তোকে মুসলিমকুলকলঙ্ক বলেছিলাম। আমারই বোঝবার ভুল। তুই হাড়ে-হাড়ে মুসলমানের বাচ্চা! হয় এস্পার, নয় তো ওস্পার! হয় কাফের মেরে গাজি হও, নয়তো নিজে মরে শহিদ হও। কিন্তু নিজে শহিদ হতে গিয়ে অন্য একটা মেয়েকে—ফয়েজুদ্দিন আত্মসম্বরণ করেন। ঠিক আছে। যা ইচ্ছে, কর! আমি তোর কে যে আমার কথা শুনে চলবি?

সানু সাইকেলের প্যাডেল থেকে পা নামায়। মামুজি! তা হলে কথাটা বলিয়ে ছাড়লেন!

কী কথা?

প্রায় দু-বছর আগে আমি রুবিকে পড়ানো বন্ধ করেছি—মানে, চাচাজিই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জানতাম না কেন হঠাৎ চাচাজি ওই ডিসিশন নিয়েছিলেন। সম্প্রতি আমি এতদিন পরে জানতে পেরেছি, রুবির সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ভেতরে-ভেতরে সারা গ্রামে স্ক্যাণ্ডাল রটেছিল। সেই স্ক্যাণ্ডাল আবার এতদিনে মাথা চাড়া দিয়েছে। তাই রিজু ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছিল। সানু শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, একটা স্বর্ণচাঁপার চারা মামুজি!

স্বর্ণচাঁপার চারা মানে?

রুবি আমাকে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে দিতে বলেছিল। তখন আপনি ছিলেন। কালীপুজোর দুদিন আগের রাতে।

হুঁ। তারপর?

কালীপুজোর আগের দিন টাউন থেকে একটা চারা আনলাম! কিন্তু সঙ্কোচ বশে চারাটা নিয়ে এ বাড়ি ঢুকতে পারিনি। আবার স্ক্যাণ্ডাল রটতে পারে। তারপর রিজু আমার অ্যাবসেন্সে চারাটা জোর করে আমার বাড়িতে পুঁতে দিল। বাকিটা আপনি রুবির কাছে জেনে নেবেন। একটু আগে সামিরুন কী বলল আপনি শুনেছেন! তাকেও জিজ্ঞেস করবেন।

লে হালুয়া! ফয়েজুদ্দিন হাসেন। দুনিয়াটা কী গোলমেলে দেখ দিকি! সামান্য নিরীহ একটা স্বর্ণচাঁপার চারা! তাই নিয়ে এত কাণ্ড! তুই তো রুবিকে কতরকম ফুলের চারা এনে দিয়েছিস।

মামুজি! সম্ভবত ফুল জিনিসটাকে মানুষ অন্যভাবে বোঝে।

ঠিক। যার যা মর্জি, সেইভাবে। কিন্তু—তাজ্জব!

চলি মামুজি! বলে সানু সাইকেলে চেপে আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায়। তারপর কিছুক্ষণ দূর থেকে দূরে অপস্রিয়মান ঘণ্টির শব্দ।

ফয়েজুদ্দিন দরজা বন্ধ করে বারান্দায় ফিরে যান। হেবানামার খামটা তাঁর হাতেই ছিল। রোকেয়া বলেন, রাত হয়েছে। খেয়ে নিন ভাইজান! সামিরুনকে বলুন। আপনার খানা রেডি আছে। এখানে এনে দিক।

ছবি শুয়ে পড়ল নাকি ?

হ্যাঁ ওর আর কী ? তখনই শুয়ে ঘুমোচ্ছে, আবার তখনই উঠে কাজিয়ার তাল করছে।

ফয়েজুদ্দিন চাপা স্বরে বলেন, হেবানামা আলমারির লকারে রাখ্। প্রমথ বলল, হেবানামা নাকচ করার সাধ্য কারও নেই। দুলাভাইয়ের স্থাবর-অস্থাবর সব প্রপার্টি তোর। এখন তুই যদি ছবিকে খুশিমনে কিছু শেয়ার দিস্ অন্য কথা!

ছবির অনেক আছে। তার বিয়েতে তিন বিঘে জমি বেচতে হয়েছিল।

ছাড়্ ওসব কথা। দুলাভাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর পোস্টাল সেভিংস মিলিয়ে মাত্র হাজার তিরিশেক টাকা আছে। সে টাকা তুলতে আবার কোর্টে সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য ছুটতে হবে।

ছবিকে বলছিলাম তোর মেয়ের জন্য সোনার হার দেব। এখন সংসারে আগুন ধরাসনে!

কী বলল ?

হার দাও বা না দাও, জামাইকে আব্বু মোটর সাইকেল দিতে চেয়েছিলেন, সে তখন নেয়নি—এখন দাও। মোটর সাইকেলের দাম কত ?

প্রায় তিন বিঘে জমির দাম!

আমার কলজে ছিঁড়ে নিয়ে যাক ছবি! বলে হেবানামা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে যান রোকেয়া।

ফয়েজুদ্দিন রেবেকার ঘরে গিয়ে উঁকি মারেন। রেবেকা বিছানায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছে। সামিরুন মেঝেয় তার নীচেই বসে আছে। ফয়েজুদ্দিন একটু কাশেন। রেবেকা পা গুটিয়ে বসে। ফয়েজুদ্দিন টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে বলেন, লে হালুয়া! বাঁদর নাকি রে? লাফ দিয়ে গাছের ডালে উঠছে। ওই! হঠাৎ পাথরে চড়ে বসল! অ্যাঁ? ঘাসে গড়াতে গড়াতে—এ কী! দুজনে দৌড়ুচ্ছে কেন ?

সামিরুন বলে, নাচগান মামুজি!

এ কী নাচগান রে? বনবাদাড় পাহাড় পর্বত নদীসমুদ্দুর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে! ও রুবি! সন্ধ্যায় মৌলবিসাহেব কোরান পড়তে এসেছিলেন তো ?

হুঁ। ফাইভ ইন্টু ফর্টি। রুপিজ টু হান্ড্রেড ওনলি। রুবি নির্বিকার মুখে বলে। আবার মাইক্রোফোন নেই বলে মুখ ভার। সব বাড়িতে নাকি মাইক্রোফোন দেয়।

তুই মৌলবিসাহেবের সামনে যাস নাকি ?

নাহ্। সামিরুন দলিজঘর খুলে গালচে পেতে দেয়। সামিরুনকে

বলেছেন! হ্যাঁ—তার ওপর চা প্লাস নাশতা। চল্লিশদিন কোরান শরিফ পড়লেই আব্বুর বেহেশতের গ্যারান্টি।

যাকগে মরুক গে! খিদে পেয়েছে। সামিরুন! বুড়ি বলল, রান্নাঘরে আমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। নিয়ে আয়। এখানে না—ডাইনিং টেবিলে বসে খাব।

রেবেকা উঠে গিয়ে টিভি বন্ধ করে বলে, ভ্যাট! বাজে ছবি।

ফয়েজুদ্দিন চোখ নাচিয়ে বলেন, দুলাভাইয়ের হেবানামা হিমালয় পর্বত! প্রমথ উকিল এক্সপার্টদের দেখিয়ে এনেছে। তোরা দুই বোন আঙুল চোষ্। সব তোর মায়ের প্রপার্টি। স্থাবর-অস্থাবর সব।

টিভি রেকর্ড প্লেয়ার দুটো রিস্টওয়াচ আমার জুতোগুলো—

আজ্ঞে না! এসব জিনিস অস্থাবর সম্পত্তি।

আমার নামে দোকানের সেলরিসিট আর ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, মামুজি!

তাই বুঝি? তাহলে এগুলো বাদ। কিন্তু এই খাট, আলনা, তোর জামাকাপড়—

জোর যার মুলুক তার মামুজি! ডোন্ট ফরগেট দ্যাট!

ঠিক বলেছিস! ওই যে কাকে যেন নিউজ পেপার ওয়ালারা—দুচ্ছাই! যাত্রা হল। সিনেমা হল পর্যন্ত। হ্যাঁ—ফুলনদেবী! তুই ফুলনদেবী সেজে বসে থাক্। বলে ফয়েজুদ্দিন তাঁর থাকার ঘরে গিয়ে পোশাক বদলান। বারান্দায় রাখা বালতির জলে হাত-পা-মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মোছেন। তারপর ডাইনিং টেবিলে যান। রোকেয়াকে দেখে বলেন, তুই আবার রাত জাগছিস কেন? শুয়ে পড়্গে। ওঃ হো! তুই তো খাসনি!

সামিরুন বলে, মাজি আপনার সঙ্গে খাবেন বলছিলেন। এই দেখুন না, মাজির খানা এনেছি।

রুবি খেয়েছে?

কখন! বড়বুবুর সঙ্গে খেল।

হুঁ। দুই বোন জোট বেঁধেছে, আমার বোনকে জবাই করবে। আমি থাকতে?

রেবেকা এসে একটা চেয়ারে বসে বলে, প্রপার্টি কার, যতক্ষণ না সে খবর আসছে, ততক্ষণ আপনার বোন কী করে খাবেন? এতক্ষণে খবর এল। তাই খাচ্ছেন।

ফয়েজুদ্দিন হেসে ফেলেন। রোকেয়া বলেন, আমার কী মা? আমার ভাইজান আছেন। যতদিন বাঁচব, দুমুঠো খেতে পাব। আব্বার সম্পত্তির এক কানাকড়ি আমিও নিইনি, ভাইজানও নেননি। বারোভূতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। এই তো সামনেই বলছি, জিজ্ঞেস কর্! আমার যেটুকু

ভাবনা, তা তোর জন্য। ছবি ঘরসংসার পেয়েছে। ছবির জন্য ভাবি না।

আমার ঘরসংসার নেই বুঝি? এইসব কী? রেবেকা তর্জনী তুলে চারদিক দেখায়। যেমন-তেমন ঘরসংসার নয়, সেন্টেড। মউমউ করছে গন্ধে। তাই না মামুজি?

ফয়েজুদ্দিন আস্তে বলেন, তোর ঘরসংসারে শুধু একটা জিনিসের ঘাটতি থেকে গেছে। একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ।

রেবেকার দুচোখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়েছিল। তারপর সে মুখ নামায়। ওই উজ্জ্বলতা কিসের, ফয়েজুদ্দিন তা বুঝতে পারলেন না। রেবেকা সহসা উঠে গেল। যাওয়ার সময় সামিরুনকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর তার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কপাটের শব্দ বেশ জোরালো ছিল।

রোকেয়া ভাত মাখছিলেন। তাঁর হাত থেমে গেল। ফয়েজুদ্দিনের দিকে তাকালেন। ভাইজান!

কী হল?

আপনি চাঁপা ফুলের কথা বললেন। ভাইজান! কথাটা বলব-বলব করে বলা হয়নি। শোকতাপ-ঝামেলা-হুলুস্থুলে। রোকেয়া ফিসফিস করে বলেন, সামিরুন অ্যাদ্দিন পরে চুপিচুপি কথাটা বলছিল। ওই হারামজাদির কি একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না? কোন আক্কেলে তুই সামিরুনকে দিয়ে চিঠি পাঠালি সানুর কাছে? আর সেই চিঠি পেয়ে হাশিম মীরের মেয়ে নাকি রুবির নামে মুখে যা আসে তাই বলে গালমন্দ দিয়ে সামিরুনকে মারতে এসেছিল।

হুঁ। ছেড়ে দে। সব মিথ্যে পেট সত্যি। খাচ্ছিস খা।

কিন্তু সানুরই বা কী আক্কেল? সে যখন রুবির সার ছিল, তখন এক কথা। এখন তার ঘরে বউ। তার বোঝা উচিত ছিল, এখন ফুলগাছের চারা কী সাহসে—

আহা! রুবি চেয়েছিল।

চেয়েছিল বলেই দিতে হবে? একবার ভাবল না আমার নিদুষী মেয়ের কাপড়ে আবার কালির ছিটে লাগবে? রুবিকে পড়ানো কেন বন্ধ করেছিলেন আপনার দুলাভাই, তাও জানে না? চাষাভুষো আতরাফের ঘরে কলঙ্ক পানির দাগ। কিন্তু খান্দানি আশরাফের ঘরে একছিটে কালির দাগ হাজার ঘষলেও ওঠে না।

বুড়ি! তুইও খাবিও না, আমাকেও খেতে দিবি না। তুই কেন ভুলে যাচ্ছিস, দুলাভাই আমাকে কোরানের কিরে খাইয়ে রুবির দায়িত্ব দিয়ে গেছেন?

রোকেয়া আবার ভাত মাখতে থাকেন। তাঁর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

বাঁ হাতে জলের গ্রাস তুলে আগে এক ঢোক জল খান। তারপর 'বিসমিল্লা' উচ্চারণ করে মুখে ভাত তোলেন। তাঁর দুচোখে বিহ্বলতা ছলছল করছিল।...

ছুটিরদিন বিকেলে প্রমথনাথ ছড়ি হাতে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যান। 'টাউনশিপ'-এর পূর্বে নিচু বাঁধের ওপর গঙ্গার সমান্তরালে বিছানো মোরাম রাস্তায় তিনি হাঁটছিলেন। আজকাল এই দৃশ্যটা তাঁর চোখে বেঁধে। রাস্তার ওধারে ঘাসে ঢাকা ঢালু খানিকটা জমিতে ইতস্তত ভাঙনরোধী গাছের চারা বর্ষার সময় পোঁতা হয়েছিল। এইসব গাছ নাকি দ্রুত বেড়ে ওঠে। জলের ধারে কোথাও-কোথাও নির্লজ্জ যুবক-যুবতী পাশাপাশি বসে প্রেম করছে। হাত বাড়িয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে কুচিকুচি করছে। প্রমথনাথ লক্ষ্য করছিলেন শ্মশানতলার বাঁক অব্দি পাঁচ জোড়া নির্লজ্জতা। দেখেই তিনি ঘাটের দিকে এগিয়ে যান। এসব কী হচ্ছে? কেউ কিছু বলে না? তাঁর পাশ দিয়ে এক ছোকরা সাইকেলের রডে একটি মেয়েকে বসিয়ে নিয়ে গেল। প্রমথনাথ ঘুরে দেখলেন, সাইকেল থেকে নেমে ওরা জলের ধারে গিয়ে বসল। সাইকেলটা ফেলে রাখল পেছনে। এটা গ্রাম, না টাউন? টাউনেও সম্ভবত এত বেশি ঘটে না। কাদের বাড়ির ছেলে-মেয়ে ওরা?

ঘাটের কাছাকাছি রক্ষাকরবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই প্রমথনাথ ফেটে পড়েন। কী হে? গঙ্গার ধারে যে বৃন্দাবনলীলা শুরু হয়েছে, চোখে পড়ে না কারও? একটু হাঁটাচলা করে শান্তি পাব, তার জো নেই! এ কী হচ্ছে বল তো?

কী হল দাদা?

ছড়ি তুলে প্রমথনাথ দেখান। ওগুলো কী?

রক্ষাকরবাবু হাসেন। ভিডিও, টিভি, সিনেমা এসবের ইমপ্যাক্ট্ দাদা! কাকে কী বলবেন? সঙ্গে 'সাটার' নিয়ে ঘোরে। কিছু বললেই বুক ঝাঁঝরা করে দেবে। হ্যাঁ—পুলিশ এসে গন্ধ শুঁকবে। কোন পার্টির গন্ধ ডেডবডির গায়ে।

ওদের বাবা-মায়ের চোখে পড়া উচিত।

কাঁটলেঘাটে আর বাবা-মা বলে কিছু নেই। ছোট সিঙ্গির মেয়ে আরতি ভকু কুনাইয়ের ছেলে সমীরের ঘর করছে। সিঙ্গিরা চুপ করে রইল। করবেটা কী বলুন? গভমেণ্ট আইন করেছে। এদিকে হরি মোড়লের ছেলে মটর সমীরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ছেলেবেলায় কুনাই কাস্ট্ ছিল অস্পৃশ্য। আপনার মনে পড়তে পারে দাদা! অস্পৃশ্যতা আইন চালু হলে কুনাইরা দল বেঁধে ভুলু পরামানিকের বাড়ি গিয়ে লম্ফঝম্ফ করে বলেছিল, ক্ষুর-কাঁচি-নরুণ বের করো। আমরা কামাব। কামাতে হল।

ভুলুকে। অথচ দেখুন, পরামানিকরা পর্যন্ত কুনাইদের বড়ি টাচ করত না। এখন তাদের ঘরে ছোট সিঙ্গির মেয়ে। প্রস! প্রস! সব প্রস হয়ে যাচ্ছে।

প্রমথনাথ শ্বাস ছাড়েন! এইজন্য মাঝে মাঝে ভাবি, বাড়িঘর বেচে গিয়ে টাউনে থাকি। নেহাত জন্মভূমির টানে পড়ে আছি হে রক্ষাকর! দুজায়গায় চেম্বার রেখে এ বয়সে ছোটাছুটিতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। এবার মায়া কাটাতে হবে।

সে-ই কথা দাদা। বাবুপাড়া ঘুরে দেখুন কী অবস্থা! যারা পেরেছে, কেটে পড়েছে। নানা জায়গায় চাকরি-বাকরি করছে। বুড়োথুড়োরা ছেলেদের কাছে গিয়ে শেল্টার নিয়েছে। নেহাত যারা আমার মত নিরুপায়, তারা পড়ে আছে মাটি কামড়ে। যাবটা কোথায়?

হুঁ। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু—

প্রমথনাথ কথা খুঁজে পান না। রক্ষাকর বলেন, আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া। শেখ পাড়ার ছৈরদ্দির ভাই রৈসদ্দি গতবছর কালীপুজোর রাতে হেলথ সেন্টারের নার্স অচলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছিল। হিন্দুস্থান, না পাকিস্তান? সেই মামলা কেঁচে গিয়েছিল কেন আপনি ভালই জানেন দাদা! বাড় বাড়তে বাড়তে ওরা এখন মাথায় চড়েছে।

আমার জামাই ঠিকই বলে। হিন্দু হিন্দুর সর্বনাশ করছে।

করছে। ছৈরদ্দির মুরুব্বি তখন মটর। মটরের মুরুব্বি টাউনের গণেশবাবু। সে অচলাকে থ্রেটন্ করেছিল, বেগড়বাই করলে চাকরি যাবে। ব্যস! অচলা পুলিশকে স্টেটমেন্ট দিল, মাতলামি করেছিল। তবে আমার গায়ে তো হাত দেয়নি। এই খবর কাগজে পর্যন্ত বেরিয়েছিল। কিছু হল?

চলি হে! বলে প্রমথনাথ ঘাটোয়ারিজির গদির দিকে এগিয়ে যান। এখনই তাসের আসর বসে গেছে। প্রমথনাথ দাঁড়িয়ে পড়েন। পুরনো দিনের কিছু স্মৃতি তাঁকে থামিয়ে দেয়।

আলম মির্জা থ্রি ক্লাবস্ হেঁকেই দেখতে পান তাঁকে। এই পেয়েছি প্রমথকে। এস প্রমথ! সেদিন পর-পর নো ট্রাম্পের ভেল্কি দেখিয়ে কেটে পড়লে হঠাৎ। আজ তো জামাই নেই বাড়িতে। আর ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও নেই।

প্রমথনাথ গদিতে ঢুকে যান।…

সাড়ে আটটায় তাসের আসর ভাঙার পর রাস্তায় নেমে মির্জা বলেন, হাবল কাজির আপত্তি নেই। আর সোলেনামা বা হাইকোর্টে ছুটেই বা কী হবে? সামনের সপ্তাহে পীরের থানে মুনিশ-মজুর লাগাব। রাজমিস্ত্রি বলা হয়ে গেছে। ইনশাল্লা! পৌষে উরস আর মেলা জমকালো হবে দেখবে। শুধু একটু ফ্যাকড়া দেখা দিয়েছে।

কিসের?

শেখপাড়া আর মোমিন পাড়ার কিছু লোক মিলে 'আহ্‌লে হাদিস' জামাত করেছিল। ওদের একটা আলাদা মসজিদ আছে। তুমি 'ফারাজি' কথাটা শুনে থাকবে! তারা গানবাজনা হারাম বলে। পীর মানে না। শুনলাম, তারা কলকাতা থেকে তাদের কমিউনিটির বড়-বড় মওলানা এনে 'বাহাস্' করতে চায়। বাহাস্ বোঝে? শাস্ত্র নিয়ে তর্ক। তারা দাদাপীরের উরস আর মেলায় বাধা দিতে চায়। আলম মির্জা হেসে ওঠেন। পারবে না বাধা দিতে। তবে বোমাবাজি হবে। দু-একটা লাশও পড়তে পারে। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম আর কী!…

প্রমথনাথ অজন্তা বুক সেন্টারের সামনে গিয়ে সানুকে দেখতে পেলেন। একটু ইতস্তত করে তিনি ডাকেন, ও সানু! একবার এদিকে এসো। দেখা হয়ে ভালই হল। তোমার কথাই ভাবছিলাম আজ।

সাইকেল গড়িয়ে সানু কাছে এসে বলে, বলুন কাকাবাবু!

প্রমথনাথ আস্তে বলেন, তোমার শ্বশুর আমার কাছে গিয়েছিল। তুমি নাকি তার মেয়েকে মারধর করে গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছ। পুলিশ কেস করা যায় কি না জানতে চাইছিল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যানেজ করলাম। কেস করলেই করা যায়। কিন্তু আফটার অল তুমি আমাদের গ্রামের ছেলে। অ্যান্ড আই নো ইউ ওয়েল ফ্রম ইওর ভেরি চাইল্ডহুড। ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

সানু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। শ্বাস ছেড়ে বলে, চলুন। সব বলছি…

১২

এখন ভোরের দিকে কাঁটালিয়াঘাটে গাঢ় কুয়াশা জমে থাকে। মধ্যরাত থেকে হিমের স্পর্শ শেষ রাতে ক্রমে ভারী হয়ে চেপে বসে। ঘরে-ঘরে ফ্যান-গুলি থেমে গিয়েছিল। দুপুরের দিকে কোন কোনওটি আস্তে ঘোরে। ধানখেতগুলি কোথাও দাগড়া-দাগড়া হলুদ, কোথাও নগ্নতায় ধূসর বা ঈষৎ কালো। দাদাপীরের মাজার আর তার লাগোয়া বাঁজা চটান সরকারি আমিন এসে মাপজোক করে দিয়েছেন। সীমানায় বাঁশের গোঁজ পোঁতা হয়েছে। মাজার ঘিরে পাঁচিল উঠছে। দশ ইঞ্চি পিলার, পাঁচ ইঞ্চি পাঁচিল। দেউড়ির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে গেট তৈরি হচ্ছে। প্রাচীন কাঠ মল্লিকার কয়েকটা ডাল কাটা গেল। রেবেকা সামিরুনের কাছে খবর পেয়ে দলিজঘরের দরজা খুলে উঁকি মারে। একটা বিশাল নির্জনতা ছটফট করে মরে যাচ্ছে। সেই রহস্যময় স্তব্ধতা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। আর কি সে দাদাপীরের খড়মের শব্দ শুনতে

পাবে? কাঠমল্লিকার বারমেসে সাদা ফুলগুলি গ্রীষ্মে বিস্ময়করভাবে ঈষৎ হলুদ হয়ে কী এক সৌরভ ছড়াত। আর কি ফিরে আসবে সেই পুরনো সৌরভ?

ফয়েজুদ্দিনের চিঠি পাওয়ার আগেই উত্তরবঙ্গ থেকে সাবরেজিস্ট্রার খালেদ চৌধুরি তার মেজাজি রূপসী বউকে নিয়ে গেছে। ছবি রিক্‌শতে ওঠার সময়ও শাসিয়ে গেছে, প্রতিশ্রুতির মোটরসাইকেল সে আদায় করবেই। তার মেয়ের গলায় সোনার চেন ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা যাবে না। তাছাড়া তার আব্বুর সম্পত্তি রেবেকা একা ভোগ করবে নাকি? তার হক নেই? সে মবিন খোন্দ্‌কারের মেয়ে নয়?

কাছাকাছি মাঠের ধান কাটা হচ্ছে। মাহিন্দার কালো রাতে লাঠি-টর্চ আর তালাই-মশারি নিয়ে কেটে বিছিয়ে রাখা ধানগাছের ওপর শুতে যায়। পাহারা না দিলেই চুরি হয়ে যাবে। ভোরে এসে সে পান্তা খেয়ে আবার মাঠে চলে যায়। তাই সকালে বাজারটা ফয়েজুদ্দিনকেই করে আনতে হয়। কাজিপাড়ার ভেতর দিয়ে তিনি শর্টকাট করেন। ঘাটবাজারে গিয়ে বাজার করার আগে কিছুক্ষণ এখানে-সেখানে আড্ডা দেন। কোনও দিন 'টাউনশিপে' গিয়ে ছোট্ট একতলা বাড়িটার সামনে বরাবরকার মতো হুতুম প্যাঁচার গলায় ডাকেন, ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী!

ভারতী ল্যাভেন্ডার ঝরোকার আড়াল থেকে সাড়া দেয়, চলে আসুন মামুজি!

সে-হারামজাদা আছে? নাকি অফিসে?

'সে হারামজাদা' মানে সন্দীপ দাশগুপ্ত ওরফে ভানু। সে থাকলে ডাক দেয়, কাম অন আঙ্কল্‌।

একদিন কাজিপাড়ায় ঢোকার পর হাবল কাজির সঙ্গে দেখা হল ফয়েজুদ্দিনের। কাজি বলেন, এ কী হে ফজুমিয়াঁ? তোমার হাতে বাজার করা থলে!

আমার পেট নেই? উড়ো পাখি কি চরে খায় না কাজিসাহেব?

হুঁঃ! তোমার পায়ে জিঞ্জির পড়েছে বটে। চলো। একসঙ্গে যাই। তোরাবের কাছে একবার প্রেসার মেপে দেখে আসি। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

শরীর তো ভাল থাকার কথা ভাই হাবল। পৌষে দাদাপীরের উরস হবে। মেলা বসবে। তোমার বোধ করি প্রফিটের ওয়ানফোর্থ শেয়ার।

তওবা! তওবা! প্রফিট কী বলছ ফজুমিয়াঁ? আলম মির্জা গভমেন্টকে ধরে-টরে থান মেরামতের লোন হিসেবে আদায় করেছে। এইটিন্থ সেঞ্চুরির মাজার। কমিটিতে পঞ্চায়েত মেম্বাররা আছে। এক্সঅফিসিও মেম্বার বি ডি

-ও। থানে যা ক্যাশ মানত পড়বে, তা দিয়ে লোন শুধতে হবে উইথ্ ইণ্টারেস্ট্। হাবল কাজি হঠাৎ খিক খিক করে হাসেন। 'আহলে হাদিস' জামাত বাগড়া দেবার জন্য অ্যাম্বাসাডারে চাপিয়ে সওলানাদের আনছিল। ছৈরদ্দির দলবল রেলব্রিজের কাছে তাদের ভাগিয়ে দিল। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে এক্সপার্ট টিম এসে দেখে গিয়েছিলেন। তাঁদের রেকমেণ্ডেশন। কাজেই পুলিশ ক্যাম্প বসেছিল পীরডাঙ্গায়। এখন উঠে গেছে।

শুনেছি।

ও! ভাল কথা! সানু হারামজাদার কাণ্ড! জানো না?

তার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। ঝামেলায় জড়িয়ে আছি।

হাবল কাজি রুষ্ট মুখে বলেন, সুখে খেতে ভূতে কিলোচ্ছিল। গফুরের ছেলের হাড়ে-হাড়ে এত বদমাইসি কল্পনাও করিনি। আমাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করা উচিত ছিল! গফুর আমাদের পর ছিল না।

ফয়েজুদ্দিন আস্তে বলেন, কী করেছে সানু?

শেখপাড়ার মসজিদে গিয়ে মৌলবিসাহেবের সামনে ক'জন মাতব্বর ডেকে সাক্ষী রেখে তালাকনামা লিখেছে। তারপর রেজিস্ট্রি-অ্যাকনলেজমেণ্ট ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরশুকার কথা।

ফয়েজুদ্দিন থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। পা বাড়িয়ে শুধু বলেন, হুঁ!

কাজি চাপাগলায় বলেন, নিশ্চয় প্রমথর পরামর্শ। কারণ প্রমথই বলল আমাকে। সে তো আইনবাজ লোক। তাকে তুমি জানো। গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। সানুর শ্বশুর হাশিম মীর তার পুরনো মক্কেল। এখন দেখ, সে কেমন ল্যাঠা লাগিয়ে দিল। একটা মিটমাট করিয়ে দিতে পারত। তা না করে—

ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিতে দিতে হাঁটেন। কিছু বলেন না।

আর সানুর মাস্টারি থাকবে? না সে কুতুবপুরে পা বাড়াতে পারবে? মীর তার দুই ঠ্যাং কেটে নেবে না? হাবলকাজি শ্বাস ছাড়েন। মুসলমানে জাতটারই মাথা মোটা। গোঁয়ার! হিন্দুরা তাদের মধ্যে কাটাকাটি বাধিয়ে দেয়। তা তারা বোঝে না।

ফয়েজুদ্দিন একটু হাসেন। ইরানের খোমেইনি আর ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের কাটাকাটি-মারামারির পেছনে কোন হিন্দু ছিল হে কাজিসাহেব?

হিন্দু ছিল না। খ্রিস্টান ছিল।

বেশ। ইসলামের প্রথমদিকের চার খলিফার মধ্যে তিন খলিফাকে খুন করার পেছনে কে ছিল? কারবালার কাটাকাটির পেছনে কে ছিল? মহরমে মাতম-জারি করে চোখের পানিতে সেই রক্ত ধোয়া যায় না।

সে তো পুরনো কথা। আমি এখনকার কথা বলছি।

তুমি যখনকারই কথা বলো, মুসলমানের রক্তে কী একটা আছে। পাকিস্তানে কী হচ্ছে? বাংলাদেশে কী হচ্ছে? অন্য মুলুকের কথা ছেড়ে দাও।

হাবল কাজি একটু পরে বলেন, অবশ্যি আমার জামাই মোরশেদ প্রায়ই বলে, আসলে মুসলমান মানে প্রতিবাদী ক্যারেক্টার। তাই সবতাতেই হঠকারী। সবকিছুতেই প্রতিবাদ করে।

ফয়েজুদ্দিন হেসে ওঠেন। হক্ কথা। সানুকে প্রতিবাদী চরিত্র ধরে নিলেই তর্কের ফয়সালা হয়ে যায়।

তাহলে সানু ঠিক করেছে বলছ?

ঠিক-বেঠিক বলার আমি কে হে হাবল? আমি কোদালকে কোদাল বলছি।

বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির কাছে পেঁাছে হাবল কাজি সহসা ফয়েজুদ্দিনকে স্পর্শ করেন। মিনির মা কাল রাতে কথায়-কথায় বলছিল, রুবির সঙ্গে তখন সানুর বিয়েটা দিলে খোন্দকারসাহেব ভালই করতেন। পাঁচজনে পাঁচকথা রটাচ্ছিল। তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। তো এখন সানু বউকে তালাক দিয়েছে। এখন যদি—

ফয়েজুদ্দিন তাঁর কথার ওপর বলেন, আমার ভাগনি কি গাছের ফল যে টুপ করে ছিঁড়ে যার-তার হাতে তুলে দেব?

কাজি শুকনো হাসেন। তা তুমি যতই বলো ফজু মিয়াঁ, মেয়েরা গাছের ফল বৈকি!

তোমার লজিকে ভুল আছে। মানুষ মেয়ে হোক, কি পুরুষ হোক, সে মানুষই। তাছাড়া—ফয়েজুদ্দিন থেমে যান। একটু পরে বলেন, যাকগে মরুকগে। ওসব কথা ছাড়ো। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার কোনও জিনিসের তুলনা হয় না।

বাজারে ভিড়ের মধ্যে দুজনে আলাদা হয়ে যান। ফয়েজুদ্দিনের শরীর ভারী হয়ে উঠেছিল। সানু তাহলে শেষপর্যন্ত সত্যিই তালাক দিল হাশিম মীরের মেয়েকে? একটা নিরীহ নির্দোষ স্বর্ণচাঁপার চারা কী করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে যে, তা একটা সামাজিক সম্পর্ককে, কত দিন-রাতের সাংসারিক স্মৃতিকে সহসা মিথ্যা করে ফেলে?

কিন্তু তার চেয়ে উদ্বেগের কথা, এই তালাকের সব দায় তাঁর ভাগনি রেবেকাকেই কাঁধে বইতে হবে! কেননা সে মেয়ে। মবিন খোন্দকার তাঁর মেয়ের জন্য খান্দান চেয়ে গেছেন। খান্দান না পেলে তাঁর মেয়ে আইবুড়ি হয়ে মরুক, এ-ও তিনি বলে গেছেন। এখন সত্যিই তাঁর মেয়ের আইবুড়ি হয়ে মরা ভবিতব্য হয়ে উঠল না কি?

হাবল কাজি বলতে চাইছেন, সানুর হাতে রেবেকাকে এবার তুলে দিলেই তো হয়।

না। ব্যাপারটা তত সরল নয়। সানুকে তিনি চেনেন না। সানু নিজেকে এভাবে ছোট হতে দেবে কি? সবাই বলবে, খোন্দকারের মেয়েকে পাওয়ার লোভেই সানু হাশিম মীরের মেয়ের সর্বনাশ করল। সানু সে-রাতে জোর গলায় বলছিল, 'লোকে মিথ্যাকে সত্যি ভাবতে পারে। কিন্তু যা সত্যি তা সত্যি।'

এই দুটি বাক্য থেকে এ মুহূর্তে অন্য এক মানে বেরিয়ে আসছে। সেই মানের মধ্যে সানু নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই দাঁড়িয়ে থাকাটা একজন 'সার'-এর। রেবেকার 'সার'-এর। আর এই 'সার' শব্দের কোনও বিকল্প সম্ভবত নেই। ঢিলে প্যান্ট-শার্ট পরা বিশালদেহী ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি ভিড়ের মধ্যে উঁচু হয়ে থেকে বিভ্রান্তভাবে শুধু গোঁফে তা দিচ্ছিলেন।...

সানুর বউকে তালাক দেওয়ার খবর আগের দিন সন্ধ্যায় রোকেয়া বেগম পেয়েছিলেন। প্রথমে মীরপাড়ার তোতা মিয়াঁর মেয়ে নুরুন্নাহারের মুখে। তার কিছুক্ষণ পরে কালোর মুখে। কিন্তু রোকেয়া তাঁর ভাইজান ফয়েজুদ্দিনকে কিছু বলেননি। কেননা, রোকেয়া খবরটা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হ্যাঁ-না-এর গোপন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। তাঁর ভাইজান খামখেয়ালি বাউণ্ডুলে মানুষ। দুনিয়ারির কিছু বোঝেন না। তাই আগে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাইজানকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল।

তাছাড়া সানুর বউকে তালাক দেওয়ার খবর তাঁর কাছে সাধারণ খবর নয়। একসময় সানু আর তাঁর ছোটমেয়েকে মিথ্যামিথ্যি জড়িয়ে পাড়ায়-পাড়ায় কুচ্ছো-কেলেঙ্কারি রটেছিল। এবার লোকের নাকে ঝামা ঘষে দিলে কেমন হয়?

ফয়েজুদ্দিন বাজার করে এসে থলে বারান্দায় রেখে তখনই বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। রোকেয়া কথাটা তোলারও সুযোগ পেলেন না।

উঠোনের শেষপ্রান্তে উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ানো আঁকাবাঁকা পেয়ারা গাছে সামিরুনকে চড়িয়ে রেবেকা তম্বি করছিল। নেই মানে? খুঁজে বের কর। আমি স্বপ্নে দেখলাম কত্তো পেয়ারা ধরে আছে।

সামিরুনের লাল ফ্রক ডালের শুকনো খোঁচে লেগে ছিঁড়ে যায়। সে কান্নার ভান করে চেরা গলায় বলে, গেল তো! এবার নতুন একখানা কিনে দাও ছোটবুবু! কালীপুজোয় চুড়ি কিনে দেবে বলেছিলে। দাওনি

মনে আছে?

একটা পেয়ারা দিলেই ফ্রক পাবি। চুড়ি পাবি।

নেই গো, নেই। এখন জাড় পড়ে গেল না? এ গাছে জাড়ের সময়ে পেয়ারা ফলে না।

সে আমি বুঝি না। পেয়ারা না পেলে তোকে নামতে দেব না।

রোকেয়া শুনছিলেন। এবার হাসিমুখে বলেন, ও রুবি! তোর কি মাথাখারাপ হল সক্কালবেলা? ওই গাছ তোর দাদাজির লাগানো। ওর সিজিন আলাদা। এ মুলুকের গাছ নাকি? বর্ষার পর ফলে। জাড়ের সিজিনে ফলে না।

আম্মি! আমি আজ স্বপ্নে দেখেছি কত্তো মোটা মোটা পেয়ারা ঝুলছে।

হ্যাঁ রে! স্বপ্ন কি সত্যি হয়? আমিও তো তোর আবুকে আজ—

রোকেয়া আবেগে থেমে যান। তাঁর দিকে ঘুরে রেবেকা বলে, কান্নাকাটি করবেন না আম্মি! আমার মুড নষ্ট হয়ে যাবে।

সেই সুযোগে সামিরুন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে। ডালিমগাছের আড়াল দিয়ে ছুটে গিয়ে বারান্দায় ওঠে। বাজারের থলে তুলে নিয়ে সে বলে, কালোচাচার বাজার, আর মামুজির বাজার। রেঁধে শেষ করা যায় না। না মাজি?

রোকেয়া বলেন, রান্নাঘরে চল্। আমি যাচ্ছি। আগে ভাল করে হাত ধুয়ে বাজারে হাত দিবি।

রেবেকা গন্ধরাজের দিকে তাকিয়ে থাকার পর গোসলখানার পাশে শিউলিতলায় গেল। এখনও কিছু শিউলি ফোটে। তলায় পড়ে আছে গুনিগোনতা কতকগুলি ফুল। ধাড়ি মুরগির একঝাঁক বাচ্চা ঠোকরাচ্ছে। রেবেকা তাড়িয়ে দেয়। তার মনে পড়ে যায়, আব্বুর সঙ্গে আম্মির মুরগি পোষা নিয়ে তর্কাতর্কি হত। খোন্দ্কার বলতেন, ছিঃ। বাড়ি নোংরা করে। না দেখে কোথাও পা ফেলা যায় না। রোকেয়া বলতেন, কিন্তু গোশ্‌তো খেতে তো সে-কথা মনে থাকে না। রেবেকা তার মৃত আব্বুর হয়ে মনে মনে জবাব দেয়, কেন? বাজার থেকে কিনে এনে খেলেই হয়। স্কুলজীবনে তার হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে আনতে সে লজ্জা পেত। উঠোনে-বারান্দায় মুরগির বিষ্ঠা। পরে খোন্দ্কার মুরগিপোষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মাস দুই আগে কালোর বউ কালোকে লুকিয়ে একটা ধাড়ি ডিমপাড়া মুরগি গছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তার টাকার দরকার ছিল। খোন্দ্কার কেন কে জানে আপত্তি করেননি। হয়তো মেয়ের বয়স উনিশ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ বিয়ের যোগ্য পাত্র পাচ্ছেন না—এইসব চিন্তা তাঁকে অন্যমনস্ক করেছিল।

রেবেকার তা-ই মনে হয়েছিল। এখন মুরগি তাড়ানোর সময় সহসা

কথাটা মনে ভেসে এল। সে তো ছবির মতো রূপসী নয়। ছবির মতো গ্রাজুয়েট নয়। তাই সে খান্দান পাচ্ছে না। ইশ! বয়ে গেল তার। সে তো ছবি নয়। সহসা মন তেতো, তেতো এবং তেতো। রেবেকা খিড়কির দিকে এগিয়ে যায়। দরজা খুলে ডোবার ঘাটে দাঁড়ায়। জিনের ডাঙার লাল মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সারা গায়ে গর্তগুলিন কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন মনে হয়। একটি প্রসারিত নগ্ন নির্জনতাকে এসময় বড় কদর্য আর ভয়ঙ্কর লাগে। অথচ অন্যসময় এই ক্ষেত্রটি কত রহস্যময়।

রুবি!

চমকে উঠেছিল সে। কখন রোকেয়া তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সে টের পায়নি। রাগ করে বলে, অমন করে ডাকে? আমি ভাবলাম—

সে বলে না কী ভেবেছিল। রোকেয়া চাপা গলায় বলেন, শুনেছিস তোর সারের কাণ্ড?

রেবেকা নির্বিকার কণ্ঠস্বরে বলে, ভাবিজিকে সার তালাক দিয়েছেন। এতে আবার কাণ্ড কী? মুসলমানরা যা করে, সার তা-ই করেছেন। তালাক আর নিকে। নিকে আর তালাক।

কোথায় শুনলি তুই? কে বলল তোকে?

প্রশ্নে একটা ছটফটানি ছিল। রেবেকা কেমন একটু হাসে। আপনার নিউজসোর্স আছে। আমার বুঝি নেই?

তুই তো আর বেরোস না। কে বলল তোকে? ভাইজান? ভাইজান তো জানেন বলে মনে হল না। জানলে পরে এতবড় খবর কি চেপে রাখতেন? কে তোকে বলল?

সামিরুন! রেবেকা রাগ-করে বলে। সামিরুন কি বোবা-কালা?

রোকেয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কবে বলল? কখন বলল?

কাল সন্ধ্যায় টিভি দেখার সময়। কিন্তু কেন আপনি অমন করছেন আম্মি?

কী করছি? কথা শোনো দিকি!

একটা মেয়ে তালাক খেয়েছে। আর আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা বীরত্বের কাজ হয়েছে।

রুবি! রোকেয়া ধমক দেন। বাজে কথা বলবিনে।

রেবেকা বাড়ি ঢুকে হনহন করে নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় কতকটা হাইজাম্প্ দিয়ে ওঠে। টানা বারান্দা উঠোন থেকে তার বুকসমান উঁচু। তারপর তার ঘরে রেকর্ড প্লেয়ার বেজে ওঠে।

রোকেয়া মেয়ের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেয়েছিলেন। মনে মনে বলেন, হা খোদা! কী জিনিস দিয়ে গড়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছ এই মেয়েটাকে? আমার

পেটের গোটা। আমি তাকে বুঝি না, জানি না!

তিনি খিড়কির দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে এলেন। সামিরুন বঁটিতে তরকারি কুটছিল। রোকেয়া ছোট্ট ফ্যানে সুইচ টিপে মোড়ায় বসেন। আবহাওয়ায় হিমের ভাব। কিন্তু তাঁর কপালে, নাকের ডগায়, চিবুকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সামিরুন বলে, কাটাবাছা করে তবে চুলোতে আঁচ দেব মাজি! কয়লা ভেঙে রেখেছি।

রোকেয়া একটু পরে আস্তে বলেন, সামিরুন!

মাজি!

সানুর তালাক দেওয়ার কথা তুই কোথায় শুনেছিলি?

সামিরুন একটু ভড়কে গিয়ে বলে, কেন? কালোচাচা আপনাকে বলছিল। কানে এল।

তুই রুবিকে বললি?

সামিরুন অপরাধী সেজে চুপচাপ বেগুন কাটতে থাকে।

হ্যাঁ রে? শুনে রুবি কী বলল তোকে?

কী বলবে?

কিছু কলল না? মনে করে দ্যাখ্‌।

কিশোরী আত্‌রাফকন্যা, অনাথ সে, একটু অবাক হয়ে কর্ত্রীর মুখটা দেখে নেয়। তারপর সে তার অভ্যাসমতো তোতলায়। ছোটবুবুকে বললাম তো—ছোটবুবু তো টিভি দেখছিল—তো ছোটবুবু—হ্যাঁ, আমার চুল টেনে দিলে! বললে—কী যেন বললে কথাটা! পেটে আসছে, মুখে আসছে না মাজি! এলে পরে বলব। তো আমি বললাম, ঠিক করেছে! তুমি চিঠি লিখে আমাকে চাঁপাফুলের চারা আনতে পাঠিয়েছিলে। আর মেয়েটা সেই চিঠি পড়ে তোমাকে মুখে যা এল তা-ই বলে গালমন্দ দিয়ে আমাকে মারতে এল। বেশ করেছে সার!

রোকেয়া কান করে শুনছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সামিরুন বলে ওঠে, মনে পড়েছে মাজি! ছোটবুবু বললে, সারের বিয়ে করাই উচিত হয়নি। সারের বিয়ে করা মানায়? এবারে ঠ্যালা বুঝুক!

রোকেয়া কথাটার মানে খুঁজে পেলেন না। অন্য কোনও কথা আশা করেছিলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কেটেবেছে রাখ্‌। কয়লার আঁচ উঠলে আমাকে ডাকবি।

রেবেকার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় রোকেয়া দেখেন, রেবেকা রেকর্ড বাছাই করছে। বিছানায় অনেকগুলো ছোট-বড় রেকর্ড এলোমেলো ছড়ানো আছে।...

দুপুরে রেবেকা যখন গোসলখানায় স্নান করতে ঢুকেছে, তখন রোকেয়া তাঁর ভাইজান ফয়েজুদ্দিনকে একথা-সেকথা বলার ফাঁকে নেহাত কথার কথা হিসেবে বলছেন এমন ভঙ্গিতে বলেছিলেন, সানু নাকি বউকে তালাক দিয়েছে। শোনা কোথা!

ফয়েজুদ্দিন অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, বনিবনা হচ্ছিল না। তো কী করবে?

সানুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

ন্যহ্।

খান্দানি ঘরের শিক্ষিত ছেলে। মিষ্টি স্বভাব। গরিব বলেই লোকে খামোকা তার গায়ে কালি ছেটাতে সাহস পায়। এখন ভাবি, টিউশনি হঠাৎ বন্ধ না করে দিলে হয়তো অ্যাদ্দিনে রুবি বি এ পাশ করত। তো সে যা হবার হয়েছিল। মানুষ যদি ভুল করে, খোদাতালা তা শোধরানোর রাস্তাও তো খোলা রেখেছেন।

আবার রুবিকে পড়াবি নাকি?

সে-কথা বলছি না ভাইজান।

হুঁ। তুই কী বলতে চাইছিস বুঝলাম। আজ সকালে হাবল কাজিও তাই-ই বলছিল।

কাজিসাহেব বলছিলেন? তা হলে দেখুন, মামলামোকর্দমা কাজিয়া-ফ্যাসাদ যতই হোক, খান্দানির টান—আবার রক্তের সম্পর্কও তো আছে। রুবির আব্বু আর কাজিসাহেব খালাতো ভাই। ঠিক কথাই বলেছেন। হারামিদের নাকে ঝামা ঘষে দিতে চেয়েছেন।

ফয়েজুদ্দিন হেসেছিলেন। পাগলি রে পাগলি! দুনিয়াদারির আমি কিছু বুঝি না বটে; কিন্তু অন্তত এটুকু বুঝি, কাজটা আর তত সহজ নয়।

আপনি সানুর সঙ্গে কথা বলে দেখুন না ভাইজান!

তুই হাবলকাজিকেই ধরে দ্যাখ্!

ভাইজান! রুবির দায়দায়িত্ব তার আব্বু আপনার হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন। আর আপনি বলছেন আমি কাজিসাহেবকে ধরব? এ কী বলছেন আপনি?

তা হলে চুপ করে বসে থাক্।

বলছিলাম কী, দেরি করলে সানু আবার কার পাল্লায় পড়ে যাবে। আজকাল কী আশরাফ কী আতরাফ, সব ঘরেই একই অবস্থা। কালো বলছিল, মুনিশখাটা লোকেরও জামাই কিনতে ভিটেমাটি বেচতে হচ্ছে। সানু আপনাকে খুবই মানে। আপনার কথার অবাধ্য হবে না।

ফয়েজুদ্দিন সে-কথায় কান না দিয়ে বলেছিলেন, আজ আর গোসল করব

না। গা ম্যাজম্যাজ করছে। কী খেতে দিবি, দে। খিদে পেয়েছে।…

বিকেলে ফয়েজুদ্দিন ঘাটবাজার এলাকা পেরিয়ে 'টাউনশিপে' গেলেন। একতলা একটা ছোট্ট বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যাসমতো হুতুমপ্যাঁচার গলায় তিনি ডাকছিলেন, ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী!

ল্যাভেন্ডার লতার ঝরোকায় ঢাকা বারান্দা থেকে যথারীতি সাড়া আসে, মামুজি! চলে আসুন!

সে-হারামজাদা আছে?

এইমাত্র অফিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছে।

ফয়েজুদ্দিন বারান্দায় পৌঁছুলে ভানু ডাকে, আসুন আঙ্কেল। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

বসার ঘরে ঢুকে ফয়েজুদ্দিন বলেন, আমার কথা ভেবে তোর কী লাভ? আমি এক অকম্মার ধাড়ি। রেলের বাতিল মাল। দেখিসনি, লাইনের ধারে ঝোপঝাড়ঘাসের মধ্যে উল্টে পড়ে থাকে মরচে ধরা ভাঙা ওয়াগন?

ভানু হাসে। আপনি দারুণ বলেন আঙ্কেল! ভারতী! চলে এস।

এক মিনিট! আমি লতাগুলো একটু ছেঁটে দিই। তুমি কেটলি চাপিয়ে দাও না ততক্ষণ!

ফয়েজুদ্দিন বলেন, আমি চা খাব না। হ্যাঁ রে ভানু! তোর ফ্রেন্ডের খবর কী?

ভানু সোজা হয়ে বসে। তার কথা নিয়েই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন তার কীর্তি? আঙ্কেল! তাকে আমি মডার্ন অ্যান্ড এনলাইটন্ড্ ভাবতাম। আমি সত্যি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। পারল কী করে? ঠিক আছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছিল না। দুজনের মধ্যে কমিউনিকেশন-লেভেল এক ছিল না। কিন্তু এ তো একতরফা গায়ের জোর দেখানো। মেয়েটিরও বক্তব্য থাকতে পারে। সে কিছু বলার সুযোগ পাবে না? এ কী অদ্ভুত প্রথা!

সানুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

না। সে আসছে না। অজন্তা বুক স্টোরে তিনদিন তার কাগজ পড়ে আছে। শচীনদা একটু আগে বলল।

তুই কীভাবে জানলি?

শচীনদার কাছেই শুনলাম। ভারতী বলছিল, মুসলিমদের শরিয়তি প্রথা নাকি এরকমই। স্বামী যখন খুশি স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। ঠিক আছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট না হলে বিচ্ছেদ অভিপ্রেত, আই এগ্রি। কারণ আমি মনে করি, মানুষের মৌলিক অধিকার আছে সে কীভাবে জীবনযাপন করবে। সানুর কাচ্চা-বাচ্চা নেই। কাজেই উভয়পক্ষের কোনও বার্ডেন নেই। তবু

কথা থেকে যায়। সানুর স্ত্রী যদি সহায়-সম্বলহীন মেয়ে হত? ওয়ার্স্ট পসিবিলিটি ধরে নিয়েই তো আইন তৈরি হয়।

ভারতী ঘরে ঢুকে বলে, সানুদার বউ সহায়সম্বলহীন হলে লাথিঝাঁটা খেয়েও পড়ে থাকত। অমন করে নিজে থেকে আগেই চলে যেত না। এটা স্পেশাল কেস।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, তা হলে সানুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে। কবে? কখন?

কাল মর্নিংয়ে স্কুলে ধরনা দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় দেখা হল। সব খুলে বলল।

ভানু দ্রুত বলে, তুমি আমাকে বলোনি! একটু আগে আমি তোমাকে যখন বললাম, তখন তুমি—

বলেই বা কী হত? যে যার নিজের লড়াই করে যাচ্ছে। আর বললেই বা কী করতে তুমি? সানুদা হাতের ঢিল ছুড়ে দিয়েছে। তোমাকে তো জানি। তুমি নাক গলাতে দৌড়ুতে। মুসলিম সেন্টিমেন্টে ঘা লাগত। ভারতীর হাতে কয়েকটা ফুল আর একটা কাঁচি ছিল। সে বসে পড়ে। একটু বাঁকা হেসে বলে, মামুজি ওকে বুঝিয়ে দিন। ধরা যাক, সানুদা তোমার কথায় তার বউকে ফেরত নিতে রাজি হল। কিন্তু মুসলিম শরিয়ত কী জিনিস জানো না। তালাক দেওয়া বউকে আর ঘরে তোলা সহজ নয়। অন্য একজন তাকে নিকে করবে। তারপর যদি সে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তাহলে তার তিনমাস দশদিন পরে সানুদা বউকে আবার নিকে করে ঘরে তুলতে পারবে।

ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। বলেন, সব প্রথারই ভাল-মন্দ দিক আছে। এটা অবশ্যি রাগের মাথায় হুট্ করে তালাক দেওয়ার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। তবে হ্যাঁ, এটা বড্ড বেশি কড়া শাস্তি। মানুষের প্রতি এত নির্দয় হওয়া উচিত নয়। তার ভুলচুক হতেই পারে। ফয়েজুদ্দিন হেসে ওঠেন। মুসলমানদের ঈশ্বর খুব রাগী মনে হয় না? যিনি পরম করুণাময়—'রাহ্মান্ আর রহিম,' তিনি স্বামী-স্ত্রীদের ওপর এমন খাপ্পা কেন বুঝি না। আমার সন্দেহ হয়, মোল্লারা মিস্ইন্টারপ্রিট্ করেছে। যাক গে মরুক গে। সানু যেন আমাকে অ্যাভয়েড করে বেড়াচ্ছে।

ভারতী বলে, ওকে রাত্রে বাড়িতেই পাবেন।

পাগলি! সে কি আমার কিছু চুরি করেছে যে রাতবিরেতে তার ঘরে হানা দিতে যাব? বলে ফয়েজুদ্দিন তার দিকে ঘোরেন। এ কী রে! তোর শাঁখাটাখা কোথায় গেল?

ভারতী বলে, আপনার সবতাতেই চোখ কেন মামুজি?

হুঁ। সিঁদুরেরও মারমূর্তি ছাঁটাই করেছিস। এবার তোকে স্বাভাবিক

দেখাচ্ছে। জানিস? আমার বড় ভাগনি ছবি সিঁদুর পরে। সেকালে আশরাফবাড়ির বউরা মেটে সিঁদুর পরত। আজকাল বহু মুসলিম বউ এক চিলতে লাল সিঁদুর পরে। মেজরিটির কালচারের প্রভাব মাইনরিটির ওপর পড়তে বাধ্য, তা যতই ফান্ডামেন্টালিজমের আওয়াজ উঠুক না কেন। তবে ভারতীয় এসর্টিমিজম হঠাৎ নেতিয়ে পড়ল কেন?

ভানু হেসে ওঠে। আরে সে এক কান্ড! প্রমথ মজুমদার মশাইয়ের মেয়ে-জামাই কালীপুজোর বিসর্জন দেখতে এসেছিল। ভারতী তাদের খোলা ছাদে বসিয়ে খুব খাতির করেছিল। কিন্তু নিজের পরিচয় দেয়নি। এদিকে জামাই ভদ্রলোক কড়া হিন্দুত্ববাদী। পরে শ্বশুরের কাছে সব জানতে পেরে খাপ্পা হয়েছিলেন বোঝা গেল। দুর্গাপুর স্টিলের ইঞ্জিনিয়ার। সেখানে গিয়ে লম্বা চিঠি লিখেছেন। ভারতী! চিঠিটা মামুজিকে দেখাও।

ভারতী বলে, ছেড়ে দাও! দেশজুড়ে তত্ত্ববাগীশদের বাক্‌তাল্লা বয়ে যাচ্ছে।

ভানু বলে, ভদ্রলোকের মোদ্দা কথাটা হল, হিন্দুধর্মে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত শাঁখাসিঁদুর পরা অন্যকে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। মুসলমান পুরুষ উপবীত ধারণ করলে তা যেমন সামাজিক অপরাধ, তেমনই মুসলমান স্ত্রীলোক—

শাট আপ! ভারতী চটে যায়। ভদ্রলোক আমার ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছেন। সত্যি তো! আমি কি হিন্দু, না মুসলমান? আমি মানুষ। আই অ্যাম এ পার্সন। মাই রিলিজিয়ন ইজ হিউম্যানিটি।

বেশি রেগে গেলে এ দেশের লোক পুরো ইংরিজি বাক্য বলে কেন রে ভানু? ফয়েজুদ্দিন সহাস্যে উঠে দাঁড়ান। ভারতী! আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় বেশি রাগী। অথচ মুসলমানদের শাস্ত্রে নাকি বলা হয়েছে, রাগ হারাম। প্যারাডক্স!

মামুজি! আপনাকে বলেছিলাম ইসলাম আর মুসলিম এক জিনিস নয়।

সে তো দেখাই যাচ্ছে। বলে ফয়েজুদ্দিন বেরিয়ে আসেন।...

সন্ধ্যার নামাজের পর শেখপাড়ার মসজিদের মৌলবি মোহাম্মদ দেরেশতুল্লা সাদা কাপড়ের মোড়কে তাঁর নিজস্ব কোরান শরিফ মুড়ে টর্চ হাতে দরাগাপাড়ায় আসেন। মিয়াঁদের প্রাচীন মসজিদে কোনও মৌলবিসাহেব বহুবছর ধরে নেই। মিয়াঁশ্রেণীর প্রবীণেরা নিজেরাই কেউ না কেউ নামাজ পরিচালনার 'ইমাম' হন। জুম্মাবারে ইমাম হয়ে 'খোত্‌বা' পাঠ করেন সুলতান মিয়াঁ। অন্য-অন্যদিন পাঁচ সাত জন, জুম্মাবারে মাথাগুনতি বিশ-বাইশজনের বেশি নামাজি জোটে না। মবিন খোন্দ্‌কারের বাবার আমলে

কেউ কল্পনাও করতে পারত না, শেখপাড়ার মসজিদ থেকে মৌলবিসাহেব এসে একজন মিয়াঁর আত্মার সদ্গতির জন্য কোরান পড়বেন।

সামিরুন দলিজঘরে আলো জেবলে দিয়ে মেঝেতে পুরনো গালিচা বিছিয়ে রাখে। 'জায়নামাজ' হিসেবে ব্যবহারের জন্য সুদূর কাশ্মীরে তৈরি হয়েছিল এই গালিচা, কেননা কিনারায় রঙিন আরবি হরফে বোনা আছে শাস্ত্রীয় অজস্র বাক্য এবং 'সেজদা' বা ভূলুণ্ঠিত প্রণামে খোদার বান্দার মাথা যে ঠাঁইটি ছোঁবে, সেখানে বোনা আছে 'আল্লাহু আকবার্' এই পবিত্র বাক্য। বাক্যটি সুদৃশ্য চিত্রবৎ এখনও উজ্জ্বল।

মৌলবিসাহেবকে রাস্তায় দেখামাত্র সামিরুন আত্মগোপন করে। গালিচায় নকশাদার কাঠের কাশ্মীরি 'রেহেল' বা ভাঁজ করা পুস্তকাধার খুলে রাখায় মৌলবিসাহেব প্রথমদিনই রেগে গিয়েছিলেন। কেননা রেহেল খুলে শূন্য রাখলে শয়তান চেটে দিয়ে অপবিত্র করবে। পাশে চিত্রিত চিনে তশ্তরির ওপর কাচের গ্লাসে প্ল্যাস্টিকের ঢাকনা দেওয়া জল থাকে। আধঘন্টা কোরান পাঠের পর চা-নাশতা খেয়ে মৌলবিসাহেব ফিরে যান। সামিরুনকে চা-নাশতা আনার সময় রেবেকার শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঢুকতে হয়। কিন্তু এটুকু তার ভালই লাগে।

তিরিশ দিনের সন্ধ্যায় কোরান পাঠ করে মৌলবি মোহাম্মদ দেরেশতুল্লা চা-নাশতায় মন দিয়েছেন, এমন সময় ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরী এসে সম্ভাষণ করলেন, আস্সালামু আলাইকুম।

ওয়া আলাইকুম্ আস্সালাম। মৌলবিসাহেব হাসেন। সাহেবকে আর দেখতেই পাই না।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, বেয়াদবি মাফ্ করবেন জনাব। চেয়ারেই বসছি। খ্রিস্টানি পোশাক বড় বেয়াড়া।

বসুন। বসুন। আপনি রেলের বড় অফিসার ছিলেন শুনেছি। চেয়ারে বসা অভ্যাস।

ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিতে দিতে বলেন, একটা কথা কানে এল। সানু তার বিবিকে তালাক দিয়েছে আপনার সামনে। বিবির পক্ষের কেউ হাজির ছিল না। এতে তালাক কি জায়েজ (সিদ্ধ) হয়?

নিশ্চয় হয়। মৌলবিসাহেব শাস্ত্রীয় বাক্য উচ্চারণ করে ফের বলেন, তার ওপর কাগজে কলমে লিখে সাক্ষীদের সইসাবুদ করিয়ে—

এক মিনিট মৌলবিসাহেব। সানুর বিয়ের কাবিলনামা সরকারি কাজিকে দিয়ে লেখানো হয়েছিল। ওই কাগজটা রেজিস্টার্ড দলিলের তুল্যমূল্য। আপনি সেটা দেখেছিলেন?

তাতে কিছু আসে-যায় না। সানু মিয়াঁ শুধু মুখেই তিন তালাক বললে

তালাক হয়ে যেত। শিক্ষিত ছেলে। তাই কাগজ-কলমে দিয়েছে। তালাকের সঙ্গে নিকাহের কাবিলনামার কোনও সম্পর্কই নেই।

কিন্তু দেনমোহর? বিবির যা পাওনা?

বিবির ইদ্দতকাল তিনমাস দশদিনের মধ্যে দেনমোহরের টাকা আর ওই সময়ের খোরপোশ মিটিয়ে দিলেই হল। কিংবা বিবির পক্ষের সঙ্গে আপসে ফায়সালা করলেই সে-ঝামেলা মিটে যায়। কিন্তু তালাকের নড়চড় নেই।

শুনলাম সানুর বিয়ের কাবিলনামায় দেনমোহর ধার্য হয়েছিল তিরিশ হাজার এক টাকা।

মৌলবিসাহেব মাথা নেড়ে বলেন, তা আমি জানি না। দেখুন জনাব, আমি তো সানু মিয়াঁকে বলিনি বিবিকে তালাক দাও! কেউ আমার দরবারে গিয়ে ফতোয়া চাইলে আমি দিতে বাধ্য।

না। আপনার দোষ কী? তবে ওকে দেনমোহরের কথাটা মনে পড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

মৌলবি দেরেশতুল্লা গম্ভীর মুখে বলেন, সে শিক্ষিত ছেলে। দেনমোহরের দায় তার নিজের। সে তো বাচ্চা নয় খানচৌধুরিসাহেব!

তালাকনামার মুসাবিদা কে করেছিল?

কোরান-হাদিসমোতাবেক মুসাবিদা আমিই করেছি, তা ঠিক। কিন্তু—

কিন্তু কোরান-হাদিসমোতাবেক দেনমোহর-খোরপোশের কথা তালাকনামায় নেই।

মৌলবিসাহেব একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। শ্বাস ছেড়ে বলেন, হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে তখন রাত প্রায় দশটা। জনাকতক মুসল্লির সঙ্গে বসে দেশের হালচাল নিয়ে কথা বলছিলাম। সেইসময় সানুমিয়াঁ হঠাৎ হাজির। তাড়াহুড়ো করে—তো এখন আলাদা দফায় দেনমোহর-খোরপাশের খাহেম জানিয়ে একখানা খত পাঠালেই চলে।

ফয়েজুদ্দিন হাসেন। এক মুরগি দুবার জবাই!

তওবা! তওবা! একী বলছেন আপনি? তালাক তো জায়েজ হয়ে গেছে। আগে তালাক, তারপরে না দেনমোহরের কথা! মৌলবিসাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে আস্তে বলেন, কিছু ঝামেলা বেধেছে নাকি?

বেধেছে। প্রমথ মজুমদারের নাম শুনে থাকবেন। নামকরা উকিল। আজ মরহুম দুলাভাইয়ের সাকসেসন সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিলাম। তার কাছে এতদিনে পাওয়া গেছে কোর্ট থেকে।

ইনশাল্লা! খুব সুখবর।

কিন্তু সানুর খবর খারাপ। তার শ্বশুর হাশিম মীর দেনমোহর-খোরপোশের দায়ে সানুর নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে। সানুর বাড়ির দরজায়

তালা বন্ধ। তাই কোর্টের বেলিফ এসে সমন দরজায় সেঁটে দিয়ে গেছেন।

মৌলবি কোরান শরিফ কাপড়ের মোড়কে ঢুকিয়ে রেহেল ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ান। একটু হেসে বলেন, সানু মিয়া টাকা মিটিয়ে দেবে। তবে সুপ্রিম কোর্টেরও সাধ্য নেই তালাক রদ করতে পারে। এ হল গিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার আইন। চলি জনাব! এশার নামাজের ওয়াক্‌ত্‌ হয়ে এল।

ফয়েজুদ্দিন হাক দিলেন, সামিরুন! এগুলো নিয়ে যা।

তারপর দলিজঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে বাড়ি ঢুকলেন। সামিরুন এখন ফ্রক পরে নিয়েছে। সে তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

বারান্দায় মা ও মেয়ে মুখোমুখি বসে ছিল। সাকসেশন সার্টিফিকেট পড়ে শোনাচ্ছিল রেবেকা। ফয়েজুদ্দিন গিয়ে চেয়ার টেনে বসেন। তারপর বলেন, বোকা! গাধা! মুখস্থ বিদ্যার জাহাজ। এদিকে তলায় ফুটো। পানি ঢুকছে।

রেবেকা তাকায়। রোকেয়া বলেন, কার কথা বলছেন ভাইজান?

আবার কার? হারামজাদা সানুর। কুতুবপুরের হাশিম মীর ঝানু লোক। বিয়ের কাবিলনামায় তিরিশ হাজার এক টাকা দেনমোহর লিখিয়ে নিয়েছিল। স্কুলের ডোনেশনবাবদ দেওয়া টাকার জিঞ্জির পরিয়ে রেখেছিল জামাইয়ের পায়ে। হতভাগা এমনই নির্বোধ, কাবিলনামার কপি পড়েও হয়তো দেখেনি।

রোকেয়া বলেন, তালাকের সঙ্গে দেনমোহরের কী? সানু মিটিয়ে দিলেই—

দেবে কোথা থেকে? হাশিম মীর মামলা ঠুকে দিয়েছে। তিরিশ হাজার একটাকা প্লাস একশোদিনের খোরপোশ প্লাস কোর্টের খরচ। সানু তিনকাঠা মাটির বাড়ি আর সাইকেল বেচে অত টাকা পাবে?

না দিতে পারলে?

বাড়ি ক্রোক করবে। স্থাবর-অস্থাবর নিলামে বেচে ক'টাকা উসুল হবে? বাকি টাকার জন্য জেল খাটতে হবে সানুকে।

রোকেয়া শিউরে ওঠেন। সানুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি? কী বলছে সে?

জানি না। সে হয়তো আমাকে এড়িয়ে চলছে।

ওকে খুঁজে বের করুন ভাইজান!

কেন রে? তুই কি ওর হয়ে হাশিম মীরের টাকা মেটাবি নাকি?

হ্যাঁ। মেটাব। জমি বেচতে হয় বেচব। ছবির বেলায় তিনবিঘে বেচেছিলাম। খামোকা শয়তান হারামিরা সাদা কাপড়ে কালি ছিটিয়েছিল। এখনও ছেটাচ্ছে। তাদের নাকে ঝামা ঘষে দেব। কর তোরা, কী করবি!

চেঁচাচ্ছিস কেন? প্রেসার বাড়বে। ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিতে দিতে

আস্তে ব্লেন, সানুকে খুঁজে পেলে তবে তো ? লে হালুয়া ! তুই আবার হাসছিস কেন রে ?

রেবেকা হেসে উঠেছিল। কিন্তু তখনই গম্ভীর হয়ে ব্লে, সার ক্বে ভোঁ কাট্টা !

অ্যাঁ ? কোথায় কাটল সে-হারামজাদা ?

টু ক্যালকাট্টা।

ভোঁ কাট্টা টু ক্যালকাট্টা ! তুই কী করে জানলি ?

রেবেকা নির্বিকার মুখে বলে, সার লেটার বক্সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন।

কৈ দেখি। নিয়ে আয়।

ছিঁড়ে ফেলেছি। সার এবার স্ট্রাগ্‌ল্‌ করতে কলকাতা গেছেন। কলকাতার পপুলেশন নাকি এইট্টি লাখ, মামুজি ! এখন এইট্টি লাখ প্লাস ওয়ান হয়ে গেছে।

সর্বনাশী ! বেশরম ! বলে রোকেয়া মেয়েকে মারতে থাপ্পড় তুলেছিলেন। কিন্তু সহসা তাঁর হাত থেমে যায়। চোখ ছাপিয়ে জল আসে। আত্মসম্বরণ করে বলেন, যাবার আগে একবার দেখা করে গেল না !···

১৩

সানু, এখানে কী করছ ?

কাক দেখছি।

বুলি হেসে ফেলে। সে কী ! তুমি গ্রামের মানুষ।

কখনও কাক দেখনি ?

না—মানে এত কাক ! এত বড় গাছটা একেবারে কালো করে ফেলেছে ! সানু একটু হাসে। কলকাতা সত্যিই আমাকে অবাক করে। যখনই আসি, তখনই—

বুলি তার কথার ওপর দ্রুত বলে, তখনই তুমি অবাক হও। কিন্তু আমরা —আমি অন্তত হই না। তো শোনো ! এই ছাদে পুরুষমানুষ দেখলে নিচের বস্তির লোকেরা গালাগালি করে। চলে এস।

সানু অবাক হয়ে যায়। কলকাতাতেও এসব আছে নাকি ? আমাদের গ্রামে দেখেছি, পাশের বাড়ি কেউ গাছে ডাল কাটতে বা ঘরের চাল মেরামত করতে উঠলে আগে জানিয়ে দেয়।

আর নয়। চলে এস শিগগির। এক্ষুনি ওরা গাল দিতে শুরু করবে।

সানু বুলিকে অনুসরণ করে। বুলি তার দূর সম্পর্কের বোন। তার প্রায় সমবয়সী এই মেয়েটিকে আগে কখনও দেখেছে বলে সানুর মনে পড়ে না। সম্প্রতি বুলির সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। অবশ্যি এ বাড়িতে সে খুব কমই এসেছে। বড়জোর দুবার কি তিনবার। সেও তার মা যখন বেঁচেছিলেন তখন। মা-ই তাকে বলতেন, কলকাতা যাচ্ছিস তো একবার তোর লতুখালামাকে দেখা করে আসিস। এ বাড়ির ঠিকানা সানু তার মায়ের কাছেই পেয়েছিল।

লতুখালামার নাম লতিকা বেগম। কোন্ সূত্রে তিনি সানুর খালামা (মাসিমা) হন, সানু তা বিশদ জানত না বা জানতেও তার আগ্রহ ছিল না। লতিকার স্বামী আব্দুল হক চৌধুরি কি একটা বেসরকারি অফিসে চাকরি করতেন। এবার এসে সানু শুনেছিল তিনি রিটায়ার করেছেন। কিন্তু এখনও প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির টাকা নাকি পাননি। তার ছেলের মধ্যে তিনজন কাজকর্ম জোগাড় করে বউ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কেটে পড়েছে। ছোট ছেলে কোন মোটর গ্যারাজের মেকানিক। এখনও বিয়ে করেনি বলে সে সংসারে কিছু সাহায্য করে মাত্র। চার মেয়ের মধ্যে বুলি বড়। বাকি তিনজন বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাত্র জুটছে না। এমন একটা বড়-সড় আর নিত্যনতুন সঙ্কটপূর্ণ সংসারে বুলি কেন তার তিনটে ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে জুটেছে, সানু জানে না।

ঘিঞ্জি গলির ধারে জরাজীর্ণ একটা বাড়ির দোতলায় বড়-ছোট তিনটে ঘরে এমন একটা সংসার। সবসময় হইহল্লা কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। চৌধুরিসাহেবের ছোট ছেলে খোকন ভোরবেলা বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। ছোট ঘরটাতে সে থাকে। একটা তক্তাপোসে তার বিছানা। তার আসবাবপত্র বলতে দুটো যেমন-তেমন চেয়ার, একটা নড়বড়ে টেবিল। দেয়ালে পেরেক পুঁতে নাইলনের দড়ি টানা আছে। ওতেই খোকনের পোশাক ঝোলানো থাকে। বুলি চুপিচুপি সানুকে বলেছিল, খোকনও বিয়ে করে কেটে পড়বে বলে এই ঘরটার দিকে তার মন নেই।

খোকনের বিছানায় সানু শোয়। এই একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। রাতে খোকন মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। তার সারা শরীর থেকে যেন মদের গন্ধ বেরোয়। গা ঘুলিয়ে ওঠে সানুর। তবে খোকন সানুকে একটু সম্মান করে চলে। তা ছাড়া সে মাতলামি করে না। এসেই চুপচাপ শুয়ে পড়ে।

কাঁটালিয়াঘাট থেকে চলে আসার সময় সানু সেখানে যে হিমের ছোঁয়া পেয়েছিল, কলকাতায় অতটা নেই, কিন্তু প্রচন্ড মশার জন্য মশারি খাটাতে হয়। সারা রাত একটা সিলিং ফ্যান অদ্ভুত অস্বস্তিকর শব্দে আস্তে ঘোরে। নিচের গলিতে রিক্শার ঘন্টির শব্দ, মানুষজনের কথাবার্তা, কখনও বস্তিতে সহসা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, মাইক্রোফোনে হিন্দি গান সানুর কানে বেঁধে। ঘুম

ছিঁড়ে যায়। তবু তার মনে হয় এ সবের বাইরে প্রকৃত কলকাতা আছে, যা উজ্জ্বল, সুন্দর আর অনেক সম্ভাবনায় ভরা। তাই এই সব ছোটখাটো অপছন্দ ও খারাপ জিনিসগুলি তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে।...

চিলেকোঠার সিঁড়িতে নামতে নামতে বুলি বলে, বাবু এইমাত্র বাড়ি ফিরে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। মুন্নি বলল তোমাকে ছাদে উঠতে দেখেছে।

সানু কিছু বলে না। কলকাতায় এসে প্রায় তিন সপ্তাহ প্রতিদিন সে টো টো করে ঘুরেছে। ট্রামে-বাসে চেপে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ানো নয়, পায়ে হেঁটে সে খুঁটিয়ে কলকাতা শহরটাকেই যেন বুঝতে চেয়েছে। মাঝে মাঝে তার সহসা মনে হয়েছে, এত বিশাল একটা শহর আর এত সব মানুষ— নিশ্চয় কোন এক সময়ে তাকে কেউ ডেকে নেবে। আপনার এম এ বি এড ডিগ্রি? বাহ্! আসুন, আসুন! আমরা আপনার মতোই একজন পরিশ্রমী সৎ যুবককে খুঁজছিলাম।

আজ সকাল থেকে দুপুর অব্দি চৌরঙ্গি আর ময়দানে ঘোরাঘুরি করে এসে এই মুসলিম মহল্লার একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছিল। তারপর খোকনের বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে ছাদে উঠেছিল। ঈষৎ অন্যমনস্ক ছিল সে—কেন না এই সময়, শীতের এই নরম বিকেলে এখন তার কুতুবপুর হাই স্কুল থেকে পনের কিলোমিটার রাস্তা সাইকেলে চেপে কাঁটালিয়াঘাটে ফেরার কথা। অথচ সে এখন একটা জীর্ণ বাড়ির দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সেই মুহূর্তে নিচের বস্তিতে একটা প্রকান্ড নিমগাছে হাজার-হাজার কাকের ডাক তাকে চমকে দিয়েছিল। শুধু কাঁটালিয়াঘাট কেন, গ্রামাঞ্চলে আজকাল কদাচিৎ কাক চোখে পড়ে। শীতে কাকের গায়ের রঙ মসৃণ কালো হয়ে উঠেছে এবং এত বেশি কাক একসঙ্গে দেখতে পাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। তার চেয়ে বিস্ময়কর যেন তার এই আবিষ্কার, তা হলে গ্রামের সব কাক তারই মতো কলকাতায় চলে এসেছে?

দোতলার অপরিসর বারান্দায় আব্দুল হক চৌধুরি একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। বুলি ঘর থেকে একটা মোড়া এনে দেয়। চৌধুরিসাহেব বলেন, বসো সানু! বুলি, চা এনে দে।

সানু মোড়ায় বসে একটু হাসে। আমার খুব অবাক লাগল! জীবনে একসঙ্গে এত বেশি কাক আমি দেখিনি! বুলিকে বলছিলাম!

তোমার বয়স কত হল?

সানু তাকিয়ে থাকে। কথাটা বুঝতে পারে না।

বলছি, তোমার এজ এখন কত?

সানু একটু অবাক হয়ে বলে, সার্টিফিকেট এজ ছাব্বিশ। একবছর কম

দেখানো আছে।

চৌধুরিসাহেব হাসেন। সাতাশ বছর বয়সেও তুমি দেখছি সাবালক হতে পারোনি। কাক দেখে অবাক হচ্ছ। তোমার এজে আমি অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল ছিলাম।

বুলি চা এনে দেয় সানুকে। বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চারা হই-হল্লা করছিল। চৌধুরিসাহেব তাদের বেজায় ধমক দিলে তারা কাঁচুমাচু মুখে সরে যায়। তিনি বলেন, বুলির কাছে আজ শুনছিলাম তুমি কোথায় মাস্টারি করতে। ছেড়ে দিয়েছ। তা নিজে ছেড়ে দিয়েছ, নাকি ছাড়িয়ে দিয়েছে?

সানু আস্তে বলে, নিজেই রিজাইন দিয়েছি। বাই পোস্ট রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি।

কেন?

সানু একটু চুপ করে থাকার পর বলে, গ্রামে থাকতে ভালো লাগছিল না।

তুমি একটি বেঅকুফ্! চৌধুরীসাহেব রুষ্ট মুখে বলেন। আজকাল যে-কোন একটা চাকরির জন্য মানুষ মাথা ভেঙে মরছে। না পেয়ে চুরিডাকাতি ছিনতাই করতে নামছে। আর তুমি—তাজ্জব!

কলকাতায় একটা কিছু পেয়ে যাব। আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপক রিটায়ার করে কলকাতার বাড়িতে ফিরে এসেছেন। উনি বলতেন, রিটায়ার করে কলকাতায় গিয়ে টিউটোরিয়াল হোম খুলবেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখেই এসেছি।

দেখা করেছ তাঁর সঙ্গে?

করব। ঠিকানাটা জানি। কিন্তু এরিয়াটা—আচ্ছা খালুজি, বিদ্যাসাগর কলেজ কোথায়?

নর্থে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে বীণা সিনেমার কাছে ট্রাম বা বাস থেকে নেমে জিজ্ঞেস করবে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের নাম এখন বিধান সরণি। তোমার অধ্যাপক ভদ্রলোকের নাম কী?

ওঁর নাম অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চৌধুরিসাহেব বাঁকামুখে হাসেন। এটা মফস্বল নয় সানু, কলকাতা। গ্রামে থেকে তুমি কুয়োর ব্যাঙ হয়ে গেছ। দেশের কোন খবর রাখো না। লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি একটু চুপ করে থেকে বলেন, এদিকে আমার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়েছে। এই বাড়িটা একজন অবাঙালি মুসলিমের। সে আমাকে ওঠানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। পানি বন্ধ করে দিয়েছে। রেন্ট কন্ট্রোলারের অফিসে ভাড়া দিচ্ছি কমাস থেকে। গুন্ডা-মস্তান দিয়ে যে-কোন সময় উচ্ছেদ করবে বলে কী ভয়ে যে কাটাচ্ছি বলার নয়।

ওই বস্তি থেকে প্রায়ই ছুতোনাতা ধরে বাঙাল বাঙাল বলে গালাগালি !
আব্দুল হক চৌধুরি ফের চাপা স্বরে বলেন, আরেক প্রব্লেম বুলিকে নিয়ে।

সানু লক্ষ্য করে, বুলি তখনই ঘরে গিয়ে ঢুকল। সে বলে বুলির কী হয়েছে ?

আর কী হবে? বজ্জাতরা যা করে, তা-ই করেছে। চৌধুরি সাহেব শ্বাস ছেড়ে বলেন, জামাইয়ের রেডিমেড পোশাকের দোকান আছে নিউমার্কেট এরিয়ায়। বদমাইস মাতাল একটা! যখন-তখন মারধর অত্যাচার করত। আমার মেয়েকে তো দেখছ। ঠান্ডা মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। মানিয়ে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু গত মাসে হারামজাদা শয়তান বুলিকে তালাক দিয়েছে। চিন্তা কর। তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাবে? আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন। তারপর ওর কী হবে?

সানুর ভেতরটা নড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে উত্তেজনা দমন করে আস্তে বলে, বুলি বলেনি।

চৌধুরি সাহেব চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রেখে বলেন, দেনমোহর-খোর-পোশের দাবিতে মামলা করা যায়। কিন্তু কোর্টে যাওয়া মানেই টাকা খরচ। মামলার নিষ্পত্তি হতে হতে আমি কবরে চলে যাব। উকিলের ফি হেন-তেন খরচাপাতি করার সাধ্য আছে আমার? সে যা-ই হোক, তুমি কিন্তু ভুল করেছ। এমন সাঙ্ঘাতিক ভুল কেউ করে?

আমি জানি। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তো স্ট্রাগ্ল করে আসছি। তাই ভাবলাম, বড় স্ট্রাগ্ল করতে হলে কলকাতা যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!

পাগল! স্ট্রাগ্ল করতে হলে আগে দরকার পা রাখবার একটা জায়গা। গ্রামে তোমার পা রাখবার একটা জায়গা ছিল! কিন্তু এখানে? চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে ওঠেন। আমার অবস্থা তো বললাম। এই তিনটে ঘরে গাদাগাদি করে আছি। খোকনের ঘরের মেঝেয় বুলি তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে শোয়। কখনও কেউ এসে গেলে অগত্যা বুলিকে বোনেদের ঘরে শুতে হয়।

সানু বুঝতে পেরে বলে, আমি শিগগির একটা মেস খুঁজে নিয়ে চলে যাব খালুজি! আমাদের গ্রামের একটা ছেলে করিম বখশ লেনে একটা ছোট্ট ঘর নিয়ে থাকে। প্রাইভেটে এম এ পরীক্ষা দিতে এসে তার ওখানেই ছিলাম। কিন্তু সে ছুটি নিয়ে গ্রামে গেছে। তাই—

না। তোমাকে এখনই চলে যেতে বলছি না। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সানু! তোমার মা আর বুলির মায়ের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক। তোমার আব্বাকে আমি মাত্র একবার দেখেছিলাম! একেবারে মাটির মানুষ

ছিলেন। আমি অবশ্য তোমাদের গ্রামে কখনও যাইনি।

সানু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি এখনই একবার আমার সারের খোঁজ নিয়ে আসি! রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে, শুধু এটুকুই জানি!

চৌধুরিসাহেব বলেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে মুসলিম ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে গিয়ে ট্রামরাস্তায় পড়বে! ট্রামরাস্তা ধরে এগিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ওখানে ট্রাম বা বাস পেয়ে যাবে। বীণা সিনেমার স্টপ। মনে থাকবে তো? বীণা সিনেমা··· !

গলিরাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সানুর মনে হয়, আব্দুল হক চৌধুরী আসলে তাকে আজ জানিয়ে দিতেই ডেকেছিলেন যে, সে তাঁর সংসারে একটা বাড়তি বোঝার মতো এসে বসেছে এবং তাঁর মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে আর এতটুকু বোঝা বইবার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু সানু নিজেকে সেই রকম কোন বোঝা ভাবতে পারছিল না বলেই মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ। তার অন্নবস্ত্রের দায় সে কারও ওপর চাপাতে চায় না। সে চায় শুধু একটু পা রাখার জায়গা। চৌধুরিসাহেব নিজেই বললেন, স্ট্রাগ্‌ল করতে হলে আগে দরকার পা রাখার একটা জায়গা। খোকনের ঘরে সেই জায়গাটুকু তো আপাতত আছে! না হয় বুলিও মেঝেতে তার তিনটে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে শুত!

বোঝা যাচ্ছে, বুলির মায়ের সঙ্গে তার মায়ের রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করলেও চৌধুরিসাহেব তাকে প্রকৃতপক্ষে বাইরের মানুষই গণ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, সানু একজন পুরুষমানুষ। খোকন বুলির সহোদর ভাই। কিন্তু সানু সহোদর ভাই নয়। নৈতিক বাধাটা এখান থেকেই আসছে। এই বাধার যুক্তি হল সানু একজন বহিরাগত যুবক, বুলি একজন যুবতী। একই ঘরে তাদের রাত্রিযাপন অভিপ্রেত হতে পারে না।

সানু মনে মনে একটু হাসে। সমাজ-সংসারে এখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কগত অবস্থানটি খুব অদ্ভুত, কেননা উভয়কে কেন্দ্র করে একটা অবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে আছে। এই অবিশ্বাসের পিছনে সঙ্গত কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু এই অবিশ্বাস কোন কোন ক্ষেত্রে কখনও এমন বিপজ্জনক আর নিষ্ঠুর হতে পারে যে তা মানুষের জীবনকে একেবারে বিভ্রান্ত আর বিপর্যস্ত করে ফেলে। সানুর নিজের জীবনেও ঠিক এমনি ঘটেছে। তাই তাকে কাঁঠালিয়া ঘাট ছেড়ে সুদূর কলকাতায় পালিয়ে আসতে হয়েছে। ছেড়ে দিতে হয়েছে শিক্ষকতার চাকরি, যা কিনা একালে একটি নিশ্চিন্ত ও নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎ।

এখনই সবখানে আলো জ্বলে উঠেছে। এতদিন ধরে এইসব উজ্জ্বলতা আর ভিড় সানুকে যেন আপন করে নিয়েছিল। আজ সে লক্ষ্য করে, কেমন

একা আর অসহায় হয়ে গেছে যেন সে। উজ্জ্বলতাগুলি তার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। মানুষজন আর যানবাহনের ভিড় তাকে ক্রমশ আড়ষ্ট করে ফেলছে। তবু সে বাধা ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে হেঁটে যায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে গিয়ে সে একটু দাঁড়ায়। ট্রামে কিংবা বাসে চাপবে ঠিক করতে পারে না। তা ছাড়া আসন্ন সন্ধ্যায় ট্রামে বাসে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে ওঠা তার দুঃসাধ্য মনে হয়। তাই সে আবার হাঁটতে শুরু করে। ছেলেবেলা থেকেই সে হাঁটতে অভ্যস্ত। কিন্তু পরে সে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড সাইকেলে যাতায়াত করছিল এবং এখন ভাবতে অবাক লাগে, সেই সাইকেলটা ক্রমে কী ভাবে যেন তার জৈব সত্তারই অংশ হয়ে উঠেছিল। সাইকেলটিকে সে প্রায় জলের দরে একজনকে বিক্রি করে দিয়েছে। প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার যন্ত্রণা ও ক্ষত মানুষের শরীরকে কত দিন কষ্ট দেয় কে জানে! তবে ক্ষতচিহ্ন থেকে যায়। কিন্তু না—পিছু ফিরে তাকানো চলবে না। সানু নিজেকে শক্ত করে ফেলে। একটার পর একটা মোড় পেরিয়ে যেতে থাকে সে এবং ক্রমশ আশা তাকে প্ররোচিত করে। তার শুধু মনে হয়, অধ্যাপক ব্যানার্জির মুখোমুখি হতে পারলেই আপাতত একটা লড়াইয়ে সে জিতে যাবে।

বীণা সিনেমার কাছে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগল সে হিসেব করে না। তার হাতে ঘড়িও নেই। বিদ্যাসাগর কলেজ খুঁজে পাওয়ার পর সে রাস্তাটা পেয়ে যায়। নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে সে একটু দাঁড়ায়। চারতলা পুরনো একটা বাড়ি। সামনে ছোট্ট একটা পার্ক। পার্কে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে একদল ছেলে ক্রিকেট খেলছে। ভিড় করে লোকেরা সেই খেলা দেখছে। মাঝে মাঝে তারা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠছে। সানুর মনে আবার উদ্দীপনা ফিরে আসে।

বাড়ি থেকে এক কিশোরী বেরিয়ে আসছিল। সানু তাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, এ বাড়িতে অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জি থাকেন?

মেয়েটি তাকে একবার দেখে নিয়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে, অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জি? নাহ্। এ নামে এখানে কেউ থাকেন বলে জানি না। আপনি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন।

সে চলে যায়। সানু একটু দমে যায়। সারের ঠিকানা সে কলেজ থেকে জোগাড় করে নিয়ে চিঠি লিখেছিল। কলকাতায় নাকি এক ফ্ল্যাটের লোক অন্য ফ্ল্যাটের লোককে চেনে না। নিচের তলায় জানালার পাশে বসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পার্কের খেলা দেখছিলেন। সানু তাঁকে নমস্কার করে বলে, আচ্ছা, অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জিকে চেনেন?

প্রৌঢ় তার কথা শুনতে পান না। তাঁর মুখে হাসি। খেলার দিকে

চোখ। সানু আবার জিজ্ঞেস করলে ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, কে? কী নাম?

আজ্ঞে, অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জি।

অধ্যাপক? কলেজের না ইউনিভার্সিটির?

সানু বিব্রত ভাবে বলে, কলেজের। মানে উনি রিটায়ার করেছেন। এই বাড়ির ঠিকানা—

কী নাম বললেন?

অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জি।

ভদ্রলোকের পাশ থেকে এক যুবতী উঁকি মারে। তারপর বলে, বাবা! উনি হয়তো বাবলিদির বাবার কথা বলছেন। কেন? দোতলায় বাবলিদিরা থাকত না? বাবলিদির বাবা মফস্বলে কোথায় যেন কলেজে পড়াতেন।

ভদ্রলোক বলেন, ও! ভন্টুবাবু! তার নাম অমিয়রঞ্জন ছিল নাকি? আমি তো ভন্টু ব্যানার্জি বলে জানতাম।

যুবতী বলে, ওঁরা তো আর এখানে থাকেন না। গত বছর কোথায় যেন চলে গেলেন। হ্যাঁ—বাবলিদি বলেছিল, লেকটাউনে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে ওরা।

সানু কষ্টে উচ্চারণ করে, লেকটাউন কোথায়?

যুবতী একটু অবাক হয়ে বলে, সে কী! আপনি লেকটাউন চেনেন না? আপনি কোথায় থাকেন?

আমি কলকাতায় নতুন এসেছি। অধ্যাপক ব্যানার্জি আমার সার ছিলেন।

ভদ্রলোক আরও বিরক্ত হয়ে বলেন, বড় রাস্তায় লেকটাউনের মিনিবাস পেয়ে যাবেন। মিনু। আমাকে এক কাপ চা দিবি?

না। আর চা নয়। ডাক্তার তোমাকে চা খেতে নিষেধ করেছেন না? বলে মিনু নামে সেই যুবতী সানুকে বলে, লেকটাউন বিশাল এরিয়া। ঠিকানা না জানা থাকলে আপনি বাবলিদির বাবাকে খুঁজে বের করতে পারবেন না। আপনি বরং কোন দোকান বা ফার্মেসিতে গিয়ে টেলিফোন গাইড খুঁজে দেখুন যদি বাবলিদিরা টেলিফোন নিয়ে থাকে, ঠিকানা পেয়ে যেতেও পারেন…।

তাহলে কলকাতা একটু অন্যরকম। সানু ক্লান্তভাবে হাঁটে। একসঙ্গে হাজার-হাজার কাক, ছাদে পুরুষমানুষ দাঁড়ালে বস্তির লোকেরা গাল দেয়, মুসলিমদের বাঙালি-অবাঙালি, রেন্ট কন্ট্রোল, উচ্ছেদের আশঙ্কা, এইসব থেকে শুরু হয়ে বিকেল থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সহসা অতিদ্রুত কলকাতা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। এখন আরও বেশি অন্যরকম হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সানুর মনে সেই যুবতী ভেসে উঠল। তখন তার মনে

হল; সবকিছুর পরও কলকাতায় 'লেকটাউন' উচ্চারণ করার মতো কেউ তা হলে আছে ?

এবং সে যদি থাকে, তবে কলকাতা এখনও সম্ভাবনার পৃথিবী থেকে যাচ্ছে। ভেঙে পড়লে চলবে কেন সানু ?

নিজেকে আশ্বস্ত করে সে আবার হাঁটতে থাকে।...

চৌধুরীসাহেবের বাসায় ফেরার আগে করিম বখ্‌শ লেনে মইনুলের খোঁজে সানু আবার গিয়েছিল। ঘরে তালা তেমনই আটকানো। একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছিল সানু। টেলিফোন গাইডের কথাটা সে বরং খালুজিকেই বলবে। তাঁর সাহায্য কি সে পাবে না ? জীবনে কখনও টেলিফোন ব্যবহার করেনি সে। তাই এত অস্বস্তি।

আব্দুল হক চৌধুরি ততক্ষণে শুয়ে পড়েছেন। রাত প্রায় দশটা বাজে। পাশের বস্তিতে মাইক্রোফোনে যথারীতি 'হ্যালো' 'হ্যালো'! মাইক টেস্টিং শুরু হয়েছিল। এই এক উপদ্রব।

বারান্দায় লতিকা বেগম, বুলি আর তার তিন বোন সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে ছিলেন। রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে যে-কোন সময় খোকন এসে যাবে। তার জন্য এখন বুলিকেই জেগে থাকতে হয়। কোন-কোন রাতে খোকন বাইরে খেয়ে আসে। তবু তার জন্য খাবার তৈরি রাখতে হয়।

সানুকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেন লতিকা। সানু মাসিমার সামনে চেয়ারে বসে না। একটু তফাতে মেঝেতেই বসে পড়ে। বুলি বলে, তোমার সারকে পেলে ?

সানু একটু হাসে। উনি গত বছর ওখান থেকে লেকটাউনে চলে গেছেন। একটা টেলিফোন গাইড দেখতে হবে। ওতে নিশ্চয় সারের ঠিকানা পেয়ে যাব।

বুলি বলে, লেকটাউনে তোমার সারের নামে অসংখ্য লোক থাকতে পারে। তা ছাড়া ওঁর টেলিফোন যদি থাকে, তবেই না ওঁর খোঁজ শেষ অব্দি পেয়ে যাবে ?

থাকা তো উচিত। শুনলাম নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন সার।

লতিকা বলেন, বুলি! তোর সানুভাইকে খেতে দে আগে।

সানু ব্যস্তভাবে বলে, না। আমি হোটেলে খেয়ে এসেছি। আমার খাওয়ার জন্য চিন্তা করবেন না।

সে কী বাবা ? সেই আসার দিন একবেলা দু মুঠো যা খেলে। তারপর থেকে এতদিন ধরে বাইরেই খাচ্ছ। তোমার মা বেঁচে থাকলে বলত, আমার ছেলেটাকে দুটো খাওয়াতে তোর হাত ওঠে না লতু ?

বুলি হাসে। জানো মা? সানু আজ ছাদে উঠে কাক দেখছিল।

লতিকাও একটু হাসেন। সানুর মা কথায়-কথায় বলত কাঁটলেঘাটের মড়া আর কাঁটলেঘাটের মড়াখেকো কাক। আমি একবার তোমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম। তুমি তখন ছোট্ট। তোমার মা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ হয়েছি! গ্রামে গিয়ে তো আমার দম আটকানো অবস্থা। তবে তোমাদের গ্রামটা খুব বড়ো। ওখানে আবার হিন্দুদের মতো মুসলিমদেরও জাতপাত ছিল। এখন আছে নাকি?

সানু বলে, আর ততটা নেই। তবে আছে। খোন্দকার চাচাজিকে আপনি চিনতেন?

মনে পড়ছে না।

গত মাসে উনি মারা গেছেন। তো ওঁর মধ্যে ভীষণ জাত-পাত ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যেমন বাবুভদ্রলোক, ওঁর মধ্যেও এই ব্যাপারটা ছিল। ওঁর ছোট মেয়ে রেবেকা—ডাকনাম রুবি, তাকে আমি পড়াতাম। রুবির জন্য বর খুঁজছিলেন। লোকেরা এসে ওকে দেখে যেত। পছন্দও করত। কিন্তু খোন্দকার চাচাজি তাদের আদবকায়দা লক্ষ্য করে বলতেন, চাষা! চাষার ঘরে মেয়ে দেব না!

হুঁ। আশরাফ আর আতরাফ। কাঁটলেঘাটে একসময় নাকি আশরাফদের খুব রবরবা ছিল। আতরাফরা তাঁদের সেলাম না দিলে ধমক খেত। কী যেন কথটা—হাঁ, আশরাফরা নিজেদের বলতেন মিয়াঁ'। মিয়াঁরা বসতেন চেয়ারে বা তক্তপোসে। আর আতরাফরা বসত মেঝেতে।

বুলি বলে, অদ্ভুত! মুসলিমরা তো সবাই সমান।

সানু বলে, আমাদের রাঢ় অঞ্চলে কিন্তু এই ভেদাভেদ ছিল। এখন নেই-নেই করেও কিছু আছে।

লতিকা তার কথার ওপর বলেন, ও সব কথা থাক। সানু, তুমি মাস্টারি চাকরি পেয়েছিলে। ছেড়ে দিলে কেন? উনি বলছিলেন, তোমার নাকি গ্রামে থাকতে ভালো লাগছিল না। আমার মনে খট্‌কা লেগেছে বাবা।

সানু একটু চুপ করে থাকার পর বলে, স্কুলে আজকাল নোংরা দলাদলি, রাজনীতি, নানারকম হাঙ্গামা।

তা হলে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলে বলো?

জি হ্যাঁ। কতকটা তা-ই।

একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। বিয়েশাদি করোনি?

সানু বিপন্ন বোধ করে। সে চুপ করে থাকে।

বুলি হাসে। হুঁউ! মুখ দেখে বুঝেছি বাড়িতে বউ আছে। সে-বেচারাকে একা ফেলে রেখে সানু কলকাতা এসেছে যুদ্ধ করতে!

লতিকা বলেন, তা ভালোই করেছ বাবা। বিয়েশাদি না করলে দুনিয়ার দিকে টান থাকে না। সংসার জিনিসটাও চেনা যায় না। কোথায় করলে? গ্রামে না টাউনে? তুমি এম এ পাশ করা ছেলে। বউবিবি নিশ্চয় পাশ করা মেয়ে? তোমার শ্বশুরবাড়ির কথা বলো শুনি।

ঠিক এই সময় পাশের বস্তিতে মাইক্রোফোন বিকট গর্জন করে উঠেছিল। ফলে সানু নিষ্কৃতি পায়। বুলি বলে, নাও! ওই শুরু হল। আমাদের মেটেবুরুজেও এই উৎপাত ছিল। তবে এতটা নয়।

সানু বলে কেউ আপত্তি করে না কেন, এটাই অদ্ভুত লাগে।

আপত্তি করলে ওরা শুনবে? উল্টে গালাগাল তো করবেই, হয় তো মেরে ফ্ল্যাট করে দেবে।

লতিকা তাঁর তিন মেয়ের উদ্দেশে বলেন, আর রাত জাগে না। গিয়ে শুয়ে পড় সব। আমিও জানালা-কপাট বন্ধ করে শুয়ে পড়ি গে। বুলি! তুই বরং এখানে থাক। কখন খোকন এসে নিচে কড়া নাড়বে, শুনতে পাবি না। সানু! তুমি শোও গে বাবা! বুলি মশারি খাটিয়ে রেখেছে।

সানু ক্লান্ত বোধ করছিল। তাছাড়া তার বিয়েশাদি আর শ্বশুরবাড়ির প্রশ্ন তাকে একটু নার্ভাস করেছিল। সে চুপচাপ উঠে যায়। ঘরে ঢুকে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে লুঙি পরে নেয়। তারপর বেরিয়ে এসে বুলির পাশ কাটিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

বাথরুম থেকে ফিরে আসার সময় বুলিকে সে বারান্দায় দেখতে পায় না। বুলি খোকনের ঘরে চেয়ারে বসে ছিল।

সানু তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ-হাত-পা মুছে নেয়। তারপর বলে, খোকন না ফেরা অব্দি তোমাকে এভাবে জেগে থাকতে হয়! তোমার বাচ্চারা বেশ শান্ত।

বুলি আস্তে বলে, মোটেও না। আসলে এ বাড়িতে এসে তারা শান্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে। ওরাও তো মানুষ। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। তুমি কি শুয়ে পড়বে সানু?

সানু আড়ষ্টভাবে হাসে। মাইক্রোফোনের শব্দে ঘুম আসবে না।

আমার অবশ্যি অভ্যাস হয়ে গেছে। কী করব? তুমি স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়তে পারো।

তুমি বসে থাকবে আর আমি শুয়ে পড়ব?

তাহলে এই চেয়ারটাতে বসো। তোমার শ্বশুরবাড়ির কথা শুনি।

সানু চেয়ারে বসে বলে, বলার মতো কিছু নয়। বরং তোমারটা শুনি। খালুজির মুখে মাত্র একটুখানি শুনেছি। আমার খারাপ লেগেছে। শরিয়তি তালাকপ্রথাকে আমি বর্বর মনে করি। কিন্তু এও তো ঠিক, কোন কোন ক্ষেত্রে

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে বিচ্ছেদ যুক্তিসঙ্গত। যেমন ধর, আমার ক্ষেত্রে হয়েছে।

বুলি তাকায়। বউকে তুমি তা হলে তালাক দিয়েছ ?

কথাটি সানুর মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত নিজেকে সামলে নেয়। আস্তে বলে, ব্যাপারটা তোমার মতো অবশ্যি নয়। তার কাচ্চাবাচ্চা নেই। বড়লোকের মেয়ে।

বুলি বাঁকামুখে একটু হাসে। তার হাসিটুকু নিঃশব্দ ছিল। সে বলে, তোমাদের এই পুরুষ জাতটার এক ক্ষুরে মাথা মোড়া। তুমি বলছ কাচ্চাবাচ্চা নেই। কিন্তু আমি যা বলি, সাফ-সাফ মুখের ওপর বলি। তুমি কী করে জানলে তোমার বউয়ের পেটে কাচ্চাকাচ্চা নেই ?

সানু অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, আমার বিয়ে হয়েছিল গত ডিসেম্বরে। রেজিনাকে বেশ কয়েকবার মেডিক্যাল চেক-আপ করানো হয়েছিল। কলকাতাতেও সব ডাক্তারই বলেছিলেন, তার বাচ্চা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সেইজন্য তুমি তাকে তালাক দিয়েছ ? বাহ্ !

না। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বুলি ; আমি ওকে কখনই তালাক দিতে চাইনি। সানুর কন্ঠস্বরে ছটফটানি ছিল। সে শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, একটা তুচ্ছ কারণে রেজিনা নিজেই গত মাসে বাপের বাড়ি চলে গেল। অকারণ সন্দেহ।

কী সন্দেহ ?

খোন্দকার চাচাজির কথা বলছিলাম। তাঁর মেয়ে রুবিকে আমি বছর তিনেক প্রাইভেট পড়িয়েছিলাম। ভাল ছাত্রী ছিল। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষের এক কদর্য স্বভাব। আড়ালে তারা আমাকে আর রুবিকে জড়িয়ে স্ক্যান্ডাল রটাত। আমার বিয়ের পরও তা বন্ধ হয়নি। রেজিনা তা-ই নিয়ে আমার সঙ্গে যখন-তখন ঝগড়া করত।

স্ক্যান্ডাল এমনি এমনি রটে না সানু ! বাজে কথা বোলো না ! নিজের দোষ ঢাকতে এসব সাফাই গাওয়ার অভ্যাস তোমাদের আছে। আমি জানি !

বিশ্বাস করা-না করা তোমার ইচ্ছে। তবে যা মিথ্যে, তা মিথ্যে। সানু দম নিয়ে ফের বলে, আমাদের গ্রামে কালীপুজোয় খুব ধুম হয়। শ্মশানতলায় কঙ্কালের নাচ আর বাজি পোড়ানো দেখতে এলাকার মানুষ গিয়ে ভিড় করে। তো হঠাৎ তার দুদিন আগে খোন্দকার চাচাজির সঙ্গে দেখা হল। ওঁর স্ত্রী আমাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। সেই সময় রুবি আমাকে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা এনে দিতে বলল।

স্বর্ণচাঁপার চারা ? বাহ্ ! তারপর ?

আসলে রুবিকে যখন পড়াতাম, তখন সে নানারকম ফুলের চারা এনে দিতে বলত। ওটা ওর হবি। তো রুবি অনেস্টলি স্বর্ণচাঁপার চারা চেয়েছিল। আমি অনেক খুঁজে একটা জোগাড় করে আনলাম। সেটা রেজিনা জোর করে আমার বাড়িতে পুঁতে দিল। ব্যস! সেই শুরু। ক্রমে রেজিনা ফেরোশাস হয়ে উঠেছিল। খোন্দকার চাচাজির লাশ এসেছে টাউনের নার্সিং হোম থেকে। সারা গ্রামে শোক আর সেইদিন রেজিনা বাপের বাড়ি চলে গেল।

আর অমনই তুমি তাকে—

না। কথাটা শেষ করতে দাও। রেজিনাদের গ্রামের স্কুল আমার চাকরির জন্য তিরিশহাজার টাকা ডোনেশন চেয়েছিল। আমার শ্বশুর সেই টাকা দিয়েছিলেন। তার বদলে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছিল। রেজিনা আমাকে প্রায় এ নিয়ে খোঁটা দিত। আবার বলত, তুমি তো আমাকে বিয়ে করনি, করেছ চাকরিকে।

বলতেই পারে। ব্যাপারটা তো ঠিক তা-ই।

সানু একটু হাসে। কিন্তু সেজন্যও আমি তাকে তালাক দেবার কথা ভাবিনি। শুধু রাগ করে ওর জিনিসপত্র ফেরত পাঠিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে ওগুলো ফেরত নেবে না। তখনই ফিরে আসবে। কিন্তু সে এল না। তারপর এল তার একটা অত্যন্ত কদর্য চিঠি।

সেই মেয়েটিকে জড়িয়ে?

হ্যাঁ, চিঠিটা পড়তে পারা যায় না, এত কুৎসিত ভাষা। আমি তো মানুষ, বুলি! চিঠিটা রেজিনা একটা লোকের হাতে পাঠিয়েছিল। আমি বাড়িতে ছিলাম না। ফিরে এসে চিঠিটা পেলাম। তখর রাত প্রায় সাড়ে নটা। চিঠিটা পড়ে মাথায় আগুন ধরে গেল। তখনই মসজিদে গিয়ে মৌলবি সাহেবকে দিয়ে তালাকনামার মুসাবিদা করালাম। তিনজন সাক্ষীর টিপসই দিয়ে পরদিন ডাকে সেটা পাঠিয়ে দিলাম। তারপর স্কুলে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে কলকাতা চলে এলাম।

বুঝলাম। খুব ভালো কাজ করেছ! এই না হলে পুরুষ?

মনে হচ্ছে তুমি বোঝনি বুলি! তোমার ব্যাপারটা অন্যরকম। আমারটা তা নয়। রেজিনা বড়লোকের আদুরে মেয়ে। ইচ্ছে করলেই তার বাপ আবার কোথাও তার বিয়ে দিতে পারবে। টাকা আর ক্ষমতা দুই-ই তার আছে। সানু জোরে শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, আমার চাকরি ছাড়ার কারণও তোমার বোঝা উচিত বুলি!

মাইক্রোফোনের শব্দ সহসা একটু থামার দরুন নিচের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। বুলি তখনই উঠে গেল। খোকন এসে গেছে।...

টেলিফোন গাইড লেকটাউনের অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপকের খোঁজ দিতে পারেনি। আরও দুটো দিন সানু পায়ে হেঁটে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। তাদের গ্রামের হাবল কাজির জামাই হাসান মোরশেদের সঙ্গে কালীপুজোর সময় আলাপ হয়েছিল। মোরশেদ উচ্চশিক্ষিত এবং বড় ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে বিদেশে ঘোরেন। পাইপ টানেন। আধুনিক মনের মানুষ। এ সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে জীবনে একটা কিছু ঘটে যেত, সানুর এরকম মনে হয়। অথচ তাঁর ঠিকানা সে জানে না। কাঁটালিয়াঘাট থেকে চলে আসার সময় যদি বুদ্ধি করে তাঁর শ্বশুরের কাছে ঠিকানাটা জেনে আসত! এই বিশাল আর জটিল একটা শহরে তাকে খুঁজে বের করার আশা শেষ অব্দি সানু ছেড়ে দেয়।

তাহলে কি তাকে আবার ফিরে যেতে হবে? সে কী করবে বুঝতে পারে না। বুলিদের বাড়িতে আর তার থাকা উচিত হচ্ছে না। তার জীবনের একটা শোচনীয় ঘটনা বুলির জীবনের শোচনীয় ঘটনার কাছে অতি তুচ্ছ, বুলির কথাবার্তায় সে তা বুঝতে পারে। বুলি তার দিকে এখন অন্য দৃষ্টিতে তাকায়। যেন সে বলতে চায়, এই দেখ আরেকজন সাংঘাতিক পুরুষ—কেন না সে বউকে তালাক দিয়েছে।

না—বুলিকে কথাটা বলে ফেলা তার উচিত হয়নি। ওকে কী করে বোঝাব একই শরিয়তি প্রথা এক‍েকটি ক্ষেত্রে একেক পরিণাম ডেকে আনে?

এক সন্ধ্যায় সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত সানু আবার করিম বখ্‌শ লেনে মইনুলের খোঁজে যায়। অবশেষে তাকে দেখতে পায়। সানুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, ওঃ তোর জন্য রোজ দুবেলা আসি আর ফিরে যাই। তুই ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছিস আমি জানতাম না।

মইনুল ভুরু কুঁচকে তাকে দেখছিল।

সানু বলে কী রে? অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?

মইনুল গম্ভীর মুখে বলে, সানু! তুই আমাকে বিপদে ফেলিস না।

তার মানে?

মইনুল খেঁকিয়ে ওঠে। ন্যাকা! কিছু জানো না? পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছ। আর—

সানু তার বিছানায় বসে পড়ে। অবাক হয়ে বলে, পুলিশের ভয়ে আমি গাঢাকা দিয়ে বেড়াব কেন রে? কী করেছি আমি?

মইনুল একটু চুপ করে থাকার পর বলে, হাশিম মীরের মেয়েকে তালাক দিয়ে কলকাতায় কেটে পড়েছিস। ওদিকে কী হয়েছে জানিস তুই?

কী হয়েছে?

মীর তোর নামে তার মেয়ের দেনমোহর আর খোরপোশের দায়ে কোর্টে

মামলা করেছে।

সে কী!

ন্যাকামি করবিনে। তালাক দিলে দেনমোহর আর ইদ্দতকাল তিনমাস দশদিনের খোরপোশ মিটিয়ে দিতে হয় এটুকু জানিস না?

জানি। কিন্তু রেজিনা তো বড়লোকের মেয়ে। আমি গরিব—মানে, আবার গরিব হয়ে গেছি।

মইনুল সিগারেট ধরিয়ে বলে, তোর বিয়ের সময় সরকারি কাজি বিয়ের কাবিলনামা লিখেছিল। তাতে কত দেনমোহর ধার্য ছিল জানিস না তুই? স্ত্রীকে ত্যাগ করলে দেনমোহর দিতে হয়, তা জানিস না?

সানু স্মরণ করার চেষ্টা করে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কাবিলনামায় সই করেছিলাম এই পর্যন্ত। আসলে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। একটা চাকরির জন্য বিয়েটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। দেনমোহর—

দেনমোহর ধার্য হয়েছিল তিরিশ হাজার একটাকা। সেই টাকার দাবিতে মীর মামলা করেছে। গত পরশু মামলার ডেট ছিল। তুই হাজির ছিলি না কোর্টে। তাই তোর নামে বডিওয়ারেণ্ট ইস্যু হয়েছে। এখন বাঁচতে চাস তো শিগগির গ্রামে ফিরে যা। গিয়ে গ্রামের মাথা-মাথা লোককে ধরে মীমাংসার ব্যবস্থা কর। মইনুল সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে ফের বলে, কুতুবপুরের হাশিম মীর দুর্ধর্ষ লোক। তার ওপর পলিটিসিয়ান। ইচ্ছে করলে সে যা খুশি করতে পারে।

সানু কী বলবে খুঁজে পায় না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মইনুল বলে, তুই বাড়িতে ছিলি না। তাই তোর বাড়ির দরজায় কোর্টের লোক গিয়ে সমন সেঁটে দিয়ে এসেছিল। তার চেয়ে স্ক্যান্ডালাস ঘটনা, মীর কোর্টে মবিন খোন্দকারের মেয়ে রেবেকার তোকে লেখা চিঠি প্রোডিউস করেছে। তার বক্তব্য, এই মেয়েটার জন্যই তার মেয়েকে তুই বেআইনিভাবে তালাক দিয়েছিস। শরিয়তি আইনে তালাক সিদ্ধ। কিন্তু কোর্ট ন্যাচারালি ধরে নিয়েছে, মীরের কথা সত্য। কাজেই দেনমোহর খোরপোশ আর কোর্টের খরচ আইনত তোকে মেটাতেই হবে। কমপক্ষে পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার ধাক্কা। এদিকে সারা গ্রামে হুলস্থূল। তুই আজ রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যা। দরকার হলে মীরের হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে নে।

সানু পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে যায়…

১৪

এই যে আইনজীবী !

প্রমথনাথ ছুটির বিকেলে গঙ্গার ধারে শ্মশানতলার দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। গলাবন্ধ কোট, গলায় মাফলার, পরনে ধুতি, পায়ে পশমের মোজা আর পামসু। হাতে যথারীতি একটি ছড়ি ছিল। ঘুরে দেখে হেসে ওঠেন। আরে ফজু মিয়াঁ যে! আমি ভাবলাম শ্মশানতলার কোন ভূত তোমাকে নকল করে ডাকছে !

ঢিলে প্যান্টশার্টপরা ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি তাঁর লম্বাচওড়া শরীর নিয়ে কাছে যান। অভ্যাসমতো গোঁফে তা দিতে দিতে বলেন, তুমি দেখছি বড্ড শীত-কাতুরে! নাকি শীতের নামে মামলা ঠুকে দেবার ফন্দি আঁটছ এখানে এসে ?

প্রমথনাথ বলেন, তোমার মতো দশাসই মিলিটারি বডি থাকলে—

উঁহু! রেলের বডি হে! তলায় চাকা লাগানো। কিন্তু চাকা জ্যাম হয়ে গেছে।

তা তো বুঝতেই পারছি। তা না হলে বোনের বাড়ি এসে আটকে যাবে কেন? প্রমথনাথ বলেন, হ্যাঁ। কাল দুর্গাপুর থেকে খুকুর চিঠি এসেছে। খুকু লিখেছে ইউনিভার্সাল আঙ্কেল আছেন, না চলে গেছেন? থাকলে পরে যেন তাকে বলি, দুর্গাপুরে একবার বেড়াতে আসেন।

ফয়েজুদ্দিন সে-কথায় কান না দিয়ে বলেন, বউকে তালাক দিয়ে সানু তোমার সঙ্গে কনসাল্ট করতে এসেছিল শুনেছি।

ও হ্যাঁ! এসেছিল। তা আমি তখন আর কী করতে পারি তুমি বল? হাতের ঢিল ছুড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সানুর শ্বশুর তোমার মক্কেল !

প্রমথনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, প্রব্লেম হল, তোমাদের মোহামেডান ল আমি বিশেষ বুঝি না। আমার জুনিয়ার মফেজুদ্দিন এসব কেস ডিল করে। তবে কুতুবপুরের হাশিম মীর কেমন লোক, তা তুমি ভালোই জানো ফজু মিয়াঁ। তার চাইতে স্ক্যান্ডালাস ব্যাপার হল—

ফয়েজুদ্দিন দ্রুত বলেন, সানুকে লেখা আমার ভাগনির একটা নির্দোষ চিঠি।

প্রমথনাথ হাসেন। আমি খবর পেয়েছি, সানুর জন্য না হোক, ভাগনির স্বার্থে একজন অ্যাডভোকেট তুমি আড়ালে থেকে দাঁড় করিয়েছ। তাঁর বক্তব্য,

মোহামেডান ল-এর দেনমোহর সংক্রান্ত বিষয়টি বরের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করেই ধার্য হয়। এক্ষেত্রে সেই শরিয়তি রীতি মানা হয়নি।

কখনই হয়নি। ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্সের পক্ষ থেকে ফতোয়ার দাবি করেছেন অ্যাডভোকেট আইনুল হক। কিন্তু যা বুঝলাম, দি কোর্ট ইজ অলরেডি প্রেজুডিসড। রুবির চিঠিটা! ফয়েজুদ্দিন হাঁটতে হাঁটতে বলেন, প্রমথ। তুমি আমার বন্ধু মানুষ। আমার ভগ্নপতি মবিন খোন্দকারও ছিলেন তোমার একসময়কার ঘনিষ্ঠ লোক। এখন তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর ছোট মেয়ে রুবিকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। তার নামে এবার প্রকাশ্যে স্ক্যান্ডাল। আমি হাইকোর্ট কেন, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।

তুমি কি আমাকে থেট্রনিং দিচ্ছ ফজু মিয়াঁ?

ফয়েজুদ্দিন তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেন, প্রমথ! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। শুধু একটা কথাই চিন্তা কর। আইন কি মানুষের জন্য, নাকি আইনের জন্য মানুষ?

তুমি আমাকে কী করতে বলছ শোনা যাক।

ফয়েজুদ্দিন থমকে দাঁড়ান। একটা কাজ তুমি করতে পারো। সানুর পক্ষের অ্যাডভোকেটের সওয়াল যাতে কোর্ট গ্রাহ্য করে, তুমি অন্তত এটুকু করতে পারো। তিনি তাঁর সেই অট্টহাসিটি হাসেন। ভাই প্রমথ! তোমাকে ঠাট্টা করে আইনজীবী বলি। আইনের জিভ তোমার হাতে। জিভটা একটু এদিক ওদিক করলেই কাজ হবে।

প্রমথনাথ চিন্তিতভাবে বলেন, হাশিম মীরের যা মনোভাব, তাতে আমার ধারণা, সে তেমন কিছু দেখলে অন্য অ্যাডভোকেট দেবে। কেন বুঝতে পারছ না এ তার প্রেসটিজের লড়াই?

হুঁ। তা ঠিক। তবে এটা আমারও প্রেসটিজের লড়াই হয়ে গেছে। কারণ নিছক একটা দেনমোহর খোরপোশের মামলায় আমার ভাগনির নাম জড়িয়ে গেছে। প্রমথ! আমার ভয় হচ্ছে, মেয়েটাকে হয়তো চিরজীবনের জন্য আইবুড়ি থেকে যেতে হবে।

প্রমথনাথ একটু হাসেন। কেন? সানুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে মীরের মেয়ের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেই তো—

না প্রমথ। কাজটা অত সহজ নয়।

স্ক্যান্ডাল সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এই তো? হোক না। তাতে আর কী আসবে যাবে তখন?

সানুকে তুমি চেনো না হে।

সে নাকি গাঢাকা দিয়েছে। তার নামে বডিওয়ারেন্ট জারি করেছে কোর্ট।

তাকে হাজির হতে বল।

ফয়েজ্‌উদ্দিন আস্তে বলেন, হারামজাদাকে পাচ্ছি কোথায়? সে নাকি কলকাতা গেছে নতুন করে স্ট্রাগ্‌ল করতে। আর শেখপাড়া মসজিদের মৌলবিও এমন অজ্ঞ যে, তাকে বলেননি, স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে দেনমোহর খোরপোশ মিটিয়ে দিতে হয়। সানুটা এত নির্বোধ, কল্পনাও করিনি। মৌলবির আর কী? তালাকের কথায় নেচে উঠেছিলেন। ধর তক্তা, মার পেরেক! আবার ইসলামি শাস্ত্রেই আছে, তালাক শব্দে নাকি আল্লার আসন কেঁপে ওঠে। প্যারাডক্স!

কাগজে কোর্টের নির্দেশে বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। সানুর চোখে পড়া উচিত ছিল।

মফস্বলের কাগজে বিজ্ঞাপন!

মফস্বল কোর্টের মামলায় সেটাই তো নিয়ম ফজু মিয়াঁ।

তুমি—আরে! বেরাস্তায় পা বাড়াচ্ছ কেন?

প্রমথনাথ বাঁকা মুখে বলেন, গঙ্গার ধারে গভর্মেন্ট বৃন্দাবনলীলার কেলিকুঞ্জ তৈরি করে দিয়েছেন জানো না? বাঁক পেরিয়ে টাউনশিপের পাশের দিকটা লক্ষ্য করে দেখো! সব জোড় বেঁধে বসে আছে। এটা গ্রাম, না শহর? শহরেও চক্ষুলজ্জা আছে। এই কাঁটালিয়াঘাটে ওই জিনিসটা আর নেই।

ফয়েজ্‌উদ্দিন তাঁকে অনুসরণ করে বলেন, পৃথিবীতে ভালো জিনিসের সঙ্গে মন্দ জিনিস জড়িয়ে মড়িয়ে আছে। মন্দের দিকে চোখ না দিলেই হল। তোমার চোখ—কী একটা কথা আছে না? চোরের নজর বোঁচকার দিকে।

প্রমথনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলেন। না হে! এ বয়সে চোখের সেই নজর আর নেই।

তা হলে তোমার চোখে পড়ে কেন?

তোমার পড়ে না?

পড়লেই বা কী? যৌবনের ধর্ম যৌবন মেনে চলবে। তুমি আটকাবে কেমন করে?

কী আশ্চর্য! তুমি এ ধরনের নির্লজ্জ মেলামেশা সমর্থন কর ফজু মিয়াঁ?

দেখ ভাই প্রমথ! আমি অনেক কিছুই সমর্থন করি না। অথচ সেগুলো ঘটে।

বেশ। তা হলে আর কিছু না পারি, সেগুলোর নিন্দা করতে তো পারি।

তোমার আমার নিন্দায় বয়ে গেল! ফয়েজ্‌উদ্দিন বুড়ো আঙুল দেখান। আমি তোমার মতো সংসারী মানুষ নই। রেলে চাকরি করতাম। শরীরে

ঢাকা গজিয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য বেমক্কা নিজের বোনের সংসারে জড়িয়ে গিয়ে আমার লেজে গোবরে অবস্থা! এখন কারা কোথায় বৃন্দাবন-লীলা করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়ার ফুরসত কোথায়? তা হ্যাঁ হে প্রমথ, তুমি তো আইনজীভী লোক। আইনের জিভটা ওই কেলিকুঞ্জের দিকে ঘুরিয়ে দাও না কেন? পাবলিক নুইসেন্স নিয়ে একটা আইন আছে না?

বলেছ ভালো! প্রমথনাথ খুব হাসেন। তারপর বোম মেরে আমাকে ছাতু করে দিক। আজকাল রাজনীতির মতো প্রেম-টেমের জন্যও ফায়ারআর্মস দরকার হয়।

একটা পোড়ো জমি আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ। একটু পরে প্রমথনাথ বলেন, এই জমিটা মোহনলালজি আর ঘাটোয়ারি চৌবেজি রেষারেষি করে কিনতে চাইছেন। তেরোকাঠার দাম উঠেছে সাড়ে তিন লাখ। চিন্তা করতে পারো? কাঁটালিয়াঘাট কী ছিল, কী হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর দশ-পনের বছর পরে দেখবে, টাউন হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে।

অতদিন বেঁচে থাকলে তো?

হুঁ। ঠিক বলেছ।

ব্লক অফিস এলাকার পিচ রাস্তায় পেঁছে ফয়েজুদ্দিন বলেন, সানুর নামে বডিওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। তো এখন পুলিশ ওকে দেখতে পেলেই অ্যারেস্ট করে কোর্টে তুলবে। তাই না?

হ্যাঁ! তবে আইনের ফাঁকফোকর অবশ্যি আছে। একমাস কলকাতার কোন নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিল, এই মর্মে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারলে অসুবিধে নেই। তা ছাড়া জামিনযোগ্য কেস।

নেক্সট ডেট পড়েছে দোসরা জানুয়ারি। ওই সময়ের মধ্যে সানুকে না পেলে কোর্ট নাকি তার প্রপার্টি ক্রোকের হুকুম দিতে পারে?

তা পারে।

তুমি অন্তত এটুকু ঠেকাতে পারো না প্রমথ? একটু ডিলেডিলিং প্রসেসে—

আমি চেষ্টা করব ফজু মিয়াঁ! আফটার অল সানু আমাদের গ্রামের ছেলে। তুমি জানো? হাশিম মীরের মেয়ে চলে যাওয়ার পর মীর আমার কাছে গিয়েছিল। জামাই তার মেয়েকে মারধর করে গয়নাগাটি কেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে মামলা করা যায় কি না। সানুকে আমি এ কথা জানিয়েছিলাম।

তারপর?

মীরকে আমি সেবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছিলাম।

কিন্তু তারপরও হারামজাদা সানু কোন্ সাহসে হঠাৎ তালাক দিয়ে বসল জিজ্ঞেস করনি?

করেছিলাম। প্রমথ আবার খুব গম্ভীর হয়ে ওঠেন। চাপা গলায় বলেন, সানু আমাকে একটা চিঠি দেখিয়েছিল।

কার চিঠি?

হাশিম মীরের মেয়ের। সত্যি ফজু মিয়াঁ! মেয়েটা একেবারে মেন্টাল পেশেন্ট! কী জঘন্য ভাষায় তোমার ভাগনিকে সানুর সঙ্গে জড়িয়ে—নাহ্। থাক ওসব কথা! আমি বুঝতে পেরেছিলাম কেন সানু খেপে গিয়ে তালাক দিয়েছে।

সেই চিঠিটা সানুর পক্ষে যায় তা হলে?

যায়। তবে তোমার ভাগনির স্ক্যান্ডাল তাতে আরও বেড়ে যাবে।

বাড়ুক না।

কী বলছ তুমি? একটু আগে বলেছিলে, সানুর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া সহজ নয়। অথচ এখন বলছ—নাহ্! আমি বুঝতে পারছি না ফজু মিয়াঁ তুমি কী চাও। তুমি কী চাও তোমার ভাগনি চিরজীবন আইবুড়ি থেকে যাক?

আমাকে ক্ষমা কর প্রমথ! আমার মাথার ভেতরটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, চলি।

বলে ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি হন হন করে ঘাটবাজারের দিকে এগিয়ে যান। প্রমথনাথ একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবুপাড়ার দিকে হাঁটতে থাকেন।

ঘাটবাজারে এখনই আলো জ্বলে উঠেছে। মানুষজন আর যানবাহনের ভিড়, টেপরেকর্ডারে যথেচ্ছ তুমুল গানবাজনা, সব মিলিয়ে একটা অসহ্য পরিবেশ। ফয়েজুদ্দিন শর্টকাটে তিনরাস্তার মোড়ে বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির কাছে পৌঁছান। সেই সময় কেউ ডাকে, ফজু মিয়াঁ! ফজু মিয়াঁ!

ফয়েজুদ্দিন ঘুরে দেখেন, হাবল কাজি হন্তদন্ত আসছেন। চিবুকে কাঁচা-পাকা দাড়ি, গায়ে সার্জের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি আর গলায় শাল জড়ানো। কাছে এসে বলেন, সোনাইতলা ইটখোলা থেকে আসছি! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। চল! যেতে যেতে বলছি। খবর আছে।

ফয়েজুদ্দিন হাসেন। তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তো খালি খবর আর খবর!

কাজিসাহেব বলেন, আলম মির্জার গাফিলতির জন্য এ বছর দাদাপীরের উরস আর মেলা করা গেল না। এখনও হাজার দশেক ইটের দরকার। আলম নরেনবাবুর ইটখোলায় অর্ডার দিয়েছিল। এখন নরেনবাবু বলছেন, জানুয়ারির মাঝামাঝি না হলে ইট দিতে পারবেন না। তাই সোনাইতলায় গিয়েছিলাম।

ফয়েজুদ্দিন অন্যমনস্কভাবে বলেন, হুঁ।

ওখানে কুতুবপুরের হাশিম মীরের ছোট ছেলে দানিয়েলের ইটখোলা

আছে। তো শুনেছিলাম, সানু তার শ্বশুরের দেওয়া দশহাজার ইট ফেরত পাঠিয়েছে। সেই ইটগুলো যদি পাওয়া যায়। বুঝলে না? মেয়ে-জামাইয়ের-ঘরের জন্য পাঠানো একনম্বর সলিড মাল।

হুঁ।

গিয়ে শুনি, ইটগুলো বিক্রি করে দিয়েছে।

এই তোমার খবর?

কাজিসাহেব চাপা স্বরে বলেন, আরে না না! আসল খবর তো বলাই হয়নি।

বেশ! বল!

হাবল কাজি মোরাম রাস্তায় থমকে দাঁড়ান। গোপনকথা বলার ভঙ্গিতে বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার জানো? দানিয়েলের ঘরে সানু হতভাগা বসে আছে দেখে এলাম।

ফয়েজুদ্দিন তাঁর দিকে তাকান। দিনশেষের আবছা আঁধারে তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল। খুব আস্তে বলেন, সানু?

হ্যাঁ। সানু! কাজিসাহেব উত্তেজনায় ছটফটিয়ে বলেন, আমি ঘরে ঢুকিনি। বাঘের ঘরে ছাগল ঢুকে বসে আছে হে ফজু মিয়াঁ! সানুর নামে দানিয়েলের বাপ মামলা করেছে। বডিওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। আর সানু— ওঃ ভাবা যায় না!

সানু তোমাকে দেখতে পেয়েছিল?

পাবে না কেন? আমি দানিয়েলের আপিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চোখে চোখ পড়তেই সানু মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ফয়েজুদ্দিন পা বাড়িয়ে বলেন, দানিয়েল কলেজে সানুর ক্লাসফ্রেন্ড ছিল শুনেছি। সে-ই নাকি নিজের বোনের বিয়ের ঘটকালি করেছিল।

আমার ধারণা, সানু যেভাবে হোক খবর পেয়ে এবার তার ছোটশালাকে সাধতে গেছে। কাজিসাহেবের পকেট থেকে ধুতির কোঁচা খসে পড়েছি। কোঁচাটুকু আবার পকেটে ঢুকিয়ে বলেন, মিটমাট যদি হয়ে যায়, সে তো ভালোই। কী বল?

হুঁ।

তোমার হল কী ফজু মিয়াঁ? খালি হুঁ দিয়ে যাচ্ছ।

আর কী বলব? সানু তার বন্ধুকে ধরে মিটমাট করে নিতে চাইলে আমার আর কী বলার আছে?

মিটমাট হবে। কিন্তু তলাক তো রদ হবে না। দানিয়েল তার বোনকে ফের কারও সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পর সে যদি স্বেচ্ছায় মেয়েটাকে তালাক দেয়, তবেই তার তিনমাস দশদিন পরে সানু আবার বিয়ে করে মীরের মেয়েকে ঘরে

তুলতে পারবে। এই হল শরিয়তি আইন। তবে হাশিম মীরের অসাধ্য কিছু নেই। ধর, নিজের কোন চাকর-বাকরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। নামকা ওয়াস্তে বিয়ে!

সানুর তালাকের পর এখনও তিনমাস দশদিন হয়নি কাজিসাহেব!

ওয়েট করবে। হাবল কাজি হাসতে গিয়ে গম্ভীর হল। কিন্তু সানুর যদি লজ্জাশরম থাকে, ফেলে দেওয়া থুতু আবার চাটবে না। আফটার অল, সানুর বাপ মীর আব্দুল গফুর আমাদের দূরসম্পর্কের ভাই ছিল। আমাদের খানদানি ইজ্জত বরবাদ হোক, এটা আমি চাইনে ফজু মিয়াঁ।

ফয়েজুদ্দিন সহসা রুষ্ট হয়ে বলেন, খানদানি ইজ্জতের কথা বলছ হাবল? সেই কথাটা মাথায় থাকলে নির্বোধ সানুর জন্য কোর্টে একজন ল-ইয়ার দাঁড় করাতে!

হাবল কাজি শুকনো হাসি হাসেন। অ্যাডভোকেট আইনুল হক তো সানুর হয়ে দাঁড়িয়েছে কোর্টে। আমি সে খবরও রাখি না ভাবছ? অবশ্যি তুমি নিজের ভাগনির স্বার্থে সানুর হয়ে লড়তেই পারো। তবে আমি তোমাকে কবে বলেছিলাম, রুবির সঙ্গে সানুর বিয়েটা দিয়ে দাও। শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তা তোমাকে ধরতে হচ্ছে কি না বল?

না। ফয়েজুদ্দিন শব্দটি খুব শক্তভাবে উচ্চারণ করেন।

না বলছ কেন ফজু মিয়াঁ? আমরা তোমার পাশে আছি। বিশ্বাস কর!

কিছুক্ষণ পরে সুলতানি মসজিদের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটার তলায় পৌঁছে ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরী বলেন, আমার ভাগনি রেবেকা সানুর ছাত্রী ছিল। সানুকে সে 'সার' বলত। এখনও সানু তার কাছে একজন সার। রুবি যদি তার সারকে বিয়ে করতে না চায়? কাজিসাহেব! আমিও তোমাকে কী বলেছিলাম মনে আছে? মেয়েরা গাছের ফল নয় যে টুপ করে পেড়ে কারও হাতে তুলে দেব। মেয়েরাও মানুষ।

তোমার যা ইচ্ছে!

কথাটি বলে হাবল কাজি জোরে পা ফেলে এগিয়ে যান, ফয়েজুদ্দিন আস্তে হাঁটছিলেন। সানু তা হলে কলকাতায় কারও কাছে মামলার খবর পেয়ে ছুটে এসেছে! কিন্তু সে তাঁর কাছে না এসে তার বন্ধুর কাছে গেল কেন? দুঃখে অভিমানে ক্ষোভে চঞ্চল ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। উত্তেজনার সময় এই তাঁর এক অভ্যাস।

এদিন সন্ধ্যায় টিভি-তে একটা জমকালো ফিল্ম ছিল। 'নাচগান মারপিট ঢিসুম ঢিসুম'—রেবেকা যেমন বলে। ফিল্ম বন্ধ করে বাংলা খবর পড়ার সময় সহসা লোডশেডিং। বাড়ির কাজের মেয়ে সামিরুন চাদর মুড়ি দিয়ে মেঝেতে

বসে ছিল এবং রেবেকা বিছানায় পা ছড়িয়ে দিয়েছিল। পিঠের দিকে খাটের বাজুতে একটা বালিশ। সামিরুন বলে উঠেছিল, যাঃ!

সেই কালীপুজোর পর থেকে আবার যখন-তখন লোডশেডিং শুরু হয়েছিল কাটালিয়াঘাটে। ইদানীং কিছুদিন এই উপদ্রব ছিল না। তাই লন্ঠন বা হেরিকেন তৈরি রাখা হয় নি। বারান্দা থেকে রোকেয়া বেগম ডাকছিলেন, সামিরুন! সামিরুন!

যাই মাজি!

হেরিকেন জেবলে রাখতে কী হয়? অ্যাঁ? হারামজাদি মেয়েটাকে রোজ পইপই করে বলে রাখি, মগরেবের নামাজের সময়ে হেরিকেন জেবলে রাখবি। শুনতে পাস নে? কানে কালা হয়েছিস?

রেবেকা টিভির সুইচ অফ করছিল টর্চের আলোয়। বেরিয়ে এসে বলে, মিথ্যা ওকে দোষ দেবেন না আম্মি! আপনি কবে বলেছিলেন হেরিকেন জেবলে রাখতে, তা মনে আছে? সেই নভেম্বরে। এক মাস আগে।

রোকেয়া মেয়ের কথায় চটে যান। হুঁ, চোরের সাক্ষী মাতাল!

কী আশ্চর্য! ও আম্মি! আমি মদ কোথায় পাব যে খাব? রেবেকা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। তবে মাতাল সাজতে আমি পারি! দেখিয়ে দেব?

কিশোরী সামিরুন হেরিকেন জবালতে রান্নাঘরে ছুটে যাচ্ছিল। সেখানে দেশলাই আছে। যাবার সময় সে হেসে ওঠে। রোকেয়া আরও চটে গিয়ে বলেন, বেশরম খবিস! সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে হাসা হচ্ছে?

রেবেকা বলে, হাসিস না সামিরুন! ওই জিনের ডাঙার জিনবুড়ো এখন ওত পেতে আছে। তুই হাসলেই তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে না? কী করবে জানিস তো? বউ! ব হুস্বউ।

ঢঙ! রোকেয়া চাপা গলায় বলেন। তোরই আসকারা পেয়ে ছুঁড়িটা দিনে দিনে মাথায় উঠে পড়েছে। ওদের লাই দিতে নেই। যত পায়ের তলায় থাকে, তত ভালো।

আম্মি! আপনি কিন্তু আব্বুর টোনে কথা বলছেন!

তুই থামবি?

বেশ বাবা! আপনাকে কেমন আলোর গন্ডি দিয়ে সেইফ সাইডে রেখেছি, তার জন্য প্রশংসা করবেন—তা নয়, উল্টে ধমক দিচ্ছেন? টর্চ নিভিয়ে দিলেই কিন্তু বিপদ! দেব নিভিয়ে?

রোকেয়া অবশেষে হেসে ফেলেন। স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলেন, এখনও কচি খুকি সেজে থাকবি রুবি? এমনি করে তোর দিন যাবে?

রেবেকা বলে, দিন কি আমার হুকুমের অপেক্ষায় থাকে আম্মি? দিন

তো দিব্যি চলে যাচ্ছে। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। হেমন্ত চলে গেল। শীত এসে পড়ল। তারপর বসন্ত আসবে। আপনি তো ম্যাট্রিক না কী যেন পাশ করেছিলেন। এই পদ্যটা পড়েননি? ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড? সার এই পদ্যটা আমাকে—

সহসা থেমে যায় সে। এতদিন পরে আবার তার মুখ দিয়ে 'সার' শব্দটা বেরিয়ে এল। বড় বিপজ্জনক এই শব্দটা। তার মাথার ভেতর ঠান্ডা হিম একটা ঢিলের মতো গড়িয়ে গভীরে তলিয়ে গেল। সারা শরীর কেঁপে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

রোকেয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে বলেন, কী হল?

রেবেকা অকারণ জোরে বলে ওঠে, সামিরুন! আলো আনতে এত দেরি করছিস কেন? আমার টর্চের ব্যাটারি বুঝি শস্তা?

সামিরুন গুটিসুটি হয়ে হেরিকেন নিয়ে আসে। বারান্দায় ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখে বলে, আজ বড্ড জাড় পড়ে গেল ছোটবুবু। তোমার জাড় লাগছে না?

রেবেকা তার গায়ের সোয়েটার দেখিয়ে বলে, এটা কেন পরেছি তা হলে? ও আম্মি! আপনার তো একটুতেই ঠান্ডা লাগে। আপনি উলেন ব্লাউসটা পরেননি কেন? শুধু ওইটুকু চাদরে পিঠ বাঁচবে না কিন্তু!

রোকেয়া কান করেন না। তিনি বলেন, সদর দরজা আর খিড়কি বন্ধ আছে তো সামিরুন?

হ্যাঁ মাজি।

রুবির ঘরের চিনেবাতিটা জেবলে দিয়ে আয়! ভাগ্যিস আজ সকাল-সকাল রান্নাটা করে রেখেছিলাম। খাওয়ার সময় গরম করে নিলেই চলবে। অ সামিরুন। রান্নাঘরের দরজা?

রেবেকার ঘর থেকে চেরা গলায় সামিরুন বলে, করেছি মাজি।

রেবেকা হাসি চেপে বলে, কাজিবাড়ির বেড়াল ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করেছে। কী সাহস দেখুন আম্মি। বেড়ালটা অতদূর থেকে দাদাপীরের থানের কাছে শর্টকাটে আসে।

রোকেয়া একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, ছেলেমানুষি করে না মা। লায়েক হয়েছ। সংসারে দেখাশুনা করতে শেখ এবার। আমার শরীরের যা অবস্থা—

আম্মি! বলে না! চুপ!

রোকেয়ার গলা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল রেবেকা। রোকেয়া বলেন, সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। আমাদের বরাত ভালো যে অমন দুঃসময়ে ভাইজান এসে পড়েছিলেন। উনি তো উড়ো পাখি। আজ এ-ডাল কাল সে-ডাল করে

বেড়াতেন।

উড়ো পাখির পায়ে শেকল পড়েছে। তাই না আম্মি?

শেকল ছিঁড়তেই বা কতক্ষণ?

দাঁড়ান! মামাজি এলে বলে দিচ্ছি!

রোকেয়া চুপ করে থাকেন। তাঁর এই ছোট মেয়ের বয়স উনিশ পেরিয়ে গেল এ মাসে। এই তো সেদিন রাঙা ফ্রক পরে উঠোনে ছুটোছুটি করে বেড়াত! স্মৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন রোকেয়া বেগম। কিছুক্ষণ পরে বড় মেয়ে আফসানার কথা মনে পড়ে যায়। তার ডাকনাম ছবি। এখনও বাবার সম্পত্তির ভাগ নেওয়ার জন্য ছবি হুমকি দিয়ে চিঠি লিখছে। তার মেয়ের গলায় সোনার হার পরিয়েও সাবরেজিস্ট্রার স্বামীর জন্য প্রতিশ্রুতির মোটর সাইকেলের দাবি ছাড়েনি সে। একই গর্ভের দুই সন্তান। অথচ পরস্পর কী বিপরীত! নাকি রেবেকার বিয়ে হয়ে গেলে রেবেকাও দিদির মতো বাবার সম্পত্তি দাবি করত? মনে হয় না। রেবেকা অন্যরকম মেয়ে। সে সংসার বোঝে না। সংসার বলতে সে বোঝে শুধু টি ভি, রেকর্ডপ্লেয়ার আর উঠোনের ফুলগাছগুলি। রোকেয়া অন্ধকারে বারান্দা থেকে উঠোনের প্রান্তে জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিলের ধারে নিস্পন্দ হিম ফুলগাছগুলি দেখার চেষ্টা করেন। কিছুদিন থেকে হাসনুহেনার সেই মউমউ করা সৌরভ আর ভেসে আসে না। রেবেকা বলছিল, শীতের প্রথম ধকলটা সামলে নিয়ে আবার ফুল ফোটাবে তার হাসনুহেনা। ওটা দাদাপীরের দরগার সেই কাঠমল্লিকার মতো বারোমাসই ফুল ফোটায়। সত্যিই কি? রোকেয়ার মনে পড়ে না। রেবেকা যখন ক্লাশ এইটের ছাত্রী, তখন ওই গাছের চারা এনে দিয়েছিল সানু—তার 'সার।' তাকে আর রুবিকে নিয়ে এখন সবখানে কেলেঙ্কারির ঢি ঢি পড়ে গেছে। আদালতে পর্যন্ত 'সার'-কে লেখা রুবির চিঠি পেঁছে গেছে। রুবি কেন এই বোকামি করেছিল?

অসহায় ক্রোধে ছটফট করে ওঠেন রোকেয়া বেগম। রেবেকা বলে, কী হল আম্মি? আপনি এত নড়াচড়া করছেন কেন? আমি আপনাকে কেমন ওম দিয়ে রেখেছি বলুন!

রোকেয়া বলেন, কালোর কান্ড দেখেছ? কখন বেরিয়েছে। এখনও ফেরার নাম নেই?

সামিরুন দেয়াল ঘেঁষে বসে ছিল। সে বলে, কালোচাচা তোরাব ডাক্তারের কাছে গেছে মাজি! ছোটবুবুকে বলে গেল না তখন?

রোকেয়া ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। ওকে আবার কী রোগে ধরল?

রেবেকা বলে, কালোচাচা বুঝি মানুষ না আম্মি যে তার অসুখ হবে না? পুরো একটা মাস মাঠে সারারাত ধান পাহারা দিয়ে কাটাল। ঠান্ডা লেগে

এত দিনে জবরমতো হয়েছে। কিন্তু কালোচাচা কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যাবে না। আজ আমি জোর করে পাঠিয়েছি। বলেছি, ফিরে এসে যেন প্রেসক্রিপশন আর ওষুধ দেখায়। না দেখালে কী করব জানেন?

সামিরুন হেসে কুটিকুটি হয়। কী করবে ছোটবুবু?

নাপিত ডেকে ওর মাথা আদ্ধেক ন্যাড়া করে দেব।

এই সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ এবং ফয়েজুদ্দিনের ডাকাডাকি শোনা যায়। সামিরুন! সামিরুন!

সামিরুন উঠে দাঁড়িয়েছিল। রেবেকা ধমক দেয়, চুপ করে বসে থাক্ তুই। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সামিরুন আর সামিরুন।

সে টর্চ জেলে বারান্দা থেকে ঠেলে বেরুনো অর্ধবৃত্তাকার খোলা চত্বর দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখে। তারপর উঠোনে নেমে তার ফুলগাছগুলিকে একবার আলোকিত করে সদর দরজার দিকে যায়। দরজার হুড়কোতে হাত রেখে সে গম্ভীর কন্ঠস্বরে ব'লে, কে-এ-এ?

বাইরে ফয়েজুদ্দিন একই কন্ঠস্বর নকল করে বলেন, আমি-ই-ই।

আমি-ই ই কে-এ-এ?

ম-এ আকার ম-এ হ্রস্ব উ বগীর্য় জ-এ হ্রস্ব ই।

তার মানে, মা-মু-জি।

দরজা খুললে ফয়েজুদ্দিন বলেন, খুব সাহস হয়েছে রে। অন্ধকারে দরজা খুলতে এসিছিস। যদি আমি অন্য কেউ হতাম?

ও মামুজি! আপনার ভয়েস!

ধুর পাগলি! ভয়েস নকল করা সহজ। কক্ষনো সন্ধ্যায় তুই দরজা খুলতে আসবিনে।

কেন মামুজি? জিনে ধরে নিয়ে যাবে?

হুঁউ।

ইশ্! দাদাপীর নেই বুঝি? আপনি জানেন? একবার দুপুরবেলা তাঁর খড়মের শব্দ শুনেছিলাম! ছবি বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সত্যি মামুজি, আমি খড়মের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

উরস হল না। মেলা বসল না। দাদাপীর খাপ্পা হয়ে পালিয়ে গেছেন।

এইসব চপল কথা বলতে বলতে মামা-ভাগনি বারান্দায় উঠে আসে। আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎ এসে যায়। সামিরুন চেঁচিয়ে ওঠে, ছোটবুবু। মামুজি সঙ্গে করে কারে এনেছেন। ফিলিম। ফিলিম। টি ভি। টি ভি।

রেবেকা দৌড়ে তার ঘরে ঢুকে যায় এবং সামিরুন তাকে অনুসরণ করে। ফয়েজুদ্দিন চেয়ার টেনে বোনের মুখোমুখি বসে বলেন, হারামজাদা সানুর কাণ্ড!

রোকেয়া চমকে ওঠেন। আবার কী করেছে সে? কলকাতায় গিয়ে আবার কিছু—

আহ্। বলতে দে। ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দেওয়ার পর আস্তে বলেন, আজ হাবল কাজি সানুকে সোনাইতলায় হাশিম মীরের ছোট ছেলের ইট-খোলায় দেখে এসেছে। বুঝতে পারছি, যেভাবে হোক, মামলার খবর পেয়ে সে ছুটে এসেছে কলকাতা থেকে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে রে বুড়ি! অবাক লাগছে আর দুঃখও হচ্ছে। রাগ হচ্ছে। সে আগে আমার কাছে এল না!

রোকেয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলেন, আপনিই বলেছিলেন ভাইজান, সানু আপনাকে এড়িয়ে চলছে প্রথম থেকেই।

হুঁ। এড়িয়ে চলছে। ফয়েজুদ্দিন একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলেন, কিন্তু আগে ভাবতাম, রুবিকে স্ক্যান্ডালের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই সে আমাকে এড়িয়ে চলছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সানু আসলে স্বার্থপর। অপারচুনিস্ট্। তার মনে পাপ ছিল!

রোকেয়া খুব আস্তে বলেন, আপনার দুলাভাই একদিন বলেছিলেন, প্রাইভেট টিউটর তার ছাত্রীর জন্য ফুলগাছের চারা এনে দেয়—এটা তাঁর ভালো ঠেকছে না। এখন সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।

আশ্চর্য! আমি কি নিজের ভাগনির স্বার্থেই সানুর পক্ষে একজন ল-ইয়ার দাঁড় করিয়েছি? ফয়েজুদ্দিন আক্ষেপের সঙ্গে বলেন। সানুকে আমি স্নেহ করতাম। এর মূল্য সে বুঝল না! যাকগে মরুক গে! আমি এক কাপ চা খাব। আজ একটু ঠান্ডা পড়েছে।

তিনি রেবেকার ঘরের দিকে এগিয়ে যান। দরজায় উঁকি মেরে বলেন, সামিরুন! কুকার জেবলে এক কাপ চা করতে পারবি? ওই দ্যাখ, টিভির পর্দায় এখন খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। তার মানে, ছবি শেষ হয়ে আসছে।

রেবেকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি চা করে দিচ্ছি মামুজি! কেন? রোজ আপনাকে আমি চা করে দিই না? আজ আবার সামিরুনকে কেন?

ফয়েজুদ্দিন হাসেন। সামিরুন তোর ডামি। ওকে বলা মানে তোকেই বলা!……

তখন অনেক রাত। বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির কাছে দানিয়েল হোসেন ওরফে ছোটকু তার জিপে সানুকে পৌঁছে দিয়ে বলে, সাবধানে থেকো। কাল মর্নিংয়ে আমি টাউনে গিয়ে আব্বার ল-ইয়ার প্রমথবাবুকে বলে রাখব। ওঁর জুনিয়ার মফেজুদ্দিনই আসলে কেসটা লড়েছেন। তাঁকে ম্যানেজ করতে একটু অসুবিধে হতে পারে। বেশি বেগড়বাঁই করলে আমার লোক আড়ালে

একটু ধাতানি দেবে। তুমি কিন্তু ভোরের ট্রেনেই গিয়ে আইনুল সাহেবের চেম্বারে দেখা করবে। কোর্টে হাজির হলেই জামিন পেয়ে যাবে। গরহাজিরার কৈফিয়ত তোমার ল-ইয়ার আইনুলসাহেব যা দেবার দেবেন কিন্তু আবার বলছি, সাবধানে থেকো। আব্বাকে আমি বিশ্বাস করি না।

জিপটা অন্ধকারকে ঝলসে দিতে দিতে চলে যায়। মোরাম রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সানুর মনে হয়, তাকে চোরের মতো নিজের গ্রামে ঢুকতে হচ্ছে আজ। এ এক অবিশ্বাস্য আর অকল্পনীয় ঘটনা। তার চেয়ে অদ্ভুত, যে মাটিকে সে ঘৃণায় ত্যাগ করতে চেয়েছিল, সেই মাটি এখন অন্ধকারে যেন তাকে আদর করছে।

দরগাপাড়ার বাঁকে দাদাপীরের মাজারের উল্টোদিকে একটা বাড়ির দরজার শীর্ষে উজ্জ্বল আলো দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। ওইখানে রেবেকা থাকে! রেবেকাই তার জীবনের এত সব বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। কেন সে 'সার'-এর কাছে একটা স্বর্ণচাঁপার চারা চেয়েছিল? আলোকিত অংশটুকু দ্রুত পেরিয়ে যায় সানু। স্তব্ধ জনহীন শীতের রাতে এমন করে হেঁটে যাওয়া বড় অপমানজনক মনে হয় তার।

মীরপাড়ার বাঁকে গিয়ে সে আবার একটু দাঁড়ায়। তার ছোট্ট টালির বাড়ির দরজায় একসময় সারা রাত আলো জ্বলত। এখন অন্ধকারে লুকিয়ে আছে বাড়িটা। পাশে ফজল মীরের মাটির বাড়ির টিনের চালের নিচে একটা বাল্ব জ্বলছে। তার আলো এদিকে পৌঁছায়নি। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দরজার তালা খোলে সে। দরজার কপাট যেটুকু শব্দ করে, তা-ই তাকে চমকে দেয়।

বেডিং আর একটা স্যুটকেস কলকাতায় আব্দুল হক চৌধুরির বাসায় রেখে এসেছে সে। এখন শুধু একটা ব্যাগ। টর্চ জেলে সে প্রথমেই বাথরুম আর রান্নাঘরের মাঝখানে রেজিনার গায়ের জোরে পোঁতা স্বর্ণচাঁপার চারা-গাছটি দেখতে চায়। কিন্তু কোথায় সেই চারাগাছ? এগিয়ে গিয়ে সানু চমকে ওঠে। কে সেটা উপড়ে ফেলেছে। মাটিতে একটা ছোট্ট গর্ত হাঁ করে আছে। কে উপড়ে দিয়েছে স্বর্ণচাঁপার চারা? কে সে?

সানুর টর্চের আলো যেন নিজে থেকেই নিভে যায়। একটু পরে সে তার ঘরের বারান্দায় ওঠে। আবার টর্চ জ্বালে। আবার চমকে ওঠে। দরজার তালা ভাঙা। কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকে সে থমকে দাঁড়ায়। ঘরটা একেবারে শূন্য।

সানু বিভ্রান্তের মতো রান্নাঘরে যায়। রান্নাঘরের দরজার তালাও ভাঙা এবং সেখানেও শূন্যতা। কে বা কারা কখন তার ফেলে যাওয়া একটুকরো অবশিষ্ট সংসার সবটাই লুঠ করে নিয়ে গেছে। না। এটা চুরি নয়। অন্য

কিছু। এই শূন্যতার মধ্যে যেন কারও প্রতিহিংসা আছে। সানু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরের দরজায় কাঁপা-কাঁপা হাতে তালাটা আটকে দেয়। তারপর টলতে টলতে হেঁটে মোরাম রাস্তায় পেঁছায়। এই ঠাণ্ডাহিম শীতের রাত কোথায় কাটাবে বুঝতে পারে না।

রেবেকাদের বাড়ি পেরিয়ে গিয়ে তার মনে হয়, কিছুক্ষণ আগে এই মাটি আসলে তাকে আদর করছিল না। ওটা তার বোঝবার ভুল। কাঁটালিয়াঘাটের মাটির ভাষা বদলে গেছে। এই মাটি তাকে তখনই পালিয়ে যেতে বলছিল। এখন বুঝতে পারছে সে। এখানে সে এখন অবাঞ্ছিত। হোটকু তাকে টাউনে পেঁছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কাঁটালিয়াঘাটেই ফিরতে জেদ ধরেছিল। ভুল করেছে।

সানু বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির কাছে তিনরাস্তার মোড়ে গিয়ে স্টেশন রোডে হাঁটতে থাকে। এত রাতে কোন সাইকেল রিক্শর আশা করা বৃথা। রাত বারোটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনের কিছু যাত্রীর জন্য কয়েকটি রিকশ এখন স্টেশনেই হয়তো অপেক্ষা করছে। ব্যাগ থেকে চাদর বের করে মুড়ি দেয় সে। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয় পুলিশ তার জন্য কোথাও ওত পেতে আছে। তার নামে বডিওয়ারেন্ট জারি হয়েছে, কেন না সে আদালতের সমন পেয়েও হাজির হয়নি।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মাথা মাফলারে ঢেকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুধু চোখ নাক মুখ খোলা রেখে সানু বারোটা পঁয়ত্রিশের আপ ট্রেনের অপেক্ষা করছিল। ট্রেনটা আসতে যেন তার সারা জীবন কেটে যাবে।

এ এক অসহনীয় কষ্টের রাত। ছেলেবেলা থেকে সে কত কষ্টের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এই কষ্টটা অন্য ধরনের। এত অসহায়তার বোধ তার কখনও ছিল না।

টাউনে পেঁছুতে রাত প্রায় দেড়টা বেজে গিয়েছিল। এত রাতে অ্যাডভোকেট আইনুল সাহেবকে জাগানো উচিত হবে না। সানু ছোটকুর কাছে তাঁর ঠিকানা নিয়েছিল। কিন্তু সে দ্বিধায় পড়ে যায়। এখানে কিছু চেনা মানুষজন অবশ্যি আছে। কুয়াশার ভেতর ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলি জনহীন রাস্তায় সামান্য একটু ছটা ফেলেছিল। রিক্শওলা বারবার তাকে জিজ্ঞেস করছিল, কোথায় যাবেন বাবু? এবার সে বলে, বললাম জলট্যাংকির কাছে। এই তো জলট্যাংকি! এখানে না নামলে আরও পাঁচটাকা লাগবে বলে দিচ্ছি!

তার শেষ বাক্যটি হুমকি। তাই সানু বলে, ঠিক আছে। এখানেই নামছি।

এমন রাতের রিক্শ তার কাছে দশ টাকা চাইতেই পারে। টাকা মিটিয়ে দিয়ে সানু হাঁটতে থাকে। তারপর মরিয়া হয়ে একটা দরজার কড়া নাড়ে।

এই বাড়িটা কাটালিয়াঘাটের হাবল কাজির এক আত্মীয় বাঘা মিয়াঁর। তাঁর নামটি বাঘা হলেও সজ্জন অমায়িক মানুষ। কলেজ জীবনে কোন কোন রাত সানু তাঁর কাছে কাটিয়ে যেত। আত্মীয় সম্পর্কের দিক থেকে দেখলে বাঘা মিয়াঁও সানুর আত্মীয়। তার প্রয়াত বাবার মতো ইনিও একজন দর্জি।

দরজা খুলে বাঘা মিয়াঁ সানুকে দেখে একটু চমকে ওঠেন। আরে সানু, তুমি! এত রাতে কোথা থেকে আসছ?

সানু মিথ্যা করে বলে, কলকাতা থেকে চাচাজি! রাস্তায় বাস বিগড়ে গিয়ে বিপদ।

এস, এস।

মুহূর্তে আবার সারা পৃথিবী সুখী, সুন্দর আর সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে ওঠে সানুর কাছে। সে ছোট্ট উঠোনে ঢুকে বলে, এত রাতে আপনাকে বাধ্য হয়ে ঘুম থেকে ওঠালাম!

আরে না না! আমার তো সারা রাতই ঘুম হয় না। বসে বসে বোতাম-ঘর সেলাই করছিলাম। তা তোমার খাওয়া-দাওয়া?

আমি খেয়ে নিয়েছি চাচাজি! সানু নিচু হয়ে এবার তাঁর পায়ে কদমবুসি করে।…

১৫

জামিন পেতে অসুবিধে হয়নি সানুর। আইনুল হক প্রভাবশালী আইনজীবী। কোর্টের বাইরে এসে সানু ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, আপনার ফি—

আইনজীবী হেসে ওঠেন। আমার ফি দেবেন ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরী। তা ছাড়া ওকালতনামায় আপনার হয়ে জাল সই করতে হয়েছিল আমাকে। আপনি এসে সেই জালিয়াতি থেকে আমাকে বাঁচালেন। কী করা যাবে? খানচৌধুরি সাহেবের মতো মানুষ—এদিকে আপনার ট্রাজিক কাহিনী শুনে আমি বিচলিত বোধ করেছিলাম। হ্যাঁ—আমাদের অনেক রকম বাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হয়। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করতে হয়। এবার সত্যকে সত্য করতে হল। আর একটা কথা বলা উচিত। কুতুবপুরের হাশিম মীর লোকটাকে আমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারি না। চলুন! এবার ঘরের শত্রু বিভীষণের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।

কোর্ট চত্বরের বাইরে রাস্তার মোড়ে জিপে অপেক্ষা করছিল ছোটকু। সানুকে বলে, কাজ হয়ে গেল?

হ্যাঁ। দোসরা জানুয়ারি মামলার ডেট।

আইনুল হক বলেন, এইমাত্র তোমাকে ঘরের শত্রু বিভীষণ বলছিলাম ছোটকু!

ছোটকু হাসে। হকসাহেব! এটা শুধু সানুর ক্ষেত্রে। তবে সামনের বছর অ্যাসেমব্লি ইলেকশান। এবারও যদি আপনি আব্বার বিপক্ষে দাঁড়ান, আমি কিন্তু আব্বার হয়েই লড়ব। মাইন্ড দ্যাট।

তোমার আব্বা আবার ভোটে দাঁড়াবেন নাকি?

দাঁড়াবেন মানে? শুধু পার্টির টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা। পেয়ে যাবেন ঠিকই।

আমি আর পলিটিক্‌সে জড়াচ্ছিনে ছোটকু। বেশ তো আছি।

আপনি ভোটে দাঁড়ালে আব্বাকে টিট করার বড় অস্ত্র হাতে পেয়ে যেতেন কিন্তু।

বল কি! অস্ত্রটা কী শুনি?

ছোটকু হাসি চেপে বলে, সানুর এই মামলার ফয়সালা সহজে হবে না। কারণ আপনি সানুর অ্যাডভোকেট। ভোটের সময় সবখানে মাইকে প্রচার করে বেড়াবেন, যে—মীর হাশিম আলি আজ জনদরদী এবং সর্বহারাদের নেতা সেজেছেন, তিনিই কাঁটালিয়াঘাটের এক দরিদ্র নিঃসম্বল পরিবারের সন্তান মীর সানোয়ার আলি ওরফে সানুর স্কুলের চাকরি হারানোর জন্য দায়ী। এমন কি সেই মীর হাশিম আলি তাঁর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত কন্যার জন্য তিরিশ হাজার এক টাকা দেনমোহর আদায়ের দাবিতে বেকার কপর্দকহীন ওই যুবকের নামে মামলা করেছেন। সেই মীর হাশিম আলি—

এনাফ! এনাফ! আইনজীবী ছোটকুর কাঁধে হাত রাখেন। সত্যিই তুমি ঘরের শত্রু বিভীষণ ছোটকু! তবে তুমি দেখছি ভোটকুড়ুনিদের ভাষা চমৎকার নকল করতে পারো!

পারি। কারণ আমার ফাদার ঠিক এইরকম ল্যাংগুয়েজ আর টোন ব্যবহার করেন। ছেলেবেলা থেকে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি হকসাহেব!

যাই হোক! তোমার তারিফ করছি ছোটকু! আমার হাতে একটা বড় অস্ত্র হতে পারত। কিন্তু আমি ভোটের রাজনীতিতে আর সত্যি নেই। আইনুল হক জিপের দরজায় হাত রেখে একটু ঝুঁকে ফের বলেন, বন্ধুর জন্য যখন এতটা এগিয়ে আসতে পেরেছ, আর একটু এগোতে পারো না?

বলুন!

তোমার আব্বাকে আভাসে এই পয়েন্টটা বুঝিয়ে দাও। ওঁকে বল, জামাইয়ের বিরুদ্ধে এই মামলার সুযোগ তাঁর প্রতিপক্ষ নেবে। তাঁর পলিটিক্যাল কেরিয়ারে এটা একটা ব্ল্যাক স্পট।

ছোটকু একটু পরে বলে, আমার এই ট্যাক্‌টিক্সটাই তো আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। তবে আব্বাকে আমি বিশ্বাস করি না। এনিওয়ে! আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট! সানু! এস।

সানু জিপে উঠে বসে। তার পর বলে, মামুজি আমার হয়ে কবে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন হকসাহেবকে! আমাদের গ্রামের ডাক্তার আবু তোরাবের সার্টিফিকেট। সেটা প্রোডিউস না করলে হয়তো এক কথাতেই জামিন পেতাম না! আমার অবাক লাগছে ছোটকু!

ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয়নি। হলে পা ছুঁয়ে সালাম করতাম! ছোটকু জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে ফের বলে, সম্ভবত শুধু নিজের ভাগনির স্ক্যান্ডাল বাঁচানোর জন্যে তিনি কিছু করছেন না। কারণ স্ক্যান্ডাল রটে গেলে আর তা আটকানো যায় না। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে কলকাতা যেও।

ছোটকু! তোমাকে কথাটা বলব না ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে বলা উচিত।

কী কথা?

আমার বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র লুট হয়ে গেছে। কিছু নেই। এমন কি অবাক ব্যাপার, সেই স্বর্ণচাঁপার চারাটাও কে উপড়ে কোথায় ফেলে দিয়েছে। ওটা রিজু পুঁতেছিল।

শাট আপ! ন্যাকামি করো না। তুমি কি আমার বোনের কথা তুলে আমাকে আরও গলাতে চাইছ? তা হলে বলব, তুমি একটা হিপোক্রিট।

সানু চুপ করে যায়। ছোটকু তার কথাটা ভুল বুঝল। গাছটা তো সত্যিই রেজিনা জোর করে পুঁতেছিল।

ছোটকু আবার বলে, তুমি হিপোক্রিট! আমার বোনের কথা আমি ভাবছি না। তাকে আমি জানি। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, এটা আমি চাইনি। কিন্তু তুমি আব্বার টোপ সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলেছিলে। তো সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন তুমি আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ করছ।

সানু কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে। কিন্তু বলে না।

ছোটকু বলে, আমার আব্বা আবার একটা টোপ ফেলে তাঁর মেয়ের সদ্‌গতি করতে পারবেন। কিন্তু খোন্দ্‌কারসাহেবের মেয়ের কী হবে চিন্তা করেছ?

রুবি আমাকে সার বলে শ্রদ্ধা করে। সে আমাকে—

সানু থেমে যায়। ছোটকু আস্তে বলে, তুমিই বলছিলে, খোন্দ্‌কারসাহেব হঠাৎ তার টিউশন বন্ধ করে না দিলে সে হয়তো পড়াশুনো ছাড়ত না।

তা-ই মনে হয়। কিন্তু আমি জানি না সেটাই একমাত্র কারণ কি না।

দেখ সানু! মেয়েটির অন্য কোন প্রেমিক থাকলে গ্রামে ঠিকই তাকে নিয়ে স্ক্যান্ডাল রটত। তাই না? তোমাকে জড়িয়ে যেমন রটেছে, সেই প্রেমিককে জড়িয়েও রটত।

হুঁ।

তুমি শুধু ভণ্ড নও, নির্বোধ।

সানু হাসবার চেষ্টা করে। আসলে আমি হয়তো ভিতু মানুষ ছোটকু!

ছোটকু ঘুরে তাকে একবার দেখে নেয়। যে-মেয়ে তোমার কাছে স্বর্ণ-চাঁপার চারা চাইতে পারে, তাকে তোমার ভয় কিসের সানু?

আমি রুবিকে ঠিক বুঝতে পারি না। তাই ওকে ভয় পাই।

ছোটকু জিপ থামিয়ে বলে, আমি আবার বলছি সানু, আব্বাকে আমি বিশ্বাস করি না। প্রতিহিংসাবশে সবকিছু করতে পারেন। আমার সন্দেহ, তোমার বাড়ির জিনিসপত্র রাতারাতি লুঠ করা হয়েছে তাঁরই হুকুমে। কারণ সাধারণ চোর-ডাকাত একটা চাঁপাগাছ ওপড়াতে যাবে কেন? তুমি এক কাজ কর! কাঁটালিয়াঘাটে চলে যাও। থানায় একটা ডাইরি করে রাখ। না—কারও নামে নয়। আর খানচৌধুরিসাহেবের সঙ্গে দেখা কর।

আমি অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু কাঁটালিয়াঘাটের মাটি আমার অসহ্য লাগছে।

বেশ তো! কলকাতায় গিয়ে পচে মর।

সানু একটু ইতস্তত করে, আমি কি এখানেই নেমে যাব?

না। মনে হচ্ছে, আব্বা জেনে গেছেন তুমি কোর্টে এসেছ। সামনের মোড়ে চায়ের দোকানে আব্বার কয়েকজন চেলা বসে আছে দেখতে পাচ্ছি। ওরা ফেরোসাস। তুমি আমার সঙ্গে আছ বলে ওরা চুপ করে আছে। তুমি এখানে বিপন্ন, সানু।

বলে ছোটকু আবার জিপে স্টার্ট দেয়। তারপর জিপ ঘুরিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ে। আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ এই রাস্তাটা পেরিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছায় সে! স্পিড বাড়িয়ে দেয়। তারপর বলে, ওরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আব্বার প্ল্যানটা বুঝতে পারছি। তোমাকে প্রাণে না মেরে খানিকটা ধোলাই দিত আর কী! সে হেসে ওঠে! তোমাকে মেরে ফেললে আব্বা বেকায়দায় পড়বেন। যাই হোক, যা ঘটে তা ভালোর জন্যই। এতে আমার একটা সুবিধে হল। বাড়ি ফিরে আব্বাকে তাঁর পলিটিক্যাল কেরিয়ারের কথা আজই মনে করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। শাপে বর হল।

সানু চুপ করে থাকে। ছোটকুও আর কোন কথা বলে না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চণ্ডীতলার মোড়ে পৌঁছে সে জিপ থামায়। তুমি এখানে নেমে যাও সানু! ওই দেখ, কাঁটালিয়াঘাটের বাস দাঁড়িয়ে আছে। এখনই হয়তো ছেড়ে দেবে। কুইক!

সানু আড়ষ্ট পায়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাসটার দিকে এগিয়ে যায়। দানিয়েল

হোসেনের জিপ হাইওয়েতে দ্রুত উধাও হয়ে যায়। সে সোনাইতলার ইটখোলায় চলেছে।...

সন্ধ্যায় টাউনশিপে ঢুকে ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি ছোট্ট একতলা বাড়িটার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হুতুমপ্যাঁচার মতো অদ্ভুত কন্ঠস্বরে ডাকছিলেন, ভানু-ভারতী! ভানু-ভারতী। ভানু-ভারতী।

অন্যদিনের মতো সাড়া না পেয়ে অগত্যা তিনি জোরে ডাকেন, ও ভারতী।

বারান্দা থেকে এবার সাড়া আসে, কাম অন আঙ্কেল!

ভারতী কোথায় গেলরে ভানু?

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে কলকাতা চলে গেছে।

সর্বনাশ! তোরও বউ পালিয়ে গেল! বলে কাঠের যেমন-তেমন একটা আগড় খুলে ফয়েজুদ্দিন ভেতরে ঢোকেন।

ভানু বলে, না আঙ্কেল! ভারতী শাহজাদপুরে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে একটা চিঠি আদায় করেছে। তারপর সেই চিঠি নিয়ে রাইটার্স-বিল্ডিংয়ে মিনিস্টারের কাছে গেছে। পরমেশ্বরী স্কুলের প্রাইমারি সেকসন ওর মাইনে আটকে রেখেছে এখনও।

হুঁ। বি টি কোর্স নিয়ে মামলা! আমার ধারণা, বি টি কলেজ ওকে হ্যারাস করার সাহস পেত না। তোর শ্বশুর মফিদুল ইসলাম জেলার নামজাদা লিডার। তা ছাড়া প্রমথ মজুমদার কোর্টে ভারতীকে জিতিয়ে দিয়েছে।

ঘরে আসুন আঙ্কেল! ভানু একটু হেসে সহসা চাপা গলায় ফের বলে, আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

আমাকে কী আর সারপ্রাইজ দিবি বাপ? আমি জীবনে কখনও এই জিনিসটার স্বাদ বুঝি না। দুনিয়াটাই তো সারপ্রাইজে ভর্তি। ফয়েজুদ্দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে অভ্যাসমতো গোঁফে তা দিয়ে একটু হাসেন। তোরা কী নিষ্ঠুর রে ভানু! আমার ভাগনিকে সন্ধ্যাবেলায় সিনেমা দেখতে দিচ্ছিস না! লোডশেডিংয়ের সময়টা ভালোই বেছেছিস।

পাওয়ার সাবস্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ দাশগুপ্ত জোরে হেসে ওঠে। আমি কি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের হর্তাকর্তা আঙ্কেল?

যাকগে মরুক গে! চলু, তোর সারপ্রাইজটা দেখি।

ফয়েজুদ্দিন বসার ঘরে ঢুকে একটু থমকে দাঁড়ান। উঁহু। সারপ্রাইজ হল না ভানু! আমি জানতাম হারামজাদার এখানেই গতি। মোল্লার দৌড় মসজিদ।

সানু উঠে তাঁর পা ছুঁতে যাচ্ছিল। ফয়েজুদ্দিনের বিশাল হাতের থাবা তার কাঁধে পড়ে। খবরদার ন্যাকামি করবিনে। চুপ করে বস।

সান্‌ কুণ্ঠিতভাবে বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছি মামুজি! বিশ্বাস করুন।

ফয়েজুদ্দিন একটা চেয়ার টেনে বসে বলেন, হুঃ! চোরের মতো রাতের অন্ধকারে দেখা করতে যেতিস। চোরের মতো লুকিয়ে আমার ভাগ্নিকে একটা চিঠি লিখে লেটারবক্সে ফেলে কলকাতা পালিয়েছিলি। অবশ্যি আমি দেখিনি। রুবি ছিঁড়ে ফেলেছে বলছিল।

মামুজি! চিঠিতে শুধু ওকে জানিয়ে গিয়েছিলাম আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি।

ওকে সেটা জানাবার দরকার ছিল?

ভানু চা করতে চলে যায় কিচেনে। সানু চুপ করে থাকে।

কোন্ অধিকারে তুই রুবিকে—

সানু দ্রুত বলে, আমি অত কিছু ভাবিনি মামুজি! হঠাৎ কেন যেন মনে হয়েছিল, রুবিকে জানিয়ে যাওয়া উচিত।

এটা কোন জবাব হল না। আমি তোর হয়ে জবাব দিচ্ছি শোন! ফয়েজুদ্দিন শ্বাস ছেড়ে বলেন, আসলে তুই রুবিকে জানিয়ে যেতে চেয়েছিলি, তার জন্যই তোর জীবনে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তুই ওকেই দোষী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলি! কারণ রুবি চাঁপাগাছের চারা চেয়ে চিঠি লিখেছিল তোকে। ওটাই বেহাত হয়ে না রেজিনার কাছে যাবে, না এত কাণ্ড হবে।

না মামুজি! বিশ্বাস করুন, আমি তাকে দায়ী করিনি।

তাকে থামিয়ে দিয়ে ফয়েজুদ্দিন বলেন, কাল সন্ধ্যায় হাবল কাজির কাছে যখন শুনলাম তুই হাশিম মীরের ছেলের ইটখোলায় বসে আছিস, তখন খুব রাগ হয়েছিল। আজ সকালে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, তুই ঠিকই করেছিস। তুই নির্বোধ হয়েও একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস। মীরের ছেলে তোর বন্ধু। সে-ই তার বোনের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্পর্কের কারণ। কাজেই তুই যদি আমার কাছে আসতিস, আমি তোকে কোর্টে নিয়ে যেতাম। এতে বিবাদ আরও বেড়ে যেত। যাক গে মরুক গে! আমি এখন টাউন থেকেই আসছি। আইনুল সাহেবের কাছে সব খবর শুনলাম।

সানু বলে, ছোটকুই আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলল।

না বললে দেখা করতিস না?

সানু আস্তে বলে, আপনার মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাচ্ছিলাম না।

কেন? তুই কি ভেবেছিলি, আমি আমার ভাগ্নিকে তোর হাতে তুলে দিতে চাইব? আমার ভাগ্নি অত শস্তা? গাছের ফল নাকি যে টুপ করে পেড়ে দেব?

মামুজি! প্লিজ! আমি তা কখনই ভাবিনি।

ফয়েজুদ্দিন চুপচাপ গোঁফে তা দিতে থাকেন। সানু মুখ নিচু করে বসে

থাকে। কিছুক্ষণ পরে ভানু চা নিয়ে আসে। সে বলে, কী আঙ্কেল? ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেল কেন? চালিয়ে যান। একটু এনজয় করি।

ফয়েজুদ্দিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, জাহানারা—থুড়ি। ভারতী তোর চেয়ে ভালো চা করে। তো একটা মজার কথা বলি শোন। আমার ছেলেবেলায় রাঢ়ের খানদানি ঘরের মুসলমানরা বিধবা বিয়ে করত না।

বলেন কী আঙ্কেল! ভারী অদ্ভুত তো!

হ্যাঁ। তুই তো পূর্ববঙ্গের বদ্যি। তোদের মুলুকে কী হিন্দু কী মুসলমান, তাদের চালচলনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় এরিয়ার হিন্দু-মুসলমানের চালচলনের মিল ছিল না। এখনও নেই। রাঢ়ের মুসলমানদের আদর্শ পোশাক ছিল ধুতি। এখনও দেখবি আমার মতো বুড়ো হাবড়ার ধুতি পরে। পরের জেনারেসন প্যান্ট ধরেছে। আমিও মাঝে মাঝে ধুতি পরি। তো যা বলছিলাম। রাঢ়ে বিশেষ করে খানদানি মুসলমানদের কোথাও 'আয়মাদার', কোথাও 'মিয়াঁ' বলা হত। তারা আপার কাস্ট। তারা বিধবা বিয়ে করত না। ফয়েজুদ্দিন তাঁর অট্টহাসি হেসে ফের বলেন, তেমনই একটা পাল্টা প্রথা ছিল। আপার কাস্ট বা 'আশরাফ্' মুসলমান ঘরের আইবুড়ি মেয়ের সঙ্গে কোন বিপত্নীক বা বউকে তালাক দেওয়া বরের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। যেমন না। যেমন ধর, এই সানু। আগের আমলে সানুদের বলা হত 'এঁটো দামাঁদমিয়া', অর্থাৎ কিনা এঁটো বর। সবেতে ব্যতিক্রম থাকে। কাজেই ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু পারতপক্ষে বা সাধ্যসামর্থ থাকলে কোন আশরাফ তার আইবুড়ি মেয়েকে এঁটো বরের হাতে তুলে দিত না। এখন—আমার ভাগনি রুবির গায়ে সেই খানদানি রক্ত বইছে। সে এঁটো বরের ঘরে যেতে চাইবে কেন?

সানু বলে ওঠে, প্লিজ মামুজি!

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। ফয়েজুদ্দিন বাঁকা হাসেন। যে বুঝবার ঠিকই বুঝেছে।

ভানু বলে, আমিও বুঝেছি আঙ্কেল। কিন্তু এযুগে ও সব প্রথা তো আর নেই।

নেই-নেই করেও তো এখনও অনেক কিছু টিঁকে আছে রে। কেন? কালীপুজোর রাতে শ্মশানতলায় কঙ্কালের নাচ!

সানু কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলে, আমার বাড়ির সব জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে মামুজি। এমন কি সেই চাঁপাগাছের চারাটাও! ছোটকু থানায় ডায়রি করতে বলল। কিন্তু ডায়রি করে কী হবে?

ভানু বলে, আমি ওকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যেতে চাইলাম। ও যাবে না। এর পর রাতারাতি ওর ঘরের চালের টালি আর দরজা-জানালাও উপড়ে নিয়ে যাবে কিন্তু!

ফয়েজুদ্দিন বলেন, চাঁপাগাছের চারা উপড়ে নিয়ে গেছে ? বাহ্ ! চোরেরা জানিয়ে গেছে, তারা কে।

ভানু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, আজ সানুকে মারবার জন্য টাউনের বাসস্ট্যান্ডে গুন্ডা পাঠিয়েছিল হাশিম মীর। তার ছেলে তাদের দেখতে পেয়ে সানুকে জিপে করে চন্ডীতলায় পৌঁছে দেয়।

ফয়েজুদ্দিন চা শেষ করে বলেন, আমার এঁটো কাপ তোকে ধুতে হবে। ভারতী নেই।

ছাড়ুন তো ?

হ্যাঁ। মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করেছিস। তুই এক জাতনাশা।

ওঃ মামুজি। সানু সম্পর্কে এখন আলোচনা করা দরকার।

ফয়েজুদ্দিন কিছুক্ষণ গোঁফে তা দেওয়ার পর সানুর দিকে তাকিয়ে বলেন, কলকাতায় কিছু জোটাতে পেরেছিস ?

সানু আস্তে বলে, না। তবে পেয়ে যাব কিছু। কাজিসাহেবের জামাই হাসান মোরশেদ বিগ বিজনেসম্যান। আপনার মনে আছে হয়তো। ভানুকে উনি একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবছি, ওঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভালো! তা কলকাতা রওনা হবি কখন ?

আজই। রাত দেড়টায় একটা ট্রেন আছে। হাওড়া পৌঁছুতে কাল বেলা নটা বেজে যাবে।

আমি বলি কী, তুই থানায় ডায়রিটা করে যা। কারও নাম করার দরকার নেই। তবে বিশেষ করে ওই চাঁপাগাছের চারা ওপড়ানোর কথাটা ডায়রিতে যেন থাকে।

কি হবে ?

ফয়েজুদ্দিন সহসা চটে যান। কী হবে মানে? আমার রিটায়ার্ড লাইফের জমানো টাকাগুলো কি গাছের পাতা? অ্যাডভোকেট আইনুল হককে ফি দিতে হয় না বুঝি? আদালতের টিকটিকি পর্যন্ত টাকা না খেলে টিকটিক করে ডাকে না তা জানিস? হারামজাদা! কেন তুই বুঝতে পারছিস না এটা তোর নয়, আমারই একটা প্রেসটিজের লড়াই? আমার ভাগ্নির নাম এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বলেও নয়। বোকা সরল ওই মেয়েটা তোর সর্বনাশের জন্য দায়ী বলেই লড়ছি।

মামুজি! রুবি কখনই এ জন্য দায়ী নয়। একদিন-না-একদিন রেজিনাকে আমি তালাক দিতে বাধ্য হতাম। শি ওয়াজ এ সাইকিক পেশেন্ট! তার সঙ্গে আর মানিয়ে চলতে পারছিলাম না।

ওঠ্। থানায় ডায়রিটা করে তবে যে- জাহান্নামে যাবি, চলে যা। হ্যাঁ —কোর্টের জামিননামার কপি সঙ্গে আছে তো ?

আছে।

ওটা এখানে এসেই থানায় প্রোডিউস করা উচিত ছিল। তোর নামে ওয়ারেণ্ট জারি হয়েছিল। ভানু। তোর ফ্রেণ্ডের ফিরতে দেরি হবে। কারণ পুলিশকে সরেজমিন চুরিচামারি দেখানোর জন্য সানুর বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। একটু ঝামেলা আছে।

ভানু বলে, ওর জন্য রান্না করে রেখেছি আঙ্কেল।

বেশ তো। এসে খাবে। তুই কি ভাবছিস আমি তোর ফ্রেণ্ডকে আমার বোনের বাড়ি ঢুকিয়ে মুর্গি জবাই করে খাওয়াব?

ভানু হাসে। তা হলে অবশ্যি খুশিই হতাম।

এখন সব কিছু তোর খুশির এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেছে বাপ।...

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ফয়েজুদ্দিন বলেন, হাশিম মীরের মেয়ের লেখা চিঠি কি তুই দানিয়েল হোসেনকে দেখিয়েছিস?

হ্যাঁ। দেখাতে হল। কেন তার বোনকে ওভাবে তালাক দিয়েছি তার প্রমাণ ওটা।

বুঝলাম। কিন্তু চিঠিটা?

ওরিজিন্যাল চিঠি আমার কাছে আছে। ছোটকু আজ টাউনে তার একটা জেরক্স কপি করিয়ে নিয়েছে। বলেছে, তার আব্বাকে ওটা দেখাবে।

আইনুলসাহেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ঘরের শত্রু বিভীষণ। আমি বললাম বিভীষণরা এই দুনিয়ায় না থাকলে রাবণ শয়তানরা শায়েস্তা হয় না।

দোসরা জানুয়ারি তো আমাকে কোর্টে হাজির থাকতে হবে, মামুজি!

হবে। তবে তুই আগে তোর বন্ধু দানিয়েল হোসেনকে চিঠি লিখে জানাবি। সে তোর গার্ড। তোর ভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয় রে, এমন একজন বন্ধু পেয়েছিলি। যাই হোক, চিঠিটা আমাকে দিয়ে যেতে আপত্তি আছে?

কী যে বলেন মামুজি! বলে সানু সোয়েটারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে শার্টের পকেট থেকে চিঠিটা বের করে। সে ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে ফের বলে, চিঠিটার ভাষা অশ্লীল। রুবি ছিল আমার ছাত্রী। আমি তার সার। অথচ—

চুপ কর। আর এ সব কথা নয়।...

এ ছিল একটা কষ্টকর দীর্ঘ ট্রেনজার্নি। জীবনে অনেক প্রচণ্ড ঠাণ্ডাহিম হিংস্র শীতের রাত কাটাতে হয়েছে সানুকে। কিন্তু এই রাতটা ছিল যেন হিংস্রতম। তবু এ ছিল তার কাছে তীর্থযাত্রার মতো। কেন না কলকাতা এখন তার কাছে এক তীর্থ। সেখানেই সে আশা করেছিল উজ্জ্বল কোন উদ্ধার।

চিৎপুর এলাকার একটা মুসলিম হোটেলে সে খেয়ে নেয়। তারপর ফিয়ার্স লেনে হাবল কাজির জামাই হাসান মোরশেদের 'মিনি ট্রেডিং এজেন্সি'-র খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাড়িটা পেয়ে যায় সে। আটতলা বাড়িটার ছতলায় মোরশেদের অফিস। লিফটের অপেক্ষায় লাইন দিতে তর সয় না তার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। তারপর ছোট্ট বোর্ড আটকানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু হতাশ হয়। মোরশেদের কথাবার্তা চেহারা-হাবভাব, মুখে পাইপ আর মারুতি গাড়ি হাঁকিয়ে কাঁটালিয়াঘাটে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত —এইসব দেখে সানুর মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে যেন এই ছোট্ট বোর্ডটা মেলে না। কাজি সাহেবের বড় মেয়ের নাম তহমিনা, ডাকনাম মিনি। সানু তাঁকে মিনি আপা বলে। তার ছেলেবেলায় মিনি গঙ্গায় সুইমিং রেসে জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। তাঁর নামেই এই ব্যবসায় সংস্থার নাম। কিন্তু মিনি ট্রেডিং এজেন্সির অফিস যে সত্যিই এরকম মিনি, তা সে ভাবতে পারেনি।

ছোট্ট একটা ঘরে কয়েকটি টেবিল চেয়ার। কয়েকজন কর্মচারী। টাইপ-রাইটারের খট্‌খট্‌ শব্দ। তবু বেশ ছিমছাম মনে হয় সানুর। এক প্রবীণ ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বলে, আমি মোরশেদসাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

ভদ্রলোক তাকে একবার দেখে নিয়ে টেবিলের কাগজপত্রে চোখ রাখেন। সায়েব বেরিয়েছেন।

কখন ফিরবেন উনি ?

তা বলতে পারব না।

সানু কুণ্ঠিতভাবে বলে, আমি ওঁর শ্বশুরবাড়ি কাঁটালিয়াঘাট থেকে আসছি। ওঁর সঙ্গে জরুরি দরকার ছিল।

বুঝলাম। কিন্তু কখন উনি ফিরবেন কিছু ঠিক নেই।

আমি কি অপেক্ষা করব ?

আপনার ইচ্ছে।

নির্বিকার আর নিরুত্তাপ এই কথাটি সানুকে আঘাত করে। ঘরের কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। কেউ যেন গ্রাহ্য করছে না তার উপস্থিতি। সে শেষ চেষ্টার মতো বলে, উনি ফিরবেন তো ?

কিছু ঠিক নেই।

সানু বেরিয়ে আসে। ভানুর কাছে মোরশেদ যে কার্ডটা দিয়ে এসেছিলেন, তাতে তাঁর বাড়ির ঠিকানাও আছে। কিন্তু পাম অ্যাভেনিউ কোথায় সানু জানে না। এখন সেই রাস্তাটা খুঁজে বের করে তাঁর বাড়িতেই বরং যাবে সে। সেখানে মিনি আপা আছেন। তাদের গ্রামের মিনিআপা।

আব্দুল হকচৌধুরির বাসায় যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। সেখানে তার বিছানা আর স্যুটকেস আছে।

অচেনা আঁকা-বাঁকা অজস্র গলি, তারপর বড় রাস্তা—একটা গোলকধাঁধার মধ্যে বিভ্রান্তভাবে সানু হেঁটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কোন পথচারীকে আর পান সিগারেটের দোকানে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিল, তালতলা এরিয়ায় কী ভাবে যাব বলতে পারেন দাদা ?

কেউ বাস বা ট্রামের নম্বর বলে দিচ্ছিল। কিন্তু সে-ও বড় জটিল সানুর কাছে। কলকাতায় সে এই নতুন এসেছে, এমন নয়। কিন্তু এবারকার আসা নিবিড়ভাবে কলকাতার অন্ধিসন্ধিতে তার ঘুরপাক খেয়ে অসহায়ভাবে ভেসে বেড়ানোর মতো।

আব্দুল হকচৌধুরির বাসায় পেঁছুতে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। বুলি দরজা খুলে তাকে দেখে বলে, এ কী। তোমাকে এমন ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে কেন সানু ? হঠাৎ অমন করে কোথায় নিপাত্তা হয়েছিলে ? আমরা তো ভেবে হয়রান। বাবু মিসিং স্কোয়াডে খবর দেবার কথা বলছিলেন। কাউকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। অদ্ভুত মানুষ তো তুমি !

সানু ক্লান্তভাবে বলে, পরে সব বলব। হঠাৎ আমাকে গ্রামে যেতে হয়েছিল।

দোতলায় উঠে বুলি প্রায় চেঁচিয়ে বলে, এই দেখ মা, তোমার বোনপো ফিরে এসেছে।

লতিফা ঘর থেকে বেরিয়ে বলেন, তুমি কেমন ছেলে বাবা ? তোমার জন্য আমরা অস্থির। কোথাও গেলে পরে জানিয়ে যাবে তো ? আজকাল যা অবস্থা। পথেঘাটে একটা কিছু হলে কেউ খবর দেবে না।

সানু তাঁর পায়ে কদমবুসি করে বলে, আমার ভুল হয়ে গেছে খালাজি। আমার গ্রামের বাড়িতে সব চুরি হয়ে গেছে খবর পেয়ে তখনই ছুটে গিয়েছিলাম।

চুরির ঘটনা শুনতে বারান্দায় ভিড় জমে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে সানু খোকনের ঘরে যায়। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। বুলি এসে বলে, শুয়ে পড়লে যে ?

ভীষণ ক্লান্ত। হাওড়া স্টেশন হয়ে আসছি। আমাদের লুপ লাইনের অবস্থা তুমি জানো না ! এখনও কয়লার ইঞ্জিন। ছ্যাকড়া গাড়ির মতো চলে।

বুলি চেয়ারে বসে আস্তে বলে, একটা কথা বলি শোনো। তুমি যত শিগগির পারো, একটা মেস-টেস খুঁজে সেখানে চলে যাও। কাল রাতে খোকন মাতাল অবস্থায় মুখ খারাপ করছিল। তার বিছানায় অন্য কেউ

শুয়ে থাকলে তার খারাপ লাগে। কেন তার বিছানায় অন্য কেউ ভাগ বসাবে? আমি তোমাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম।

সানু উঠে বসে বলে, সে ঠিকই বলে বুলি। আসলে আমাদের গ্রামের মইনুল লম্বা ছুটি নিয়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে এতদিন এখানে থাকতে হয়েছে। সন্ধ্যায় ওকে পেয়ে যাব। তখন—

বুলি তার কথার ওপর বলে, তুমি পুরুষমানুষ। তুমি কোথাও-না কোথাও একটা জায়গা পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার অবস্থা দেখ! সে একটু হাসে। বিষণ্ণ হাসি। তারপর শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, আমাকে নিয়েও খোকন অশান্তি বাধাচ্ছে। বাবুর সঙ্গে মায়েরও কথা কাটাকাটি হচ্ছে। খোকন আজ ভোরবেলা বলে গেছে, বাড়তি বোঝা সে বইতে পারবে না।

খোকনকে দেখে তো খুব শান্ত আর ভদ্র মনে হয়। সে মদ খায় জানি। কিন্তু তুমি তার বড় বোন। তোমার অবস্থা তার বোঝা উচিত।

খোকনকে তুমি চেনো না। বুলি ঠোঁট কামড়ে ধরে। আত্মসম্বরণ করার পর বলে, হয়তো আমাকে তিনটে বাচ্চা নিয়ে ভিক্ষের জন্য ফুটপাতে গিয়ে বসতে হবে। নয় তো বিষ খেয়ে মরতে হবে।

ছিঃ বুলি! এ কী বলছ তুমি? তোমার বাবা-মা আছেন।

বুলি সহসা উঠে চলে যায়। সানু চুপ করে বসে থাকে।

আব্দুল হকচৌধুরির ফিরতে দেরি হচ্ছিল। সন্ধ্যায় সানু লতিফা-খালামার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেডিং আর স্যুটকেসটা আজ তার খুব ভারী লাগে। বুলি নিচের দরজা খুলতে এসে বলে, একটা রিক্‌শ ডেকে নাও সানু। আর—চোখে জল উপচে আসে বুলির। কী বলবে ভেবেছিল, ভুলে যায়। কান্নাজড়ানো গলায় বলে, তুমি এতদিন ছিলে। কথা বলার মতো একজনকে পেয়েছিলাম। আবার আমি একা হয়ে গেলাম।

সানু বলে, সময় পেলেই এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব। সে পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে বুলির হাতে গুঁজে দেয়। তোমার বাচ্চাদের মিষ্টি কিনে দিও। আমারও প্রায় নিঃসম্বল অবস্থা। নৈলে বেশি কিছু দিয়ে যেতাম! আচ্ছা চলি।

বুলি নোটটা মুঠোয় চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।…

মইনুল তার বিছানায় বসে সিগারেট টানতে টানতে সেদিনকার কাগজ পড়ছিল। সানুকে বেডিং সুটকেস নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে, সর্বনাশ! তুই দেখছি আমার কাঁধে চাপতে এসেছিস!

সানু ক্লান্তভাবে হাসে। এ কি আজ নতুন মইন?

তুই কোর্টে হাজতে দিতে গিয়েছিলি তো? দেখিস বাবা! আমাকে

ফাঁসাস্নে।

সানু মেঝের একপাশে বেডিং-স্যুটকেস রেখে চেয়ারে বসে। গিয়েছিলাম। সব বলছি। একটু জিরিয়ে নিতে দে।

না সানু! পরে জিরোবি। আগে সব খুলে বল্।

অগত্যা সানু সব কথা সবিস্তারে তাকে বলে। শোনার পর মইনুল বলে, তা তুই আমার এখানে থাকতে পারিস। এইটুকু ঘরের জন্য আমাকে মাসে তিনশো টাকা ভাড়া গুনতে হয়। তা-ও কমন বাথরুম। আমি একজন রুম-পার্টনারের কথা ভাবছিলাম। হাফ-হাফ শেয়ার। তবে একটা ক্যাম্প-খাট কিনে নিতে হবে তোকে। দিনে সেটা গুটিয়ে রাখবি। কিন্তু কথা হল, তোর যা অবস্থা বুঝলাম, মাসে-মাসে দেড়শো টাকা দিতে পারবি তো? ভেবে দ্যাখ এখনও। আমার ভাই স্ট্রেটকাট কথাবার্তা।

সানু বলে, অন্তত একটা মাস পারব। তারপর যদি না পারি, তা হলে চলে যাব। আচ্ছা মইন, পাম অ্যাভেনিউ কোথায় জানিস?

জানি। সেখানে কী?

মিনি আপাদের বাড়ি যাব। তাঁর হাজব্যান্ড ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বিগ বিজনেসম্যান শুনেছিলাম। আজ ওঁর অফিসে গিয়ে দেখা পেলাম না। কিন্তু অফিসটা দেখে তেমন কিছু মনে হল না।

মইনুল হেসে ওঠে। তুই মোরশেদের পাল্লায় পড়লে মারা যাবি কিন্তু!

কেন? তুই চিনিস ওঁকে?

চিনব না? আমি যে কোম্পানিতে চাকরি করি, তার সঙ্গে মোরশেদের কারবার আছে। তা ছাড়া মিনিআপার সঙ্গে তোর যেমন আত্মীয়সম্পর্ক আছে, আমারও তো আছে। তবে আমি ওদের বাড়ি কখনও যাইনি এই যা। মইনুল কাগজ ভাঁজ করে রেখে চাপা গলায় ফের বলে, মোরশেদের দুনম্বরি কারবার। রাজ্যের যত স্মাগলারের সঙ্গে ওর কনট্যাক্ট্ আছে। গাড়ি বাড়ি এমনি হয়নি রে! ওর বাবাও তাই ছিল। কিন্তু ওর এক ভগ্নীপতি কাস্টমসের হাইর‍্যাংকিং অফিসার। ওর ছোট ভাই জাভেদ পুলিশ অফিসার। তা সত্ত্বেও গত বছর প্রায় ডুবতে বসেছিল। পলিটিক্যাল মুরুব্বি ধরে শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়।

সানু অবাক হয়ে শুনছিল। সে বলে, কিন্তু ওঁকে দেখে তো খুব মার্জিত আর সভ্য মানুষ মনে হয়েছিল।

তুই গেঁয়ো ভূত! আজকাল চেহারা বা কথাবার্তা শুনে মানুষ চেনা যায় না। টাই-স্যুট আর ইংলিশ বুকনি শুনে তুই ভাববি, না জানি কোন সুশিক্ষিত জেন্টলম্যান! কিন্তু আসলে সে এক ধূর্ত চোর। লম্বা চওড়া

এডুকেশনাল ডিগ্রি দেখেও আজকাল আর মানুষ চেনা যায় না। দেশটাকে এরাই তো জাহান্নামে পাঠাচ্ছে।

সানু ক্লান্তভাবে বলে, মাথা ধরেছে। তোর কাছে মাথা ধরার ট্যাবলেট আছে ?

মাথা ধরার ট্যাবলেট কীরে ? মাথাব্যথা কামানোর ট্যাবলেট বল! তুই সত্যি গেঁয়ো ভূত।...

ভোর ছটায় সানু পাম অ্যাভেনিউয়ে মোরশেদের বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। মইনুল তাকে রাস্তার ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বাড়িটা খুঁজে বের করতে আটটা বেজে যায়। একটা নতুন ছতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। চার-তলায় উঠে নেমপ্লেট দেখে কলিং বেলের বোতাম টেপে সানু।

একটি মেয়ে দরজা একটু ফাঁক করে। সানু দেখে, দরজার ভেতরে শেকল টানা আছে। মেয়েটি বলে, কাকে চাই ?

মিনি আপাকে বলো, সানু এসেছে।

সানু ?

হ্যাঁ। সানু বললেই বুঝবেন।

দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সানুর অবাক লাগে। কলকাতা মাঝে মাঝে কত রকম হয়ে যায়। কখনও দরজা হাট করে খুলে যায়, কখনও বন্ধ হয়ে যায়। কখনও অভ্যর্থনা এসে খুশি ছড়িয়ে দেয়, কখনও নির্বিকার প্রত্যাখ্যান শীতল হাতে ঠেলে দেয় দূরে।

দরজা প্রায় দু মিনিট পরে আবার খুলে যায়। শেকল নেমে যায়। সেই মেয়েটি বলে, ভেতরে এসে বসুন।

বসার ঘর আর আসবাব দেখে সানু মুগ্ধ হয়েছিল। সোফার গদি কী নরম! মেঝেতে কার্পেট। বুকশেল্‌ফে রঙবেরঙের ঝকঝকে বই। দেওয়ালে চিত্রকলা। একটা সুন্দর ছবির মধ্যে যেন ঢুকে পড়েছে সে। মিনিবেগম আসতে আরও পাঁচটা মিনিট কেটে যায়। ততক্ষণ সানু সেণ্টার টেবিলে সাজানো কয়েকটা কাগজের মধ্যে তার প্রিয় ইংরেজি দৈনিক টেনে নিয়ে চোখ বুলোচ্ছিল।

মিনি এসেই তার মুখোমুখি বসে পড়েন। তারপর কেমন হেসে বলেন, এই যে কীর্তিমান পুরুষ! তোমার সব কীর্তিকাহিনী আব্বার চিঠিতে জেনে গেছি।

ভালো আছেন আপা ?

মিনি সে-কথায় কান না দিয়ে বলেন, আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছি সানু। তুমি যে এভাবে দু-দুটো মেয়ের সর্বনাশ করবে কল্পনাও করিনি! মীরের মেয়েকে তালাক দিয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছ। ওদিকে বেচারি রুবির নামে

স্ক্যান্ডাল রটেছে। তার আর বিয়ে হবে?

সানু বলে, আপনি যদি সব কথা ধৈর্য ধরে শোনেন, বুঝতে পারবেন আপা!

আমার এখন সময় নেই শোনার। এখনই বনিকে স্কুলে পেঁছে দিতে যেতে হবে। তুমি বরং সন্ধ্যার দিকে এসো।

দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

সে কিছুক্ষণ আগে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাই ট্যাক্সি করে আমাকে বনির স্কুলে যেতে হবে। তুমি ওকে অফিসে পেয়ে যাবে। কিন্তু ওর সঙ্গে কী দরকার আমাকেও বলতে পারো।

সন্ধ্যায় কি ওঁর দেখা পাব?

কিছু ঠিক নেই। ও সব সময় বিজি। তাই বলছি, আমাকেও বলতে পারো।

সানু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তেমন কিছু নয়! বরং ওঁর অফিসেই দেখা করব। নিচের রাস্তায় এসে সানুর মনে হয়, কলকাতা আবার কিছুক্ষণের জন্য নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। তাদের গ্রামের মেয়ে মিনিআপাও তাই কিছুক্ষণের জন্য নিষ্ঠুর হয়ে আছেন।

১৬

সদর দরজার কড়া নেড়ে সামিরুনকে মাত্র দুবার ডাকতেই সে দরজা খোলে। ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি বলেন, কী রে? এত শিগগির দরজা খুললি যে! টিভি-তে আজ বুঝি দেখার মতো কিছু নেই?

সামিরুন চাপা গলায় বলে, টিভি বন্ধ। ছোটবুবু রাগ করে শুয়ে আছে।

সে কী! কেন রাগলি রুবি?

মাজির সঙ্গে কাজিয়া হয়েছে। দুইজনেই কেঁদেকেটে—

কালোর ভাইঝি সহসা থেমে যায়। রোকেয়া বেগম উঁচু বারান্দায় থামের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কানে গেলেই বিপদ।

ফয়েজুদ্দিন উঠোন পেরিয়ে খোলা চত্বরে ওঠেন। তারপর বারান্দায় ডাইনিং টেবিলে কাঁধের ব্যাগ রেখে বলেন, একটা সুখবর নিয়ে এলাম। তো এসে দেখি বাড়ি সুনসান। টিভি বন্ধ। যাকগে মরুকগে। ও সামিরুন! এক কাপ চা করে দিতে পারবি?

পারব মামুজি!

শিগগির! আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। লাস্ট বাস ফেল করে একটা ট্রাকের খোলে চেপে এলাম। হাড় নড়ে গেছে।

মাফলার খুলে ফয়েজুদ্দিন চেয়ারে বসেন। রোকেয়া আস্তে বলেন, কী হল মামলার?

বলব কেন? আগে তুই বল কেন রুবির টিভি বন্ধ?

রোকেয়া ধরা গলায় বলেন, বলার মধ্যে শুধু একটা কথাই বলেছি। আর ব্যস! খেপে আগুন। আমার পেটের মেয়ে। আমাকে অপমানের চূড়ান্ত করল! দিনে-দিনে এত বাড় বেড়ে গেছে ভাবতে পারিনি।

এখানে বস্। বসে ঠাণ্ডা মাথায় বল্। তোর যা চেহারার অবস্থা দেখছি, শীত বলেই হয়তো প্রেসার বাড়েনি। নাকি বেড়েছিল?

রোকেয়া দাদার মুখোমুখি চেয়ারে বসেন। একটু চুপ করে থেকে বলেন, আজ সানুর মামলার দিন। তো একটু চিন্তা করছিলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি ফিরছেন না। সেই নিয়ে কথার শুরু। তো কথায় কথায় আমি মুখ ফসকে বলেছিলাম, না তুই চাঁপাগাছের চারা চেয়ে সানুকে চিঠি পাঠাবি, আর না এত সব কাণ্ড হবে! তোরই বুদ্ধির ভুলে এই কথা সব হল। সেই শুনে বলে কী, চিঠি পাঠিয়েছিলাম বেশ করেছিলাম। সার আবার যদি বিয়ে করে, আবার চাঁপাগাছের চারা চেয়ে চিঠি পাঠাব। এইসব অনাছিষ্টি কথাবার্তা! তখন রাগ করে আমিও বললাম, সানুকে যদি আমি জামাই করি, তুই তা হলে কার কাছে চিঠি পাঠাবি?

ফয়েজুদ্দিন হেসে ওঠেন। তুই তা-ই বললি?

বলে আর না বলে? রোকেয়া রুষ্ট মুখে বলেন, ওই কথা শুনে রাগ হয় না মানুষের? রাগের মাথায় বললাম, এই কেলেঙ্কারির পর আর তোর বিয়ে হবে? ছবি একজায়গায় সম্বন্ধ করে চিঠি লিখেছিল। কৈ? তারা আজ অব্দি দেখতে এল না। কেন এল না? তোর বরাতে শেষে ওই সানুই আছে দেখবি। তা-ও যদি তার দয়া হয়, তবেই।

হুঁ। তা রুবির জবাবটা শুনি বল্! না কি ভুলে গেছিস?

সামিরুন চা দিয়ে চলে যায়। রোকেয়া একটু চুপ করে থেকে থানের আঁচলে চোখের জল মোছেন। তারপর চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বলেন, দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল। একটু আগে রান্নাঘরে যাবার সময় দেখলাম শুয়ে আছে। আমি আর ঘাঁটাইনি। যা খুশি করুক। ওর বাবা আপনার হাতে দায়-দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আপনি সামলান। আর হ্যাঁ—মনে পড়ল। ঘরে গিয়ে ঢোকার আগে চেঁচিয়ে বলল, আমি অত শস্তা?

বাহ্। বেশ বলেছে। ফয়েজুদ্দিন চা খেতে খেতে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। কথাটা বলে একটু গম্ভীর হন। তিনি বলেন, হাশিম মীরের অ্যাডভোকেট

প্রমথ। তার জুনিয়র মফেজুদ্দিনই মামলা লড়ছিল। আমি গিয়ে শুনি মীর তাকে বলেছে, আপোসে মিটমাট হয়েছে বলে কোর্টে যেন পিটিশন দাখিল করে। আমাদের—মানে, সানুর অ্যাডভোকেট আইনুল হক আর মফিজুদ্দিন কোর্টকে তা জানিয়ে দিতেই খেল খতম।

মামলা মিটে গেল?

কী বুঝলি তা হলে? আসলে সামনের বছর ভোট। মীর সেই ভোটে দাঁড়াচ্ছে। বিরোধী দলকে তার বিরুদ্ধে প্রচারের সুযোগ সে দেবে না। জামাইয়ের চাকরি খাওয়া। তিরিশ হাজার টাকা দেনমোহর দাবি। মীর মহা ধূর্ত।

রোকেয়া চাপা শ্বাস ছেড়ে বলেন, সানু এসেছিল কোর্টে?

কোর্টে তার আর হাজিরার দরকার হল না। সে ছিল আইনুলের বাড়িতে।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

হুঁউ। হয়েছে।

সামিরুন চা নিয়ে আসে। রোকেয়া বলেন, তুই রুবির কাছে গিয়ে বস। দ্যাখ্, সে কী করছে। যা বলছি! হাঁ করে কী দেখছিস? শুধু আড়ি পেতে বেড়ানো স্বভাব।

সামিরুন তখনই চলে যায়। ফয়েজুদ্দিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, সানু আর আমি একসঙ্গেই এলাম।

তার বাড়ি তো ফাঁকা। তাকে ডেকে আনলেন না কেন?

বুড়ি! এখনও তুই কচি খুকি থেকে গেছিস দেখছি!

রোকেয়া চুপ করে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এ বাড়িতে সানুকে ডেকে আনা উচিত নয়। ডাকলেই বা সে আসবে কেমন করে? তার সর্বনাশ তো তাঁর মেয়েই করেছে। আজ রুবির কথা শুনে তাঁর মনে রুবির প্রতি একটা আতঙ্ক জন্মে গেছে। সর্বনাশী বেশরম মেয়ে এখনও গলাবাজি করে বলতে পারছে, 'সার' যদি আবার বিয়ে করে, আবার চাঁপাগাছের চারা চেয়ে চিঠি লিখবে।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, সানু কাজিসাহেবের জামাই মোরশেদের কাছে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করেছে। সুবিধে করতে পারেনি। মোরশেদকে আমি যা ভাবতাম, সে নাকি তা নয়। দু নম্বরি কারবার করে। মিনি তো সানুকে পাত্তাই দেয়নি।

তা সানুর চলছে কী করে?

আলম মির্জার ভাইপো মইনুলের বাসায় থাকে। মাসে দেড়শো টাকা থাকার খরচ। তার ওপর খাওয়াদাওয়া। তাই সানু বাড়ি বিক্রি করে দেবার

জন্য এখানে এল। খদ্দের পেয়ে যাবে। তবে ন্যায্য দাম পাবে না।

আমরা যদি কিনে নিই ?

ফয়েজুদ্দিন হেসে ওঠেন। ফজল মীরের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে যাবি ? সে সানুর দুশমন। তাছাড়া বাড়িটা কিনে করবি কী ? আরও খানিকটা বদনাম কুড়োবি।

সানু কার বাড়িতে গেল ?

টাউনশিপে তার এক বন্ধু আছে। তার জন্য তোর মাথাব্যথা করে লাভ নেই। তুই নিজের মেয়ের কথা ভাব।

রোকেয়া উঠে দাঁড়ান। আমি ভাববার কে ? যার মেয়ে সে আপনার হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

রোকেয়া তাঁর ঘরে গিয়ে ঢেকেন। ফয়েজুদ্দিন তাঁর ব্যাগ নিজের থাকার ঘরে রেখে টানা বারান্দা দিয়ে রেবেকার ঘরে যান। রেবেকা কাত হয়ে শুয়ে ছিল। সামিরুন মেঝেতে বসে ঢুলছিল। ফয়েজুদ্দিন রেবেকার পিঠে হাত রেখে ডাকেন, ও রুবি। আমি টিভি দেখব। কী একটা মারকাটারি ছবি আছে শুনে এলাম।

রেবেকা একই ভঙ্গিতে শুয়ে থেকে বলে, দেখুন না!

কী বিপদ! আমি টিভি চালাতে জানি নাকি ?

ডানদিকের নবটা ঘোরান। সুইচ অন করা আছে।

মাথা খারাপ ? কোন্‌দিকে ঘোরাতে কোন্‌দিকে ঘোরাবো। আর টিভিটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওঠ।

ওঃ মামুজি! আমার ওঠার মুড নেই।

মুড এসে যাবে। সুখবর আছে।

আমার কোন সুখবর নেই। যার আছে, তাকে দিন গে!

সুখবরটা তোরই। ফয়েজুদ্দিন ঝুঁকে চাপা স্বরে সকৌতুকে বলেন, কারণ তোর সার আবার বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর সে বিয়ে করলেই তুই সেই মোক্ষম চিঠি লিখে আবার তাকে লেজেগোবরে করবি।

রেবেকা কোন কথা বলে না।

ফয়েজুদ্দিন স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে হাসি চেপে বলেন, হাশিম মীর মামলা মিটমাট করে নিল। সামনের বছর ভোট। এদিকে সানু ভিটেমাটি বেচে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে। কলকাতায় নাকি আশি লাখ লোক। সানুকে নিয়ে আশি লাখ প্লাস ওয়ান। তুই একদিন বলেছিলি, সার 'প্লাস ওয়ান' হয়ে গেছেন। এখন কথা হল, এবার সানু চাকরির জন্য কারও মেয়েকে আবার বিয়ে করলে কাঁটালিয়াঘাটে বসে সে-খবর পাওয়া যাবে না! প্লাস ওয়ানের ঠিকানা কে দেবে ? তোর এটাই কিন্তু প্রব্লেম হবে।

রেবেকা বিছানা থেকে উঠে বাইরে চলে যায়।

ফয়েজুদ্দিন হাসতে হাসতে বারান্দায় যান। রেবেকা থামের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ভাগনিকে আর উত্যক্ত করতে যান না। বোনকে ডাকেন, ও বুড়ি! রাত হয়েছে। আমাদের খেতে-টেতে দিবি কি না বল?

রোকেয়া তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে চলে যান। সামিরুন বেরিয়ে এসেছিল। সে রান্নাঘরের দরজা দ্রুত খুলে দেয়।

ফয়েজুদ্দিন বারান্দার ধারে বসে ঠান্ডা জলেই হাত-পা-মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে আসেন। তারপর রেবেকার কাছে গিয়ে বলেন, আকাশে কলকাতার ছবি দেখছিস রুবি? হ্যাঁ! এখন কলকাতার চেহারা ঠিক ওই রকম। যাক গে মরুক গে। আয়! মামা-ভাগনি মিলে একসঙ্গে খেতে খেতে একটা ফন্দি আঁটি।

রেবেকা আস্তে বলে, আমার খিদে নেই।

তা হলে আমারও খিদে নেই। শুয়ে পড়ছি।

রেবেকা তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর সহসা কাছে এসে কেঁদে ফেলে। মামুজি! কেন আপ্নি আমাকে আজেবাজে কথা বলবেন? কী করেছি আমি? এই কাটলেঘাটের মড়াগুলোর মতো আমাকে যখন-তখন দাঁতখিচুনি —আমি কি এত শস্তা?

ফয়েজুদ্দিন ভাগনির কাঁধে তাঁর বিশাল হাতের থাবা রেখে বলেন, কখনই না। তুই বেজায় আক্রা। তোর দামদর আমার বোনও বোঝে না, আমার দুলাভাইও বোঝেননি। আমি বুঝি। কিন্তু রুবি! তুই কান্নাকাটি করে নিজেকে সত্যিই শস্তা করে ফেলছিস। তাই না?

সামিরুন ডাইনিং টেবিলে ভাত-তরকারির পাত্র রেখে যায়। সে ভয়ে ভয়ে বলে, ছোটবুবু!

ফয়েজুদ্দিন রেবেকাকে ঠেলে দেন। যা! প্লেটগুলো নিয়ে আয়। তোদের এই খানদানি রীতির কোন মানে বুঝি না। সবাই আজকাল স্টেইনলেস স্টিলের বাসনে খায়। তোদের বাড়িতে এখনও সেই আদ্যিকালের চিনেমাটির থালাবাসন।

এ রাতে খেতে বসে ফয়েজুদ্দিন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর এই ছোট ভাগনি ছিল মেধাবী ছাত্রী। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছিল। তার বাবা লোকের পাঁচকথায় কান দিয়ে সানুকে প্রাইভেট টিউশানি থেকে না ছাড়ালে রেবেকা এতদিনে শিক্ষাদীক্ষায় কতদূর এগিয়ে যেতে পারত! রেবেকার মধ্যে একটা শক্তি ছিল। তা ক্রমে ক্ষয় পেতে পেতে সে আজ কী অসহায় আর সাধারণ মেয়ে হয়ে উঠেছে, ভাবলে কষ্ট হয়। বিশাল পৃথিবীর খোলা আকাশ তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সে

এখন খাঁচার পাখি হয়ে গেছে। বাবা বেঁচে থাকতে সে তবু বাড়ির বাইরে বেরুত। এখন আর সে কেন বেরোয় না, তা ফয়েজুদ্দিন বুঝতে পারেন। লোকেরা তাকে দেখে বলবে, এই সেই কলঙ্কিনী নিলাজ মেয়ে! শুধু তাই নয়, মুসলিম খানদানি ঘরের এক অবিবাহিতা তরুণী সে। কাঁটালিয়াঘাটের হাজার-হাজার মুসলিম তাকে এখন আড়ালে ধিক্কার দিচ্ছে। বাইরে তাকে দেখলে হয়তো তাদের মেজাজ আগুন হয়ে যাবে। মসজিদে মসজিদে মৌলবি আর রক্ষণশীলরা হুঙ্কার ছাড়বে। জাহানারা ইসলাম 'ভারতী' হয়ে সন্দীপ দাশগুপ্তকে বিয়ে করেছে। কিন্তু তার বাবা জেলার এক কমিউনিস্ট নেতা। আর রেবেকা খোন্দকার মবিনউদ্দিন আহমদের মেয়ে। খোন্দকার বেঁচে নেই। তা ছাড়া তিনি ছিলেন রাজনীতি থেকে অনেক দূরের মানুষ। যৌবনে হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে থিয়েটার স্পোর্টিং ক্লাব এইসব নিয়েই থাকতেন। দেশভাগের পর ক্রমে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। দাড়ি রেখেছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত্ নামাজ পড়তেন। বড় মেয়ে ছবির বিয়ে দেবার পর ধানী জমি মাত্র সাত বিঘে দু কাঠায় ঠেকেছিল। এমন এক মানুষ, যতই আশরাফি আভিজাত্যের বড়াই করুন, খুবই সাধারণ হয়ে পড়েছিলেন। আজ তাঁর অবর্তমানে এই পরিবারটি একে তো অসহায়, তার ওপর সানুকে জড়িয়ে রেবেকার নামে স্ক্যান্ডাল। ফয়েজুদ্দিন মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেও আসলে একজন বাইরের মানুষ। রেবেকাকে তিনি কী ভাবে জীবনের খোলা আকাশের তলায় পেঁছে দেবেন ভেবে পান না। একটা বিরাট সম্ভাবনা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁর কষ্ট হয়।

খাওয়া শেষ করে সহসা তিনি হেসে উঠেছিলেন। রোকেয়া বলেন, কী হল ভাইজান?

তেরাস্তার মোড়ে তোদের গ্রামের মুসলিমরা বিদ্রোহী কবি নজরুলের স্ট্যাচু দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এ এক অদ্ভুত প্যারাডক্স। ফয়েজুদ্দিনে হাসতে হাসতে ফের বলেন, কবি নজরুলের একটা পদ্যের কথা মনে পড়ে গেল। বুড়ি! তুই ম্যাট্রিক পাশ করেছিলি ছেচল্লিশ সালে। তোর মনে পড়ে?

ফয়েজুদ্দিন আবৃত্তি করেন,

'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা রয়েছি বসে।
বিবিতালাকের ফতোয়া খুঁজছি ফেকা ও হাদিস চষে।।'

রেবেকা বলে ওঠে, পড়েছি মামুজি! ভারি মজার কবিতা!

ভাগনির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ফয়েজুদ্দিন বলেন, হুঁ। বুঝেছিস। তবে তোর মজাটা একটু অন্যরকম।

রেবেকা রাগ করে উঠে যায়। বারান্দার ধারে গিয়ে এঁটো হাত ধুতে থাক।...

স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে রোকেয়া বেগম রোজ ভোরে উঠে নামাজের পর সুর ধরে কোরানপাঠ করেন। পাঠের পর পবিত্র কেতাবটি তিনি রঙিন কাপড়ের খাপে ঢুকিয়ে বারান্দার তাকে রাখার সময় তিনবার চুম্বন করেন। "রেহেল" বা নকশাদার কাঠে তৈরি কাশ্মীরি পুস্তকাধারটি তাকের একপাশে ভাঁজ করে রেখে দেন। তারপর নামাজ পড়তে বসার আসন 'জায়নামাজ', সেটিও একটি পুরনো নকশাদার কাশ্মীরি গালিচা, যত্নে ভাঁজ করে নিচের তাকে রাখেন।

আজ ভোর থেকে গাঢ় কুয়াশায় খোদাতালার দুনিয়া ঢাকা ছিল। খোদাতালার নির্দেশ পালনের পর রোকেয়া দেখছিলেন, তাঁর ভাইজান ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি সায়েব সেজে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। গায়ে ছাইরঙের সোয়েটারের ওপর খাকি রঙের পুরু জ্যাকেট, মাথায় বিলিতি টুপি, পরনে প্যান্ট এবং পায়ে বুট পরেছেন। হাতে দস্তানাও পরেছেন। রোকেয়া বলেন, এই ঠান্ডায় কোথায় বেরুচ্ছেন ?

ফয়েজুদ্দিনকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি আস্তে বলেন, বাজারের থলে দে। ফেরার সময় ঘাটবাজারে বাজার করে আসব।

সামিরুন রেবেকার ঘরে শোয়। এখনও সে-ঘরের দরজা বন্ধ। কোন-কোন দিন বাজার নিয়ে আসে বাড়ির মাহিন্দার কালো। সে একটু বেলা করে আসে। যেদিন ফয়েজুদ্দিন বাজার করতে যান, সেদিন রেবেকা তাঁর হাতে থলে এবং পকেটে জোর করে টাকা গুঁজে দেয়। তাই রোকেয়া একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন। তিনি ভাইজানকে বাজারের টাকা দিতে গেলে ধমক খাবেন, আমাকে টাকা দেখাচ্ছিস রে বেবি ?

রোকেয়ার দুটো ডাকনাম আছে। বুড়ি এবং বেবি। ফয়েজুদ্দিন বেবি বললে বোঝা যায় উনি রাগ করেছেন।

আজ রোকেয়া বলতে চাইছিলেন, কাল অত রাতে ঠান্ডার ঝাপটানি খেতে খেতে টাউন থেকে খোলা ট্রাকে চেপে ফিরেছেন ভাইজান। এখন আবার কুয়াশার মধ্যে বেরুচ্ছেন।

কিছু বলার সুযোগ পেলেন না তিনি। ফয়েজুদ্দিন তাগিদ দিলেন, দেরি করিসনে। থলে দে।

অগত্যা রান্নাঘরের তালা খুলে রোকেয়া তাঁকে থলে এনে দেন। তারপর চুপচাপ তাঁকে অনুসরণ করে উঠোনে নেমে যান এবং ভাইজান বেরিয়ে গেলে সদর দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁর শুধু একটা কথাই মনে হয়। ভাইজানের চেহারা আর পোশাকের সঙ্গে বাজার করা থলেটা খুবই বেমানান।

ফয়েজুদ্দিন শর্টকাটে কাজিপাড়ার গলিপথে জোরে হাঁটতে হাঁটতে বিদ্রোহী কবির প্রতিমূর্তির কাছে গিয়ে গতি কমিয়েছিলেন। কুয়াশার ভেতর ভেঁপু

বাজাতে বাজাতে কদাচিৎ দু-একটা সাইকেলরিকশ চলেছে। পিচরাস্তা এখান থেকে ঢালু হতে হতে সমতল গাঙ্গেয় মাটিতে নেমে গেছে। সেখানে ঘাটবাজার। সেখানে এখনও বিদ্যুতের বাতিগুলি জ্বলজ্বল করছে। ফয়েজুদ্দিন রাস্তার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যান। আলো জ্বেলে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে চলে যায় একটা ট্রাক। অথচ কুয়াশা ঢাকা শীতের পৃথিবী এমনই নিস্পন্দ যে, সেই শব্দ বিশাল এক স্তব্ধতার মধ্যে নিমেষে হারিয়ে যায়।

নিঝুম এবং প্রায় জনহীন ঘাটবাজার ছাড়িয়ে ফয়েজুদ্দিন 'টাউনশিপ' এলাকায় ঢোকেন। সন্দীপ দাশগুপ্তের বাড়ির সামনে গিয়ে সেই হুতুম প্যাঁচার স্বরে তিনবার 'ভানু-ভারতী' বলে ডাকতে ইচ্ছে করে না। একটু ইতস্তত করে তিনি ডাকেন, ভানু! ও ভানু! ভারতী! এখনও ঘুমোচ্ছিস নাকি?

ভারতী সাড়া দেয়। কে?

আমি রে!

বারান্দায় ল্যাভেন্ডার লতার ঝরোকা। তার পাশ কাটিয়ে ভারতী নেমে আসে। প্রথমে সে চিনতে পারে না। সে বলে, কোথা থেকে আসছেন আপনি?

হাসবার মুড নেই। নইলে বলতাম বিলেত থেকে। হাতে এটা কী?

ওঃ হো! মামুজি! ভারতী হেসে ওঠে। হেভি ফগ। চেনা যায় না। কিন্তু—

কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। সানু আছে?

সে তো একটু আগে বেরিয়ে গেল।

কিছু বলে যায়নি?

ফিরতে দেরি হতে পারে বলে গেল। কী ব্যাপার মামুজি?

ভানু আছে?

নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমোচ্ছে। ভেতরে আসুন। আজ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার ওপর বিচ্ছিরি কুয়াশা।

ফয়েজুদ্দিন ভেতরে যান। বসার ঘরের সোফা-কাম-বেডে সানু শুয়ে ছিল। ভারতী বিছানা-কম্বল গুটিয়ে পাশের ঘরে রেখে আসে। তারপর সোফা-কাম-বেডকে সোফায় পরিণত করে। সে বলে, কী হল? বসছেন না কেন?

বসি। এক কাপ চা খাওয়াতে পারবি?

ভারতী কপট রাগ দেখিয়ে বলে, না। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ফয়েজুদ্দিন দস্তানা খুলে রেখে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। এত ভোরে কুয়াশার মধ্যে কোথায় গেল সানু? তাঁর জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল। অথচ

তিনি আসার আগেই বেরিয়ে গেল! কোথায় গেল সে? সে কি এখনও ভাবছে, ভার্গনিকে তার হাতে তুলে দেবার জন্যই ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন? স্বার্থপর! অকৃতজ্ঞ! নির্বোধ!

ভারতী চা এনে বলে, মামুজিকে রাগী দেখাচ্ছে। তা ছাড়া আজ হুতুম-প্যাঁচার ডাকও শুনতে পেলাম না।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফয়েজুদ্দিন বলেন, হ্যাঁ রে! তোর স্কুলের ব্যাপারটা কী হল?

ভারতী সোফায় বসে একটু হাসে। মাইনে পেয়ে গেছি। তবে বি-টি চাই-ই। আমার বাবা আর পরমেশ্বরী স্কুলের সেক্রেটারি নগেনবাবুর মধ্যে রীতিমত বৈঠক হয়ে গেছে। হুগলির ওদিকে কোথায় একটা বি-টি কলেজে আগামী সেশনে আমার অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা হবে। একেবারে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে আমার কেস মুভ করা হয়েছে। কিন্তু এবার আমাকে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে, এই যা।

বল্ শুনি।

হাজব্যান্ডের নামের বদলে বাবার নাম লিখব। আর রিলিজিয়ন লিখব 'ইসলাম'। ভারতী বাঁকা হাসে। ভণ্ডদের মধ্যে ভণ্ড না সেজে থাকলে বাঁচা যায় না।

অনেক ঠকে শেষে তা হলে কথাটা বুঝেছিস দেখছি।

যস্মিন দেশে যদাচার।

অবশ্যি তুই হেরে গেলি।

ভারতীর মুখ থেকে কুয়াশার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, লড়াইয়ে হার-জিত থাকে মামুজি। তো থাক্ এ সব কথা। সানুদার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ওকে কাল রাতে বলছিলাম, তুমি রেবেকাকে বিয়ে করো। ওদের মাথার ওপর কেউ নেই। খামোকা মামুজির মতো মানুষ এখানে এসে আটকে গেছেন। তাঁর নিজের একটা জীবন আছে।

ফয়েজুদ্দিন চুপচাপ চা খাচ্ছিলেন। কোন কথা বলেন না।

ভারতী বলে, সানুদা আমার কথা শুনে বলল, রেবেকা আমার ছাত্রী ছিল। আমি তার সার ছিলাম। ওকে বললাম, কেন? কোন সার বুঝি তার ছাত্রীকে বিয়ে করে না? তখন কী বলল জানেন? হাসতে হাসতে বলল, আমি এঁটো বর। একজন কুমারী কেন এঁটো বরকে মেনে নেবে? নিলেও তা জাস্টিফায়েড হবে না।

ফয়েজুদ্দিন ফুঁসে ওঠেন, ওকে কে সাধছে? তুই কক্ষনো ভাবিস নে, আমি ওকে এই ভোরবেলা সাধতে এসেছি, হে মহামানব। দয়া করে আমার অবোধ ভার্গনিকে গ্রহণ করো। হারামজাদা গাড়োল!

ভারতী ওঁর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর বলে আপনার আসার কথা ছিল বলছেন। অথচ সানুদা বেরিয়ে গেল কোথায়। অদ্ভুত তো!

ফয়েজুদ্দিন চা শেষ করে আবার হাতে দস্তানা পরে নেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, চলি রে।

সানুদা ফিরে এলে ওকে কিছু বলতে হবে মামুজি?

কী আর বলবি? শুধু বলিস আমি এসেছিলাম।

কথাটা বলেই ফয়েজুদ্দিন বেরিয়ে পড়েন। হাঁটতে হাঁটতে ঘাটবাজার, তারপর খেয়াঘাটের ঘাটোয়ারিবাবু চৌবেজির গদিতে যান। চৌবেজি এই প্রচণ্ড শীতে গঙ্গায় স্নান-আহ্নিক সেরে গদিতে ধূপধুনো দিয়ে গদির ওপর বসে ছিলেন। গায়ে কম্বল জড়িয়ে কাচের গেলাসে তিনি চা খাচ্ছিলেন। ফয়েজুদ্দিনকে চিনতে তাঁর একটু দেরি হয়েছিল। চিনতে পেরে বলেন, আদাব খানচৌধুরি সাহাব! আসুন! আসুন!

ফয়েজুদ্দিন বলেন, নমস্তে চৌবেজি!

চৌবেজি হাসেন। তো ঠিক আছে। নমস্তে! আজ বহত কুঁহা পড়ে গেল। বহত জাড়া ভি।

ফয়েজুদ্দিন গদির একপাশে বসে বলেন, গঙ্গামাইজি কুঁহার ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে আপনার পুজো নিয়েছেন দেখছি। একবার হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জল ছুঁয়ে দেখি একেবারে বরফ। তো এক সাধুবাবা আমার অবস্থা দেখে বলেছিলেন, বেটা। ভক্তি মনুষ্যকা অঙ্গ ভি উষ্ণ করে। ফয়েজুদ্দিন চোখে হেসে চাপা গলায় ফের বলেন, তিনি কেমন করে জানবেন আমি মুসলমান? তবে হ্যাঁ। ভক্তিতে নয়, সংকল্পের টানে জলে নেমে পড়লাম। সত্যিই আর একটুও ঠান্ডা লাগল না।

চৌবেজি হাসতে হাসতে চায়ের হুকুম দিলে ফয়েজুদ্দিন তাঁকে নিবৃত্ত করেন। এইমাত্র তিনি চা খেয়ে এসেছেন। সময় কাটানোর জন্য চৌবেজির সঙ্গে দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কথা বলতে চান। আটটা না বাজলে বাজার জমজমাট হবে না।...

সানু ফিরে এল, তখন প্রায় একটা বাজে। সন্দীপ দাশগুপ্ত স্নান করে খেয়ে নিয়েছিল। ভারতী খেতে বসেছিল। সে সকালেই গঙ্গায় স্নান করে আসে। গঙ্গার জল নাকি সতত উষ্ণ আর স্নিগ্ধ।

সানু বলে, আমি এখনই বেরিয়ে পড়ব ভানু! তিনটে নাগাদ চণ্ডীতলায় স্টেটবাস পেয়ে যাব। একটু আগে বেরুনোই ভালো।

তুই খাবি তো? ভারতী তোর জন্য অপেক্ষা করে এইমাত্র খেতে বসেছে। আমি অবশ্যি খেয়ে নিয়েছি।

না রে! আমি ফজলজেঠার বাড়িতে মুর্গির মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এলাম।

সন্দীপ দাশগুপ্ত—ভানু চমকে ওঠে। সে কী রে? ফজল মীর নাকি তোর জ্ঞাতিশত্রু? তার বাড়িতে তুই খেলি!

আর এখানে আমার শত্রু মিত্রের প্রশ্ন ওঠে না ভানু। কাঁটালিয়াঘাটে আর তো আমি ফিরছি না।

ভারতী কিচেন থেকে বলে, ওকে একটু বসতে বলো। কথা আছে।

সানু অগত্যা তার অপেক্ষা করে। ভানু বন্ধুর দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর সিগারেট ধরায়। কিছুক্ষণ পরে ভারতী এসে বলে, ভোরে তুমি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে মামুজি এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে নাকি তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। কী ব্যাপার?

সানু মুখ নিচু করে বলে, আমি বাড়ি বিক্রি করে চলে যাব শুনে মামুজি কাল বলেছিলেন, এভাবে হঠাৎ বাড়ি বেচতে চাইলে ন্যায্য দাম পাব না। তাই উনি আমাকে শ পাঁচেক টাকা ধার দিতে চেয়েছিলেন। বাড়ির খদ্দের ঠিক করে আমাকে জানাবেন। তখন আমি এসে—

ভারতী তার কথার ওপর বলে, সে তো ভালোই।

কিন্তু ভারতী! আর কারও কাছে আমার ঋণী থাকতে ইচ্ছে করে না। মামলায় উনি আমার হয়ে অত টাকা খরচ করেছেন। ওঁর রিটায়ার্ড লাইফের সঞ্চয় এ ভাবে নষ্ট করতে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আমি তো জানতাম না আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। উনি এক মহৎপ্রাণ মানুষ ভারতী! পৃথিবীতে এখনও এমন কিছু মানুষ আছেন বলেই আমরা টিকে আছি।

তুমি তা হলে ফজল মীরকেই বাড়ি বেচে দিলে?

ঠিক বেচে দেওয়া নয়। ওঁর হাতে পুরো টাকা এখন নেই। রেজিস্ট্রেশনের সময় বাকিটা দেবেন। এখন স্ট্যাম্পড্ পেপারে একহাজার টাকা অগ্রিম বায়না পেয়ে সই করে দিলাম।

ভানু বলে, কত দাম দেবেন ভদ্রলোক?

তিন হাজার টাকা।

তুই একটা বুদ্ধু সানু। কাঁটালিয়াঘাটে মাটির দাম কত জানিস?

জানি। কিন্তু সেটা এই এরিয়ায়। আমাদের মীরপাড়ায় মাটির দাম খুব কম। কত ভিটে পড়ে আছে। কেনার লোক নেই। সানু একটু হাসে। কাঠা তিনেক জমির ওপর একটা ছোট্ট মাটির বাড়ি। টালির চাল। পাকা বাথরুম আর স্যানিটারি ল্যাট্রিন আমার শ্বশুরের দান। কাজেই তা আমার নয়।

তুই খুব ভুল করলি সানু। আক্কেলের ওপর তোর ভরসা করা উচিত ছিল।

সানু চুপ করে থাকে। ভারতী বাঁকা হেসে বলে, সানুদার এখন এলাহি ভরসা।

ভানু বলে, কিন্তু তুই কেন বুঝতে পারছিস না এ ভাবে একটা সরল নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট করে যাচ্ছিস?

ভারতী রুষ্টমুখে বলে, থামো তো তুমি! রেবেকার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবু আমি মামুজির কথায় বুঝতে পেরেছি, সে সাধারণ মেয়ে নয়। সানুদার মতো কাওয়ার্ডকে—সরি!

কথাটা বলে সে ভেতরের ঘরে চলে যায়। সানু তার ব্যাগ গুছিয়ে নিতে নিতে বলে, প্রশ্নটা তা নয়। ভারতী বোঝে না, তুইও বুঝবি না—রেবেকাকে আমি ছোট হতে দিতে চাইনে। কথাটা তোরা দুজনেই ভেবে দেখিস। আর মামুজির সঙ্গে দেখা হলে বলিস, কলকাতা থেকে তাঁকে চিঠি লিখব।

সানু উঠে দাঁড়ায়। বলে, ভারতী, আমি গেলাম। ভানু! চলি রে! তোরা ভালো থাকিস।

সে বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে থাকে। কেউ তাকে পিছু ডাকে না। ডাকলেও সে আর পিছু ফিরবে না।...

ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি দুপুরে খাওয়ার পর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। গত রাতে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। তাই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এসেছিল। সেই ঘুম ভাঙল সামিরুনের ডাকে।

ফয়েজুদ্দিন তার দিকে লাল চোখে তাকিয়ে আছেন দেখে সে কাঁচুমাচু মুখে বলে, সন্ধে হয়ে এল। মাজি আপনাকে ডাকতে বললেন। আর কাজি-সাহেব এসেছেন। মাজির সঙ্গে কথা বলছেন। ছোটবুবু চা করেছে।

ফয়েজুদ্দিন বেরিয়ে দেখেন, সন্ধ্যা হয়নি। তবে শীতের দিন। খুব শিগগির বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। বারান্দায় একটা চেয়ারে হাবল কাজি বসে আছেন। রোকেয়া বেগম ঘোমটা টেনে তাঁর ঘরের দরজায় কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাজি চাপা স্বরে কথা বলছিলেন। ফয়েজুদ্দিনকে দেখে বলেন, তুমি দিনে ঘুমোও জানতাম না। মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে ভাবলাম একবার রুবিদের বাড়ি যাই।

ফয়েজুদ্দিন এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসেন। তারপর বলেন, নিশ্চয় কোন খবর আছে। খবর ছাড়া তুমি তো থাকো না। তুমি একটা নিউজপেপার হে কাজি!

কাজি গম্ভীর হয়ে বলেন, মনমেজাজ খারাপ হয়ে আছে হে ফজুমিয়াঁ।

ভাবীজিকে বলছিলাম, ঠকবাজে দুনিয়া এখন ভরে গেছে। তুমি তো রেলের বড় অফিসার ছিলে। রেলগাড়ির কামরায় লেখা থাকত, 'পকেটমার হইতে সাবধান।' এখন রাস্তাঘাটেই পকেটমার।

সামিরুন চায়ের কাপপ্লেট ডাইনিং টেবিলে রেখে যায়। ফয়েজুদ্দিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, যাক গে মরুক গে। খবর বলো।

হাবল কাজি এতক্ষণে মাথা থেকে নামাজপড়া টুপি খুলে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকান। তারপর চাপা স্বরে বলেন, সানুর কাণ্ড।

হুঁ। সেটা বুঝে গেছি। তবে এবারকার কান্ডটা সম্ভবত আমি জানি।

জানো? কে বলল তোমাকে?

কালো সানুকে ফজল মীরের বাড়িতে দেখেছিল। শোনামাত্র তখনই বুঝে গিয়েছিলাম।

হাবল কাজি আক্ষেপ করে বলেন, হারামজাদা শেষে নিজের দুশমনের পাল্লায় পড়ে গেল। ওই তিনকাঠা জমির দামের কথা ছেড়ে দাও। চালের টালি আর কাঠের দাম, তারপর পাকা বাথরুম-ল্যাট্রিন—কমপক্ষে এ বাজারে বারো থেকে পনের হাজার টাকার কমে নয়। মাত্র তিন হাজার টাকায় ফজল নিয়ে নিল। তা-ও পুরো টাকা পায়নি সানু। একহাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে বায়নাপত্রে সই করে দিয়ে গেছে। ফজল আসরের নামাজ পড়তে এসেছিল। নিজের মুখে সব বলল। এমন ভাব করল যেন খুব দয়া করেই সে সানুকে উদ্ধার করেছে।

ফয়েজুদ্দিন একটু হাসেন। তোমাকে বেচতে চাইলে তুমি কিনতে নাকি?

আমার মাথা খারাপ? ফজল মীর বদমাইশ লোক। সানুর বাপ আব্দুল গফুরের মতো নিরীহ মানুষকে সারাজীবন জ্বালিয়ে মেরেছে। পাশাপাশি দুই শরিকের বাড়ি। আর ফজলের বউয়ের মুখ তো জাহান্নাম।

তা হলে?

ফজলকে জব্দ করার মতো লোকের কি অভাব আছে? সানু আমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করলে তেমন লোক নিশ্চয় খুঁজে বের করতাম।

ছেড়ে দাও। সে যা ভাল বুঝেছে, তা করেছে।

রোকেয়া ঘোমটার ভেতর থেকে মৃদুস্বরে বলেন, কাজিসাহেবকে সেই কথাটা বলতে বলছি।

হাবল কাজি নড়ে বসেন। হ্যাঁ। একটা সুখবর আছে। আমার মেজ মেয়ে রিনির জন্য সালারে সম্বন্ধ করেছি। রিনিকে ওদের পছন্দ হয়েছে। মোটামুটি সব কথা পাকা। জামাইয়ের ট্রান্সপোর্টের কারবার আছে। তো কথায় কথায় খবর পেলাম, তার ট্রান্সপোর্টে একটা ছেলে কাজ করে। মা-বাবা কেউ নেই। তবে খানদানি ঘরের ছেলে। দেখতে শুনতেও ভালো। শুধু লেখাপড়ায় একটু খাটো।

হুঁ।

কাজি হাসেন। তোমার এই হুঁ কথাটি শুনলেই খটকা লাগে।

লেখাপড়ায় খাটো মানে কী?

ক্লাশ সিক্স পড়েছিল। গরিবের ছেলে। তবে আমার কথা হল, খোন্দকারভাইয়ের এই ফ্যামিলিতে একজন ঘরজামাই পেলেই ভালো হয়। জমিজিরেত দেখাশুনোটাই আসল কাজ। তুমি আজ আছো, কাল নেই। তখন তো ওই কালো সব লুটেপুটে খাবে। মা আর মেয়ে কি বেপর্দা হয়ে মাঠেঘাটে জমি দেখতে যাবে?

রোকেয়া বলেন, আমি কাজিসাহেবকে বলছিলাম, ভাইজানকে সঙ্গে নিয়ে একবার দেখে আসুন।

ফয়েজুদ্দিন বাঁ হাতে গোঁফে তা দিয়ে বলেন, হুঁ!

কাজি বলেন, হ্যাত্তেরি তোমার হুঁ।

ফয়েজুদ্দিন গম্ভীর মুখে বলেন, দুলাভাই আমাকে কোরানশরিফের কিরেকসম খাইয়ে বলে গেছেন, তাঁর ছোট মেয়ে যেন খানদান পায়। লেখা-পড়ার কথা কিছু বলেননি। খানদানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তা বুড়ি যখন বলছে, তখন আমার আপত্তি কী? বলো, কবে যেতে হবে?

কাজি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, সামনে জুম্মাবার মর্নিংয়ের ট্রেনে চলো। আমাকে ডেকে নিও।

বেশ।

হাবল কাজি খোলা চত্বর থেকে উঠোনে নামেন। তারপর শ্রেণীবদ্ধ ফুলগাছগুলি দেখতে দেখতে সদর দরজার দিকে হেঁটে যান। সামিরুন গিয়ে দরজা বন্ধ করে। তারপর দৌড়ে ফিরে আসে। রেবেকার ঘরে টিভি চলছিল।

ফয়েজুদ্দিন চায়ের কাপ টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ান। রোকেয়া ধমক দেন সামিরুনকে। কোথায় যাচ্ছিস? আলো জেবলে দে। আর হেরিকেন দেশলাই রেডি করে রাখ। খালি টিভি আর টিভি।

ফয়েজুদ্দিন তাঁর ঘরে যাচ্ছিলেন। পোশাক বদলে ঘাটবাজারের দিকে বেড়াতে যাবেন।

রোকেয়া ডাকেন, ভাইজান!

বল্।

আপনি কি রাগ করেছেন?

আমি উড়ো পাখি। আমার রাগে তোর কী আসে যায়? তবে—থমকে দাঁড়িয়ে, একটু চুপ করে থাকার পর ফয়েজুদ্দিন বলেন, তবে তোর পেটের মেয়েকে তুই চিনিস না। আগে তার মতামতটা জেনে নিস।

আপনি জেনে নেবেন ভাইজান। রুবি আপনাকে যা বলবে, আমাকে তা

বলবে না।

ফয়েজুদ্দিন ঘরে ঢুকে পোশাক বদলান। তারপর বালিশ সরিয়ে পার্স বের করতে গিয়ে একটা ভাঁজকরা চিঠি দেখতে পান। ওপরে বড় হরফে লেখা আছে, 'মামুজিকে।' সামিরুন এ ঘরের আলো জেবলে দিয়ে গিয়েছিল। আলোয় চিঠিটা খুলে ফয়েজুদ্দিন কয়েকবার পড়েন।

'শ্রদ্ধেয় মামুজি,

আপনাকে মুখোমুখি বলতে লজ্জা করে। তাই চিঠি লিখে জানালাম। আমার সারকে আপনারা ভাই-বোন মিলে কেন আটকে রাখার চেষ্টা করছেন? তাঁর মতো মানুষকে কি জমিজমা ঘরসংসারে মানায়? সার একবার ভুল করেছিলেন। আর তাঁকে ভুলের ফাঁদে জড়াবেন না। আমি সারকে স্বর্ণচাঁপা ভেবে আমার ছোট্ট সংসারে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমিও ভুল করেছিলাম। এবার আমি চাই, সার বিশাল স্বর্ণচাঁপা হয়ে পৃথিবীর বড় সংসারে ফুটে উঠুন। তা হলেই আমি সুখী হব। আর একটা কথা। কোথাও জোর করে আমার বিয়ে দিতে গেলে আমি—থাক। আপনি জ্ঞানী মানুষ। আশা করি বুঝতে পারছেন কী বলতে চাই। এই চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলবেন।

ইতি—

আপনার স্নেহের রেবেকা'

ফয়েজুদ্দিনের চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি চিঠিটা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে পকেটে ভরেন। গঙ্গায় ফেলে দেবেন।

১৭

কাঁটালিয়াঘাটে শীত স্বভাবে অলস আর তার গতিও মন্থর। চলে যেতে যেতে বারবার পিছু ফিরে যেন দেখে নেয় কিছু ফেলে যাচ্ছে কি না। চৈত্রেও শেষ রাতে মানুষজনের হাত ঘুমের ঘোরে বিছানা খুঁজে একটা কিছু পেতে চায়। কোনও আবরণ। কেন না সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এরকমই। 'আত্মরক্ষা' কথাটি এভাবে কারও-কারও কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসে, যখন সহসা ঘুম ছিঁড়ে যায় এবং কোনও স্বপ্ন ভাঙচুর হয়েও কয়েক মুহূর্ত চেতনায় অস্পষ্টভাবে মেখে থাকে। একদা শেষ রাতে রেবেকার এই অনুভূতিটা এসেছিল। 'আত্মরক্ষা' কথাটি ভাবতে গিয়ে শরীর নিয়ে কুণ্ঠা এবং তার শরীর তো একটি মেয়ের! যত দিন যাচ্ছে, সে এভাবে নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। সেই চেতনাই কি আর তাকে আগের মতো যথেচ্ছ বাইরে যেতে দিচ্ছে না?

না—তার নামে কলঙ্ক রটেছিল, কিন্তু সেই কলঙ্কের লজ্জা তাকে একটুও

ছোঁয়নি, কাজেই তার বাইরে না বেরুনোর কারণ সেটাও না। সে যেন নিজেকে নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। আর তার মনে হয়, তার শরীর না থাকলে কত ভালো হত। আবার সহসা বুঝতে পারে, তা কী করে সম্ভব এবং সে আপন মনে হাসে। তার হাসিতে কৌতুক ঝলমল করে ওঠে। শুধু ভূতেরাই অশরীরী।

ছোটবুবু। হাসছ কেন গো?

সামিরুন, তুই কখনও ভূত দেখেছিস?

ও ছোটবুবু। দুপুর বেলায় তুমি জিনের ডাঙায় দেখো, হাওয়া হয়ে ভূতগুলো ঘুরতে ঘুরতে যায়।

ধুর ছুঁড়ি। চৈতালি ঘূর্ণি।

তুমি জানো না। কাল দুপুরবেলায় আমার ওপর যেই না এসে পড়েছে, আমি চেঁচিয়ে বললাম গরু খা। গরু খা! গরু খা! অমনি পালিয়ে গেল।

রেবেকা হেসে অস্থির। গরু খেতে বললি কেন রে তুই?

কালোচাচাকে জিজ্ঞেস করো। জিনের ডাঙার নামুতে ঝিলের ধারে হিঁদুপাড়ার লোকে নাকি মরা মানুষ ফেলে দিত। তারা ভূত হয়ে আছে। গরু খা বললেই পালিয়ে যাবে। আমি যদি 'গরু খা' না বলতাম, আমার চোখে লাল ধুলো ছুঁড়ে কানা করে দিত না?

জিনবুড়ো তো মুসলমান। তোকে বাঁচাত। কেন জানলি? সে তোর প্রেমে পড়েছে।

সামিরুন টিভি থেকে 'প্রেম' জিনিসটা বুঝে ফেলেছে। সে লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলে, যাঃ! ছোটবুবুর খালি—

নাকি তুই তার প্রেমে পড়েছিস! নৈলে তুই ওখানে অতবার যাস কেন?

সামিরুন মুখে কান্নার ভান এঁকে বলে, মাজিকে বলে দেব। তুমি আমাকে খারাপ কথা বলছ।

ও মা! প্রেম খারাপ কথা বলছিস? অ্যাদ্দিন টিভি দেখে-দেখে—নাহ্! শেখপাড়ার মৌলবির সঙ্গেই তোর বিয়ে হওয়া উচিত।

রোকেয়ার ডাক ভেসে আসে। অ সামিরুন! এই হারামজাদি!

সামিরুন চেঁচিয়ে সাড়া দেয়। যাই মাজি! এবং রেবেকার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে ছুটে যায়।

রোকেয়া বেগমের মেজাজ আজকাল একটুতেই চড়ে যায়। আপনমনে বকবক করেন। প্রয়াত স্বামীর উদ্দেশে কখনও বিকৃত মুখে বলে ওঠেন, দুশমন! দুশমন! আর তাঁর ভাইজান ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরিও ক্রমে গম্ভীর। আরও বিস্ময়কর, তিনি কথা বলা কমিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সেই অট্টহাসিও কদাচিৎ শোনা যায়। ছোট ভাগনি রেবেকার সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে সহসা থেমে যান এবং অভ্যাসমতো বলেন, যাকগে মরুকগে।

দুপুরে উত্তরের জানালা খুলে রেবেকা জিনের ডাঙায় চৈতালী ঘূর্ণি দেখে। লাল ধুলো, শুকনো পাতা, খড়কুটোর শরীর সংগ্রহ করে সত্যিই যেন অশরীরীর নাচ। সামিরুন কেন ওখানে গিয়ে ঘুরে বেড়ায় বলে না। রেবেকার ইচ্ছে করে, সে-ও ওখানে একা-একা চলে যাবে। জিনের ধারে খন্ডহার বট-গাছটার তলায় গিয়ে বসে থাকবে মামুজির মতো এবং আকলু জেলের জাল ফেলা দেখবে। দেখবে বিস্তীর্ণ মাঠ, রেললাইনে ধীরে যাওয়া কোন রেলগাড়ি, বড় আকাশের নিচে যা অসহায়।

কিন্তু সে বাইরে যাবে না, কিছুতেই না, এমন একটা জেদ তাকে পেয়ে বসে। সে কি আরও একলা হয়ে যাবে বাইরে গেলে? সে বুঝতে পারে না। অথচ ক্রমশ নিজেকে নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার ইচ্ছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোর থেকে চৈত্রে কোনও-কোনও দিন গাঢ় কুয়াশা জমে থাকে। কালো মাঠে যাওয়ার আগে বলে যায়, বাঁওরের দেড়বিঘে ধানগুলো সুহালে ঘরে আসবে, এইরকম কুঁহা থাকলে। ক্যানে কী, কুঁহা হলে ঝড়বাদলা আসে না।

কুঁহা কুয়াশা। তার 'ঝড়বাদলা' বলতে বিকেলের কালবোশেখি। কোনও বছর ফাল্গুনেই কালবোশেখি আর শিলাপাত বোরোধানকে ছিঁড়েছুঁড়ে মেরে ফেলে। এ বছর ফাল্গুনে তেমন কিছু ঘটেনি। চৈত্রে তাই চাষবাসে চাপা আতঙ্ক থেকে যায়। কিন্তু কুয়াশার সঙ্গে কালবোশেখির না আসবার সম্পর্ক কী, রেবেকা জানে না। সে ভূগোলের বই খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে সহসা —খুবই আকস্মিকভাবে তার সারের কথা মনে পড়ে যায়। সার এর সদুত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু সার নেই।

নেই? চমকে ওঠে সে। এ যেন একটা বিস্ময়কর আর বিষণ্ণ আবিষ্কার, কাঁটালিয়াঘাট আছে, অথচ সেখানে তার সার নেই!

তবে কি এতদিন কাঁটালিয়াঘাটে একটি অস্তিত্ব তার খুব প্রিয় ছিল এবং সামনে তা না থাকলেও আড়ালে ছিল! সেই প্রিয় অস্তিত্বটি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে বায়ুমন্ডল থাকার মতো ঘটনা, যা থেকে শ্বাস নেওয়া যেত। এখন কি মাঝেমাঝে তাই তার দম আটকে আসে? কী নেই-কী যেন নেই এমন মনে হয়?

কী অবিশ্বাস্য ঘটনা! কাঁটালিয়াঘাটে তার সার নেই। রেবেকা পাষাণ-পাথর হয়ে পড়ে।

বাঁওরের ধারে দেড়বিঘের ধান ঘরে আসার পর একদিন বিকেলে হাঁকডাক করে কালবোশেখি এসে পড়ল। এই ঝড়টা আসে উত্তর-পশ্চিমে জিনের ডাঙার দিক থেকে এবং প্রথমেই তার সামনে পড়ে খোন্দ্‌কারবাড়ি। কিছুক্ষণ লাল ধুলোয় বাড়িটা রেঙে যেতে থাকে। একতলা সারবদ্ধ ঘরের টানা মসৃণ সিমেন্ট-বারান্দা দিয়ে সে এক অদ্ভুত রক্তিম প্রবাহ। দ্রুত সবাইকে ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিতে হয়েছিল বরাবরকার মতো। একটু পরেই ছিটেফোঁটা বৃষ্টি এল।

বৃষ্টিটা বেড়ে গেলে রেবেকা দরজা ফাঁক করেছিল। চোখ জ্বলে যাওয়া বিদ্যুতের পর কানে তালা ধরানো মেঘের ডাক। তবু ভালো লাগছিল তার। সামিরুন কর্ত্রীর ঘরে তাঁর কোমর মালিশ করছিল। রেবেকা জানত, তার মা এখন কোমরের আরাম ভুলে উঠে বসেছেন আর সামিরুনকে জেরা করে জেনে নিচ্ছেন, বাইরে পড়ে কোনও জিনিস পয়মাল হচ্ছে কি না। আর তিনি পুনঃ-পুনঃ বিড়বিড় করে 'আল্লা' শব্দটি উচ্চারণ করছেন। যতবার প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডেকে উঠছে, ততবার রোকেয়ার 'আল্লা' শব্দটি করুণ হচ্ছে, রেবেকা জানে।

কিন্তু বারান্দার পশ্চিম দিকটা খোলা। সেদিক থেকে আসা বৃষ্টিরেখা-গুলির মধ্যে একটি চেনা ছবি। বারান্দায় ক্রমে লালা ধুলো গলে ধুয়ে নেমে যাচ্ছে দেখে রেবেকার মনে সন্তর্পণে সারের কথা ভেসে আসছিল। সার বলতেন, প্রকৃতির নিয়মগুলো লক্ষ করলে একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য দেখবে তুমি! প্রকৃতি যা ঘটায়, তার কোনওটাই যেন উদ্দেশ্যহীন নয়। তুমি ভাববে ঝড়-বজ্রবিদ্যুৎ-বৃষ্টিপ্লাবন উপদ্রব, ভীষণ-ভীষণ উপদ্রব। তাই না? কিন্তু এগুলি মানুষকে একদিকে যেমন প্রতিরোধের উদ্দীপনা জোগায়, তেমনি প্রকৃতি নিজের তৈরি জিনিসগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। তুমি কি বুঝতে পারছ রুবি, কী বলতে চাইছি?

রেবেকা সহসা চিৎকার করে ডাকে, সামিরুন! সামিরুন!

এই ঝড়বৃষ্টির উপদ্রবের মধ্যে ভূতের মতো সারের পুরনো কথাগুলির প্রতিধ্বনি তাকে অস্থির করেছিল। মেঘের গর্জন তার চিৎকারকে চেপে ছিল। আর সে তখন খুবই আতঙ্কিত, বারান্দা দিয়ে ছুটে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়ল। রোকেয়া চমকে উঠে বলেন, কী হয়েছে রুবি?

তিনি ভেবেছিলেন খোন্দকারের রুহ্ (আত্মা) তাঁর মেয়েকে কোনও ভাবে সাড়া দিয়েছে। তাঁরও তো ঘরে একা থাকতে কত সময় আতঙ্কে শরীর ছমছমিয়ে ওঠে। খোন্দকারের মৃত্যুর পর অনেকদিন কালোর বউকে তার ঘরে রাতে শুতে দিতেন। বউটার কোলে বাচ্চা। রাতে কান্নাকাটি করলে বিরক্ত হতেন রোকেয়া। কিন্তু রেবেকা তাঁর কাছে কিছুতেই শোবে না। আবার সামিরুনকে ছাড়াও সে শোবে না। ক্রমে রোকেয়া সাহসী হয়ে উঠেছেন। অনেক রাত অব্দি কোরান পাঠ করে কাটান।

রেবেকা কাতর হেসে বলে, বাজ পড়ল আম্মি! আমি যা ভয় পেয়ে-ছিলাম না?

সামিরুন দরজা খুলে কয়েক পা এগিয়ে খোলা অর্ধবৃত্তাকার চত্বরের কাছে যায় এবং আবার বিদ্যুতের ঝলক দেখে ফিরে আসে। সে কিন্তু হাসছিল। খুব ভালো হয়েছে মাজি! ফজল মীরের তালগাছের মাথায় আগুন! ও ছোটবুবু! দেখবে তো দেখে এস!

রেবেকা বলে, তুই কী করে বুঝলি তালগাছটা ফজল মীরের? কোথায়

মীরপাড়া, আর কোথায় আমাদের দরগাপাড়া!

না ছোটবুবু। গাছটা দেখা যায় না? খুবই লম্বা। দেখে এস না তুমি।

রেবেকার দেখতে ইচ্ছে করে। জীবনে কিছু বাজপড়া গাছ সে দেখেছে। কিন্তু বাজপড়ে আগুনে জ্বলতে সে দেখেনি। এরকম কিছু দেখার মধ্যে বিস্ময় থাকে। কিন্তু তখনই সে সামিরুনের দিকে তাকায়। ফজল মীরের তালগাছে বাজ পড়ার জন্য খুশি কেন সামিরুন? সে ওর চুল টেনে দিয়ে বলে, হাসিসনে বলে দিচ্ছি। বাজটা যদি—

থেমে যায় রেবেকা। রোকেয়া সায় দিয়ে বলেন, দোয়াদরুক পড়তে হয় এখন। আল্লার গজব।

বলে তিনি বিছানায় বসে দুহাত তুলে সত্যিই বিড়বিড় করে আরবি শ্লোক আবৃত্তি করেন। রেবেকা তখনও সামিরুনের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামিরুন আস্তে বলে, সারের টাকা দেয়নি ফজলমীর। তা জানো?

লাল ফ্রকপরা কিশোরী আতরাফ কন্যা কথাটি বলেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, ও ছোটবুবু! শিল পড়তে লেগেছে। ওঃ! কত্তো মোটা-মোটা শিল! আমি কুড়ুব!

বৃষ্টির সঙ্গে এতক্ষণে বারান্দায় বরফের ছোট-বড় কুচি ছিটকে পড়ছিল। সামিরুন বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরে ছুটে যায়। রেবেকা হকচকিয়ে উঠেছিল সামিরুনের কথা শুনে। কিছুদিন আগে মামুজি তার মাকে কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, ফজল মিয়াঁ সানুর বাড়ি দখল করে ফেলেছেন। বাকি দুহাজার টাকা দিয়ে বিক্রিকবালা দলিল রেজেস্ট্রির কথা ছিল। শুনলাম কবে সানু এসেছিল। ছুতোনাতা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। রোকেয়া কোনও মন্তব্য করেননি। রেবেকা বুঝতে পেরেছে, সানুর ওপর তার মা প্রচণ্ড খাপ্পা! সে মনে মনে বলেছিল, আম্মি! আপনি সারকে এখনও চেনেন না! আর আম্মি! আপনি কেমন করে ভাবলেন সার—

রেবেকার মনে এখন সেই অসমাপ্ত বাক্যটি ফিরে আসতেই সে বিব্রত। অর্ধবৃত্তাকার খোলা চত্বরের লাল সিমেন্টে, দুধারে বসার বেঞ্চ আর উঠোনে নামার চারটি ধাপে প্রচুর শিল ছড়িয়ে পড়ছে। সে শিলাপাতের স্মৃতির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। গত বছরও তো সে পিঠ ও মাথা তোয়ালেতে ঢেকে সামিরুনের সঙ্গে বাটিভর্তি শিল কুড়িয়েছিল। কিন্তু এত বেশি শিল পড়ছিল না। তখন ছবি সাবরেজিস্ট্রারের বউ হয়েছিল। রেবেকা আর সামিরুন যখন শিলের হিম জল গেলাসে ঢেলে তারিয়ে খাচ্ছে, ছবি বলেছিল, ছি ছি! ওই নোংরা পানি খাচ্ছিস তোরা? আম্মি! এমাসে আমরা ফ্রিজ কিনেছি জানেন? ডিপফ্রিজে বরফের টুকরো জমে। রোজার ইফতারে তাই দিয়ে শরবত খাই! এসব কথা শুনে রেবেকা বলেছিল, ও আম্মি! ছবির ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি আর

আপনার খোদার দেওয়া ঠান্ডাপানি কি এক? ছবিকে বুঝিয়ে দিন তো!
ছবি রাগ করে বলেছিল, তুই গেঁয়ো ভূত হয়ে আছিস রুবি। কিসের সঙ্গে কী!

সামিরুন মাথায় পিঠে তার গামছা চাপা দিয়ে শিল কুড়োয়। সে ডাকে ছোটবুবু! এস, এস!

কিন্তু আবার মেঘ ডাকতেই সে পিছিয়ে বারান্দায় চলে আসে। রেবেকা আস্তে বলে, তুই কুড়ো!

রেবেকার ইচ্ছে করে দেখতে, সত্যিই ফজলমীরের উঁচু তালগাছের মাথা জ্বলে যাচ্ছে কি না। কিন্তু স্মৃতি বারবার তাকে ঘুরিয়ে দেয় অন্য-অন্য দিকে। একবার স্কুল থেকে আসবার সময় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে আসা ঝড় কাকলি, ছন্দা, ডালিয়া আর তাকে একটা পোড়োবাড়ির বারান্দায় তুলেছিল। ঝড়ের পর বৃষ্টি আর শিল পড়েছিল। সুলতান মিয়াঁর মেয়ে ডালিয়া ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে গেল। তাদের বাড়িতে খুব কড়াকড়ি ছিল। কাকলি বলল, এই! চল্ আমরা সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানে যাই! আম কুড়িয়ে আনি। বাগানটা উঁচুতে। তার নিচে ঘাটবাজার। সিঙ্গিমশাইয়ের লোক ভোলা আসবার আগেই তিনজনে অনেক আম কুড়িয়েছিল। সেই আমে রোকেয়া এক বোয়ম আচার দিয়েছিলেন।

সেই কাকলি এখন মুটকি বড় হয়ে দুর্গাপুরে আছে। বেচারি ছন্দা তো বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। ডালিয়া বীরভূমের গাঁয়ে বউ হয়েছে। শুধু রেবেকা এখনও আছে। সে কারও বউ হয়নি। কেন হবে? সে কি বউ হওয়ার জন্য জন্মেছে? না। সে কাঁটালিয়াঘাট ছেড়ে কোথাও যাবে না। যাবে না এই প্রিয় বাড়ি ফেলে রেখে। আর তার ওই শ্রেণীবদ্ধ ফুলগাছগুলি?

ফুলগাছগুলি কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ফুল ফুটিয়ে রঙের ভাষায় এবং গন্ধ ছড়িয়ে গন্ধের ভাষায় তাকে বলে, তুমি আমাদের ফেলে চলে যেও না। তোমাকে ছাড়া আমরা বাঁচব না।

রেবেকা তাকায়। ফুলগাছগুলি শিলাহত! ছেঁড়া পাতার কুচি ছড়িয়ে পড়ছে নিচে। ঝড়টা কমেছে। কিন্তু পাগলাটে হাওয়া বৃষ্টি মেখে নাচছে। শিলাও ক্রমে কমে আসছে। ফুলগাছগুলি ভিজে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ঝিলিকে উঠোন জুড়ে বোগেনভিলিয়ার রক্তিম ফুলগুলি স্পষ্ট হতে থাকে পুনঃপুনঃ। রেবেকা জোরে শ্বাস ফেলে।

ছোটবুবু! এই দেখ, কত্তো শিল কুড়িয়েছি। সামিরুন তাকে বাটি দেখায়। হাসতে হাসতে বলে, আজ মামুজি থাকলে সরবত খাওয়াতাম ছোটবুবু!

ফয়েজুদ্দিন খান চৌধুরি দুদিন আগে বীরভূমে তাঁর পৈতৃক ভিটেয় গেছেন। বোনকে বলে গেছেন, দু-তিনদিনের ছুটি দে ভাই বুড়ি। আমার

ঘরখানার অবস্থা দেখে আসি। তাঁর যাওয়ার পর মাহিন্দার কালো শুতে আসে। বারান্দায় তার ভাইঝি সামিরুন বিছানা পেতে দেয়। কালো বিছানার পাশে লাঠি, টর্চ আর একটা কাটারি নিয়ে শোয়। দিনকাল ভালো নয়।

ও ছোটবুবু!

ধুর ছুঁড়ি! খালি ছোটবুবু আর ছোটবুবু।

রোকেয়া বেগম দরজার ফাঁকে উঁকি মেরে তারপর বেরিয়ে আসেন। সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, অই! অই! দেখছ কালোর কান্ড? অত করে বলি, খড়গুলো ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে পাঁজা করে দে। দিচ্ছি-দেব করে—কী অবস্থা!

সামিরুন বলে, মাজি! সব খড়ের আঁটি কুড়োতে কালোচাচার দুদিন লেগে যাবে।

দাঁড়া! আসুক সে। নেমকহারাম! সব নেমকহারাম!

খিড়কির ঘাটের দিকে একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে এলোমেলো সাজানো খড়গুলি ঝড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে আঁটিগুলি। আবার রোদে না শুকিয়ে পাঁজা করলে পড়ে যাবে। রোকেয়া বারান্দা দিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে যান। রেবেকা ডাকে, আম্মি! আম্মি!

রোকেয়া কান করেন না। কর্কশ কণ্ঠস্বরে বলেন, খড়ের যা দাম হয়েছে। মাঠ থেকে চুরি করে বেচে দেয় কি না কে দেখেছে? তাও যা ঘরে এল, তার ওপর কারও মায়াদরদ আছে? শ্বশুরসাহেবের আমলে গোয়ালভরা গরু ছিল। কার সাধ্য বলে। খোন্দকাররা খড় বেচে খায়? তো রুবির আব্বুর বড়লোকি! মুরগি পোষা চলবে না। গরু পোষা চলবে না। জমির খড় এনে রাখলে নাকি পোকামাকড় হবে। একে-ওকে তাকে বিলিয়ে দিতেন। শেষে এক বেটির বিয়ে দিয়েই মিয়াঁ কাবু।

রেবেকা ভাবছিল, আম্মি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন দিনে দিনে? কী সব বলেন আপন মনে—এইরকম সব কথা একদফা শেষ হয়ে বড় মেয়ের বিয়েতে। এবার আসবেই আসবে দ্বিতীয় দফায় ছোট মেয়ের বিয়ের কথা। সে এগিয়ে গিয়ে মায়ের হাত ধরে টানে। আহ্ আম্মি! বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছেন না? আসুন বলছি।

শুকনো খড়গুলো ভিজে পয়মাল হয়ে গেল!

রেবেকা হেসে ওঠে। খড়গুলো কি ভিজত না আম্মি? আবার কত বৃষ্টি হবে। আর আম্মি! আব্বু বলতেন না, কালবোশেখির নিয়ম এই? একদিন এলে পরপর কয়েকদিন আসবেই। আবার ভিজবে। কিন্তু তারপর গ্রীষ্মকাল না? কতো রোদ।

রেবেকা টানতে টানতে নিয়ে আসে মাকে। বারান্দার ডাইনিং টেবিল-

চেয়ার ভিজে গেছে। রোকেয়ার রাগটা গিয়ে পড়ে কাজলার ভাইঝির ওপর। অ্যাই ছুঁড়ি! বারান্দায় আবিল জমেছে। বারান্দা সাফ করবি। টেবিল-চেয়ার মুছবি। হুঁ, শিল কুড়োনো হচ্ছে! ধিঙ্গি মেয়ে। শাড়ি পরলে ছেলের মা দেখাবে—আর শিল নিয়ে খেলা!

রেবেকা সামিরুনকে চোখ টেপে। সে শিলভরা বাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ইচ্ছা ছিল, মাজিকে শিলের জলে চিনি গুলে শরবত তৈরি করে খাওয়াবে। এতগুলি শিল! তিন গ্লাস শরবত তো হবেই। কিন্তু মাজি মুখ করছেন। সে টের পায় বাটি ধরে থাকা তার হাতটা হিমে নিঃসাড় এবং নতমুখে বাটিটা টেবিলে রাখে। আস্তে বলে, বিষ্টি এক্ষুনি কমে যাবে। তখন টিউবেল থেকে পানি এনে বারান্দা ধোব। জিনের ডাঙার ধুলো খুব খারাপ।

রোকেয়া এতক্ষণে জোরে শ্বাস ফেলেন। শ্বশুরসাহেবের আব্বার লাগানো অতবড় শিরীষ গাছটা! তিনি উত্তর-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করেন। ফের বলেন, বাড়ির আব্রু ছিল গাছটা। ঝড়ঝাপটা তো কম দেখিনি এ বাড়িতে! সব আগলে রাখত। ছবির বিয়েতে খামোকা গাছটা কাটল! ঘাটবাজারের কাঠগোলায় কি লকড়ির অভাব ছিল? গাছ লাগায় একপুরুষে। কাটে অন্যপুরুষে। আর একটা লাগিয়ে যেত যদি, সে-ও বুঝতাম।

রেবেকা মায়ের গায়ে হাত রাখে। ওঃ আম্মি! মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই।

নিন্দে নয়। কথার কথা বলছি।

আপনি আমার লাগানো গাছগুলো দেখছেন না কিন্তু!

ফুলগাছ! ফুলগাছ আব্রু-ইজ্জত বাঁচাবে? বাঁচায়? উল্টে খামোকা সাদা কাপড়ে কালির ছিটে—

রোকেয়া হঠাৎ থেমে ঘরে ঢোকেন। আর এইসময় ঝোড়োহাওয়ার শরীরে আঁকা তির্যক বৃষ্টিরেখাগুলি ভেদ করে মসজিদের মাইক থেকে বৈকালিক নামাজের আজান ছুটে আসে। তিনি মাথায় ঘোমটা টেনে ওজু করার জন্য বদনা তুলে নেন। বারান্দার পুব দিকটায় বৃষ্টির ছাঁট নেই। জিনের ডাঙার লাল আবিশ পৌঁছুতে পারেনি। রোকেয়া সেখানে ওজু করতে বসলে রেবেকা সামিরুনের দিকে ঘোরে।

দুজনের চোখে চোখে কথা হয়। সামিরুন নিঃশব্দে হেসে শিলভরা বাটিটি দেখায়। রেবেকা বাটির গায়ে হাত রেখে শীতলতার স্বাদ নেয়। তারপর বলে, আয়।

সামিরুন তাকে অনুসরণ করে বাটি নিয়ে। ঘরে ঢুকে রেবেকা বিছানায় ধপাস করে বসে বলে, ঝড়টা যখন এল, তখন খুব ভয় পেয়েছিলাম জানিস সামিরুন?

সামিরুন তাকায়। তার চাহনিতে চমক ছিল।

কেন ভয় পেয়েছিলাম জিজ্ঞেস করছিস না? রেবেকা তার লাল চুড়িপরা হাত খামচে ধরে। রাখ্ তোর শিলের বাটি। রাখ বলছি। এই টেবিলে রাখ্।

ও ছোটবুবু! তুমি কি জিনটাকে দেখতে পেয়েছিলে?

হুঁউ।

কেমন চেহারা গো?

সারের মতো।

সামিরুন হেসে অস্থির হয়। যাঃ! জিনটা তো বুড়ো।

সারও বুড়ো হয়ে গেছেন।

যাঃ! কালোচাচা সেদিন সারকে দেখেছিল—ও ছোটবুবু, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। হারামি ফজল মীর সারকে টাকা মিটিয়ে দেয়নি। তাই তার তালগাছটাতে বাজ পড়ল।

রেবেকা একবার তার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে আঙুলে রাখে। নোখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, মামুজি বলছিলেন সার খুব বোকা। নাহ্—বোকা না। একজনের ওপর রাগ অন্যজনের ওপর ঝাড়তে গিয়ে কেমন জব্দ বল্!

কালোচাচা সারকে দেখে এসে মাজিকে বলছিল। কলকাতায় থেকে সার টকটকে ফর্সা হয়েছে। কালোচাচা বলছিল, কলকাতা ঠান্ডা জায়গা। রোদ-হাওয়া কম। ছোটবুবু! কাজিদের দুলামিয়াঁ তাই অত ফর্সা আর তোমার মিনিআপার কথা ভাবো! কালোচাচা বলছিল, সার—

রেবেকা তার চুল টেনে ধরে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে, চুপ করবি তুই? তারপর সে ভেংচি কাটে! সার টকটকে ফর্সা শুনে লোনা দিয়ে পানি গড়াচ্ছে! চলে গেলিনে কেন কলকাতা সারের সঙ্গে? তুইও টকটকে ফর্সা হয়ে ফিল্ম-স্টারদের মতো সুন্দরী হয়ে যেতিস। নাহ্—মিনি আপার মতো। ছবির মতো। ওরা মুখে রঙ মাখে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়। ভুরু প্লাক করে নকল ভুরু আঁকে। বলেই সে একটু হাসে। তুই একটু কালো। কালোচাচা বেশি কালো। কিন্তু কালোচাচার নাকটা খাড়া। তোর নাকটা বোঁচা। ছবির নাক দেখেছিস? খুব খাড়া। মামুজি ওকে বলতেন জিপসি মেয়ে। ও! জিপসি কারা তুই তো জানিস না। সেই যে আগে তাঁবু ঘোড়াগাধা নিয়ে ইরানিরা আসত। তুই দেখেছিস? মিথ্যে বলবিনে বলে দিচ্ছি। আর ওরা আসে না। আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। তো আমার নাক কেমন বল্? মামুজি বলেন তেলেভাজা বেগুনি। বেশ। আমার নাক আমার।

ছোটবুবু! শিলাগুলা গলে গেল! শরবত খাবে না?

তুই যা। আম্মি এখন নামাজ পড়ছেন। চিনি নিলে জানতে পারবেন না! শিগগির!

সামিরুন দরজার দিকে ঘুরে বলে, এক্ষুনি সন্ধে হয়ে গেল নাকি? তারপর সুইচ টেপে। কিন্তু আলো জ্বলে না। কারেন ফেল। বলে সে সভয়ে হেরিকেন জ্বালতে বেরিয়ে যায়। কেন না রোকেয়া নামাজ পড়ে উঠেই তাকে গাল দেবেন।

এখন বাতাস থেমে গেছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরছে। এখনই ভুল করে পোকামাকড় ডাকাডাকি শুরু করেছে। রেবেকা আস্তে শ্বাস ফেলে। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার জমেছে। শূন্য চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলে, সার! মামুজিকে চিঠি লিখে বলেছিলাম, আপনি যেন বিশাল স্বর্ণচাঁপা হয়ে পৃথিবীতে ফুটে উঠুন! ওটা আত্মপ্রতারণা। ওটা আমার মুখের কথা! নাকি তখনও বুঝিনি, আপনি কাঁঠালিয়াঘাটে এক প্রিয় অস্তিত্ব? এই মাটিতে ছিল আপনার চলাফেরা। আপনার সাইকেলের ঘণ্টি বাজলে টের পেতাম আপনি আছেন! উঁচু পাঁচিলের ভেতর থেকে আমার কানে সেই শব্দ ভেসে আসত। আমার বুকের ওপর দিয়ে শান্ত আর মন্থর গতিতে গড়িয়ে যেত আপনার সাইকেলের চাকা। সার! এখন আমি জিনের ডাঙার মতো নিষ্ফল মাটি হয়ে গেছি। গভীর ক্ষতচিহ্নগুলি নিয়ে পড়ে আছি এক কলঙ্কিনী মেয়ে। এবার আমি কী করব বলুন সার, আমি কী করব? না—স্বর্ণচাঁপাও আর আমার সান্ত্বনা নয়। আমি এই বিরাট পৃথিবীতে এত অসহায় আর একলা হয়ে গেছি সার!

বারান্দার টেবিলে হেরিকেন জ্বেলে রেখে এসে সামিরুন এ ঘরের টিনে বাতিটা খুঁজে দেশলাই জ্বালায়। রেবেকা আস্তে বলে, আহ্!

বাত্তি জ্বালব না ছোটবুবু?

না।

ছোটবুবু! সামিরুনের কণ্ঠস্বর চিড় খায় এই ডাকে। কেন না রেবেকার 'না' শব্দটি ছিল ঝড়ে ছেঁড়া বিক্ষিপ্ত ভিজে বোগেনভিলিয়া ফুলের মতো রক্তিম। তাই সহসা অনাথ আতরাফকন্যার সম্বোধন থেকে একটা বু বাদ যায় এবং সে বরাবর এভাবেই এক আশরাফ কন্যার নিকটবর্তী হতে চায়। ছোটবু! তুমি লুকিয়ে কাঁদছ? কেঁদো না! দেখ ছোটবু, আমারও তো বাপ-মা নেই। কেউ নেই। আমি কি সেজন্যে কাঁদি? না ছোটবু! মেয়েটার গলা ধরে যায়। ছটফটিয়ে বলে, তুমি কাঁদলে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে না?

রেবেকা একটু পরে বলে, আলো জ্বেলে দে। আজ টিভি দেখা যাবে না। আমরা লুডো খেলব।...

ফয়েজুদ্দিন খানচৌধুরি ফিরে এলেন পরদিন দুপুরে। ম্যাটাডোর-বোঝাই তাঁর একটুখানি সংসার ছিল সঙ্গে দুটো কাঠের আলমারি, ইংরেজি-

বাংলা নতুন-পুরনো বইয়ের পাঁজা, পূর্বপুরুষের একটা ছোট্ট সিন্দুক এইসব। কালো উঠোনে ভিজে খড় শুকোচ্ছিল তার ভাইঝিকে নিয়ে। সে মিয়াঁজির মাল খালাসের তদারকে গেল। ম্যাটাডোরে কজন খালাসি ছিল রেবেকা দৌড়ে গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ফয়েজুদ্দিন বারান্দার টেবিলে বসলে রোকেয়া হাতপাখার বাতাস করতে গিয়ে ধমক গেলেন। কাল ঝড়ের পর থেকে কাঁটালিয়াঘাটে বিদ্যুৎ নেই। ফয়েজুদ্দিন বলেন, ঘরটা আঞ্জুকে দিয়ে এলাম। বেচারির থাকার জায়গা ছিল না। এক দঙ্গল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কুঁড়েঘরে থাকত। জোহা রিক্‌শ চালাত। গত মাসে হাসপাতালে মারা গেছে। আমি কোথায় আছি জানলে তো খবর দেবে?

রোকেয়া মৃদুস্বরে বলেন, জোহা রিক্‌শ চালাত?

করবে কী? লেখাপড়া শেখেনি। ফয়েজুদ্দিন একটু হাসেন। খান-বাহাদুরের বংশধর!

আঞ্জুও আমাদের খান্দান ভাইজান!

হুঁ। সে এখন বিড়ি বাঁধে। আইনুদ্দিনকে মনে পড়ে তোর? পড়বে না। আব্বাসাহেবের ফরসি সাজাত। তার পোতা মফেজ এখন কোটিপতি। বিড়ির ব্যবসা করে বিল্ডিং বানিয়েছে। শুনলাম তিনটে মোটরগাড়ি আছে তার। মক্কা গিয়ে হাজি হয়েছে। খুব দানয়ারাত করে। কিন্তু ইনফিরিও-রিটি কমপ্লেক্স! আঞ্জু তার কারখানার বিড়ি বাঁধে। এটা তার গর্ব!

আপনাকে দেখা করতে আসেনি?

তোর মাথাখারাপ? এক গ্লাস পানি খাব। যা রোদ পড়েছে আজ! এদিকে এতল্লাটে এসে দেখি ঝড়পানি হয়েছে খুব।

রোকেয়া ডাকে, অ সামিরুন!

সামিরুন রেবেকার মাথার কাছে ঝুঁকে কিছু দেখছিল। ছুটে আসে। বেবেকা মামুজির বইগুলো দেখছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি আপনার ঘর সাজিয়ে দেব মামুজি। তার মুখ উজ্বল ছিল। উঠোনে আলমারি দুটো আর সিন্দুক দেখিয়ে সে ফের বলে, ওগুলো কালো কেন মামুজি?

ফয়েজুদ্দিন জল খেয়ে বলেন, মেহগিনি পালিশ। দাদাজির আমলে তৈরি। তোর আব্বু খান্দান খান্দান করতেন! কাঠেরও খান্দানি আছে রে! আর সিন্দুকটা দেখছিস—ওতে গুপ্তধন আছে। তোর আম্মি একদিন ওটার ওপর চড়েছিল। তারপর পড়ে গিয়ে হাত মচকে সে এক হুলস্থুল। বাগদিপাড়ায় এক হাড়বসানি ডাক্তার ছিল।

ডাক্তার? বাগদিপাড়ায়?

লে হালুয়া! মদু বাগদিনিকে ডাক্তার বলব না? সেকালের অর্থোপিডিক্স। অ্যানাটমি বুঝত।

ওঃ মামুজি!

রোকেয়া উঠে দাঁড়িয়ে সামিরুনকে বলেন, তুই ছুঁড়ি হাঁ করে কী শুনছিস? খড়গুলো উল্টে দে। কালো! সেই লোকগুলোকে বললে না কেন? আলমারি সিন্দুক বারান্দায় তুলে দিয়ে যেত।

ফয়েজুদ্দিন বলেন, রোদে চিত হয়ে এ বেলা পড়ে থাক। আমি ওদের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আসি। আর রুবি! বইপত্তর রোদে দে মা! পোকায় কেটে কী অবস্থা করেছে। ওই চামড়া-বাঁধানো বইগুলো দেখছিস? বারোটা ভলিউম ছিল। সাতখানা আছে।

দেখেছি মামুজি! অ্যারাবিয়ান নাইটস! আমি আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়েছি কিন্তু।

এগুলো ওরিজিন্যাল ট্রান্সলেশন। রিচার্ড বার্টনের করা। সে এক মজার লোক ছিল। মুসলমান সেজে মক্কায় হজ করতে গিয়েছিল। আফ্রিকার নীল নদের উৎস খুঁজতে গিয়েছিল। সে ভারি মজার গল্প। রাত্তিরে বলব'খন।

ফয়েজুদ্দিন উঠোনে নেমে বেরিয়ে যান। ম্যাটাডোর অস্থিরতায় হর্ন বাজাচ্ছিল। অন্তত পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরত্ব পেরুতে হবে আবার।

রেবেকা বইগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! বারান্দার সামনে অর্ধবৃত্তাকার চত্বরে একটার পর একটা বই সাজিয়ে রোদে মেলে দেয় সে। একটা বইয়ের নাম ব্যাবিবট কিংবা ব্যাবিট। সে বুঝতে পারে না উচ্চারণ ভুল না ঠিক। লেখক সিনক্লেয়ার লুইস। পাতা উল্টে প্রথম লাইনটা সে মৃদুস্বরে পড়তে থাকে, 'দি টাওয়ার অব ভেনিস অ্যাস্পায়ার্ড অ্যাবাভ দি মর্নিং মিস্ট্...'

এবং তখনই অতর্কিতে তার মনে সারের আবির্ভাব। সার! আপনি থাকলে—এই তিনটি শব্দ মনে তখনই বুদ্বুদ হয়ে কেটে যায়। সে নিজের প্রতি ক্রোধে কিন্তু এবং বইটা বুজিয়ে রেখে কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ থাকে।

রোকেয়া বেগম তাঁর ভাইজানের জিনিসগুলি দেখছিলেন। উঠোনের প্রচণ্ড রোদে ঈষৎ ঝুঁকে তিনি স্পর্শ করছিলেন ছোট সিন্দুকটিকে। কারুকার্য-খচিত পেতলের পাতে মোড়া সেটি এবং কাঠেও বিবিধ নকশা, প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক। স্মৃতি অস্পষ্ট, তবু কী মায়া এখন তাঁর চোখ ভিজিয়ে দেয়। এখন এটির উচ্চতা তাঁর হাঁটুর সমান। এর ওপর উঠে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন, আর সদু বাগদিনি তাঁর হাতের হাড় বসিয়েছিল, ভাবতেই বিস্ময় লাগে। তিনি ধরা গলায় ডাকেন, রুবি?

অন্যমনস্ক রেবেকা সাড়া দেয়, উঁ?

বইয়ে কী আছে? এটা দেখে যা। আয় না মা! দেখে যা কী এনেছেন ভাইজান!

গুপ্তধন।

ওরে! মুর্শিদাবাদ বীরভূম বর্ধমান এই তিন জেলার আয়মাদারদের

সেরা আয়মাদার বাড়ির সিন্দুক। তোর আব্বু বলতেন, এই তিন জেলার বাইরে কোথাও আয়মাদারি কেতা নেই। আদবকায়দাও নেই।

ওই সিন্দুকে সেগুলো ভরা আছে নাকি আম্মি?

ফয়েজুদ্দিন প্রথামতো কেসে বাড়ি ঢুকছিলেন। তিনি বলেন, আছে বলতে পারিস। বিলিতি সিন্দুক। দাদাজিকে প্রেজেন্ট করেছিলেন ছোটলাট। তার সঙ্গে খানবাহাদুর খেতাব। এর মধ্যে সেইসব কাগজপত্তর আছে। দাদাজির বিলিতি পোশাক, আবার আচকান-পাগড়ি-পাজামা-টুপি। আর একখানা বই। বইটা লম্বা-চওড়া। দেখাব'খন।

রেবেকা একটু আগ্রহ দেখায় অগত্যা। কী বই মামুজি?

১৯১২ সনে দিল্লিতে পঞ্চম জর্জের দরবার বসেছিল। তা-ই নিয়ে বই। পাতায়-পাতায় ছবি। আঁকা ছবি না, ফোটো। লাটসায়েব বইটা দাদাজিকে —থাক গে মরুক গে! ফয়েজুদ্দিন ধাপে পা দিয়ে বলেন, ও বুড়ি! তুই রোদে নেমেছিস কেন?

সিন্দুকটা দেখে কত কথা মনে পড়ছে ভাইজান! এটা ধরেই আমি দাঁড়াতে শিখেছিলাম। আম্মা বলতেন।

লে হালুয়া! কেঁদে ফেললি যে! রুবি! তোর মাকে খান্দানির ভূতে ধরেছে। টেনে নিয়ে আয়।...

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় বসতেই ফ্যানটা ঘুরতে লাগল। সামিরুন চেঁচিয়ে উঠল, কারেন এসেছে! কারেন এসেছে! যখনই কারেন থাকে না, মামুজি আসেন আর কারেনও আসে!

ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিয়ে বলেন, এই খানচৌধুরিদের গায়ের গন্ধে কারেন্ট বাপ-বাপ করে আসে। তারপর তাঁর অট্টহাসিটি হাসতে থাকেন।

কালো খড়ের আঁটি উল্টে দিচ্ছিল! সাদা দাঁতে হেসে বলে, সকাল থেকে পাওয়ার সেন্টারে ছৈরদ্দি দলবল নিয়ে বসে ছিল। অফিসারবাবুদের ঢুকতে দেবে না। বেরুতেও দেবে না। খরার ধানের জন্য পানি চাই। মেসিন না চললে পানি আসবে না। টাউনে খবর গিয়েছিল। টেরান্সমিটার এতক্ষণে সারিয়ে দিল বোধ করি।

মলোচ্ছাই! দিলি তো আমার গুমোর ফাঁস করে? ফয়েজুদ্দিন কৌতুকে বলেন। যাক গে মরুকগে! রুবি! তুই আরব্য উপন্যাস পড়েছিস বলছিলি। আমার দাদাজির সিন্দুকের ভেতর দাদিমা লুকিয়ে থাকতেও পারেন। সেই যে দৈত্যের গল্পটা—

আপনার দাদাজির কতগুলো বউ ছিলেন মামুজি?

মোটমাট একডজনের কম নয়। আমার দাদিমা লাস্ট্।

তাঁরা সুন্দরী ছিলেন!

আয়মাদারবাড়ির খেঁদি বুঁচি পেঁচি সবাই সুন্দরী। খান্দান ইজ বিউটি।

রেবেকা একটু পরে বলে, সিন্দুকটা খুলুন না মামুজি!

এ বেলা রোদ থাক। তবে—ফয়েজুদ্দিন মিটিমিটি হেসে বলেন, তুই 'পন্ডোরাস বক্স্' কথাটি জানিস? হুঁ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে জানিস না। পাড়সনি গল্পটা। প্যান্ডোরার ঝাঁপি খুললেই যত সব সাংঘাতিক জিনিস বেরিয়ে পড়ত। সুখের সংসারে অসুখের উৎপাত।

রেবেকা খুব আস্তে বলে, জানি।

তোর টেক্সট্ বইয়ে ছিল বুঝি?

রেবেকা মাথাটা একটু দোলায়, নাহ্।

তা হলে তোর সারের কাছে শুনেছিলি! প্যান্ডোরা'স বক্স খুলতে নেই।

রেবেকা সহসা উঠে চলে যায়। ফয়েজুদ্দিন বোনের দিকে তাকান। রোকেয়া বলেন, গোসল করে নিন ভাইজান! রাঁধাবাড়া করে রেখেছি। আপনার মুখচোখ শুকনো লাগছে।

হুঁ।

রোকেয়া রান্নাঘর থেকে একবার ঘুরে এসে দেখেন, তখনও ফয়েজুদ্দিন বসে গোঁফে তা দিচ্ছেন। রোকেয়া ডাকেন, ভাইজান! উঠুন।

হুঁ।

অ সামিরুন! চৌবাচ্চায় পানি ভরে দে। রোকেয়া কথাটা অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিলেন। কেন না হাবল কাজির মতে এই 'হুঁ' খুব গোলমেলে।

সামিরুন দৌড়ে গোসলখানার পাশে টিউবেলের কাছে যায়। টিউবলের মুখে আটকানো নলটা কবে ভেঙে গেছে। সে বড় প্ল্যাস্টিকের রঙিন বালতিতে জল ভরতে থাকে। রেবেকার চুল ঝাড়ার মতো তার টিউবেলের হাতল টেপারও একটা ছন্দ আছে। তার দুটি প্রজাপতি ক্লিপে আঁটা বেনী পিঠে লাল ফ্রকের ওপর ছন্দে নাচানাচি করে।...

এইভাবে খোন্দ্কার বাড়িতে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসছে। ছোট-ছোট সুখ, ফয়েজুদ্দিনের তামাশা আর প্রবল অট্টহাসি, রেবেকার হাতে তাঁর একটার পর একটা জরাজীর্ণ বই, এইসব একরকম সময়প্রবাহ এবং হঠাৎ-হঠাৎ ছোট-ছোট দুঃখ, দুর্ভাবনা, আর রেবেকার জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে আবর্ত। দাদাপীরের মজার সংস্কার শীতের শেষে থেমে গিয়েছিল। চৈত্রে দেউড়ির গাঁথুনি আবার শুরু হয়েছিল। বোশেখে আবার কাজ থেমে গেছে। দলিজঘরের বারান্দা থেকে রেবেকা পুরনো অভ্যাসে কাঠমল্লিকার ফুলগুলির দিকে লক্ষ্য রাখছিল। গ্রীষ্মে সাদা ফুলগুলি ঈষৎ হলুদ হয় এবং হাওয়ায় ছড়িয়ে আসে অমর্ত্যের সৌরভ নিচের রাস্তা নির্জন দেখলে সে বালিকা হয়ে ছুটে যায় এবং ফুলগুলি কুড়িয়ে আনে। কিন্তু কোথায় গেল সেই সৌরভ? এ কি তার মনের ভুল? কিংবা তার সেই ঘ্রাণশক্তিই আর নেই? কিছুক্ষণ সে

চোখ বুজে থাকে, যদি শুনতে পায় খড়মের চাপা শব্দ? কিন্তু কিছু কানে ভেসে আসে না। নির্জন বৃক্ষলতাগুল্মে ঝিঁঝিপোকা ডাকে। পাখিরাও ডাকাডাকি করে। এই গ্রীষ্মে তাদের বাসা গড়ার ব্যস্ততা এবং ঠোঁটে খড়কুটো। সামিরুন খবর এনে দেয়, সাঁইবাবলার ভেতর হলুদ আলোকলতার ঝালরের আড়ালে কী এক পাখির চারটে ডিম দেখেছে। তা হলে তো পুরনো পৃথিবী তেমনই আছে। অথচ নেই পুরনো সৌরভ। খড়ম পায়ে দাদাপীর আর হেঁটে বেড়ান না। তিনিও চলে গেছেন। রেবেকা ভাবে তার প্রিয় অস্তিত্বগুলি একে একে চলে গেল কাঁটালিয়াঘাট ছেড়ে। তার বন্ধুরা চলে গেল। এমন কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিও চলে গেছে! একটার পর একটা বিস্ময়কর প্রস্থান। এবং অবশেষে তার সারও!

তাকে ফেলে সবাই একে একে চলে গেল। শুধু তারই কোথাও যাওয়া হল না। কেন? তারও কি কোথাও যাওয়ার কথা ছিল? সে কোথায়—কোনখানে? না—তার প্রিয় ফুলগাছগুলিও আর সান্ত্বনা নয়। কেন না কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছা ক্রমে তীব্র, এবং উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাড়ি তার শ্বাস রোধ করে দিচ্ছিল। বইয়ের পাতায় মুদ্রিত বর্ণমালা ক্রমে গভীরতা হারিয়ে একমাত্রিক কারুকার্য শুধু। আর কিছু নয়। কোনও গল্প আর গল্প নয়। মন সরে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন বিবর্ণ হতে হতে একদিন সে গাছের পাতার মতো ঝরে পড়বে শুকনো মাটিতে। বুক ধড়াস করে ওঠে অজানা আতঙ্কে।

সার! আপনি বলতেন, জীবনকে 'মিনিংফুল' করতে হলে একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হয়। আপনি কি আমার কথা এখন চিন্তা করেন? আমি যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আপনি কি বুঝতে পেরেছিলেন? আমাকে কি আর আপনার মনে পড়ে? আমি সত্যিই একজন 'বড়মা' হয়ে গেছি সার! মুখস্থ হয়ে যাওয়া কবিতা আবৃত্তির মতো স্মৃতিগুলি আমার মনের ভেতরে অনর্গল উচ্চারণ! আর কিছু নয়, শুধু উচ্চারণ। এগুলি আর 'মিনিংফুল' নয় বলেই কোনও সাড়া জাগে না—না সুখ, না দুঃখের।

কোনও সন্ধ্যায় সহসা লোডশেডিং হলে সামিরুন আর্তনাদ করে ছুটে যায় মাজির জন্য হেরিকেন জেবলে দিতে এবং ফয়েজুদ্দিন ঘাটবাজারে কোথাও আড্ডা দিয়ে গেছেন, রেবেকা বিছানায় হেলান দিয়ে বসে চেয়ারের দিকে তাকায়। কেন না ওই চেয়ারে এ সব সময়ে তার সারের প্রতিভাস এবং তার সার বলেন, তুমিও কি আমার জীবনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দাওনি রুবি?

না সার, না। আমি জানতাম না আমার একটা স্বর্ণচাঁপার চারা চাওয়া এত বেশি বিপজ্জনক, যা আপনাকে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলে দূরের এক অজানা শহরে 'এইটি লাখ প্লাস ওয়ান' করে দেবে। বিশ্বাস করুন, আমি অত কিছু ভাবিনি।

কিন্তু আমার অবাক লাগে রুবি, কেন তুমি—অন্য কোনও ফুলের নয়, স্বর্ণচাঁপার চারা চেয়েছিলে ?

এ প্রশ্ন তো আমারও সার, কেন আমি স্বর্ণচাঁপা চেয়েছিলাম ? আমি মাথাকোটার মতো গুঁজি। কিছু মনে পড়ে না। কিছু বুঝতে পারি না।

সামিরুন ফিরে এসে দ্রুত চিনা বাতি জেবলে দিতে দিতে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় তার দিকে এবং 'ছোটবুবু' থেকে একটি 'বু' বাদ দেওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়, কেন না সে ভেবেছিল রেবেকা অন্ধকারে একলা চুপিচুপি কাঁদে। কিন্তু রেবেকার পাষাণপাথর মুখে শীতল চাউনি দেখামাত্র সে 'কারেনওয়ালা'-দের গাল দিতে থাকে। আজ টিভি-তে একটা হিন্দি ফিল্ম ছিল।

ফয়েজুদ্দিন ঘাটবাজারে যাওয়ার সময় রোজই ভাগনিকে ডেকে যান। রোকেয়াও বলেন, যা না মা ! একটু খোলামেলায় ঘুরে গায়ে হাওয়া লাগানো ভালো। একলা তো নয়, মামুজির সঙ্গে যাবি। দুসমনরা দেখুক। কিন্তু রেবেকা যাবেই না। বেশি কিছু বললে সে সামিরুনের সার হয়ে উঠবে। সামিরুন ! বই নিয়ে আয়। সে ওকে যুক্তাক্ষরে পেঁছে দেওয়ার জন্য মরিয়া এবং কালোর ভাইঝির অমনি মুখ চুন। ছোটবুবুর সব ভালো, খালি এই জবালাতনটুকু ছাড়া। ততক্ষণ লুডো খেললে কত মজা হয়।...

জষ্ঠিসংক্রান্তিতে কাঁটালিয়াঘাটে গঙ্গাপুজোর খুব ধুম হয়। ঘাটবাজারে মেলা বসে। আর সেইদিন কিন্তু বৃষ্টি হবেই। সকালে বা দুপুরে না হোক, বিকেলে বা সন্ধ্যায় ঝোড়োহাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি, যা কালবোশেখির শেষ রোয়াব দেখানো। কালোর এই উপমা, 'শেষ রোয়াব।' তা আর রোয়াব দেখিয়ে করবিটা কী ? সে হেসেহেসে বলে। আই আর এইট, তাইচুং ধান কি আর মাঠে আছে ? মন্দ করতে এসে ভালো করে যাবি। আমনের বিছন ছড়ানো 'বিচাড়' জমিগুলো নরম হবে। সে গঙ্গাপুজোর মেলায় সেজেগুজে যায়। ভাইঝিকে ডাকার অপেক্ষা শুধু। আর তার ভাইঝি 'ছোটবু' বলে রেবেকার কাছে অন্তত দুটো টাকা উপহার পাবেই—গোপনে।

সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টি সত্যিই এসে গেল। সামিরুন ভিজে জবুথবু হয়ে মেলা দেখে ফিরেছিল। শরীর মুছে ফ্রক বদলে সে রেবেকার ঘরে ঢুকে বলছিল, কালোচাচা তক্কেতক্কে ছিল, জানো ছোটবুবু ? আমি পাঁপর ভাজা ঝুরিভাজা কিনিনি ! এই দেখ, দুটো দুল কিনেছি। সোনার মনে হয়, না ছোটবুবু ?

রেবেকা বলে, কৈ, পর দেখি।

সে আয়নার সামনে গিয়ে দুলদুটি পরে। তারপর বলে, মাজি দেখলে মুখ করবেন। এবারে খুলি।

না। তুই পরে থাকবি।

ভালো দুল না ছোটবুবু ?

তোর রূপ খুলে গেছে জানিস সামিরুন? রেবেকা শান্তভাবে হাসে। কিন্তু সাবধান। লুঠ হয়ে যাবি।

যাঃ! খালি—তুমি মামুজির সঙ্গে গেলেই পারতে। কত ভালো লাগত ছোটবুবু! কতরকম মজা।

আজ সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ ছিল। থাকতে বাধ্য, কেন না আজ গঙ্গাপুজো। ফয়েজুদ্দিন ফিরলেন রাত নটা নাগাদ। রোকেয়া বেগম বারান্দায় চেয়ারে বসে ছিলেন। কালো আসবে না। তাই সে বউকে পাঠিয়েছে তার রাতের ভাত তরকারি আনতে। কালোর বউ উসখুস করছিল, কখন বিবিজি ভাত বেড়ে দেবেন। কিন্তু বিবিজি গ্রামের এপাড়া ওপাড়ার খবরাখবর নিতে ব্যগ্র এবং ওকে জেরায় জেরবার করছিলেন। ফয়েজুদ্দিন এলে জেরা থামল। বৃষ্টি কখন থেমে গেছে। ফয়েজুদ্দিন বোনকে কোনও কথা না বলে সোজা ভাগ্নির ঘরের দিকে চলে গেলেন। তাঁর হাতে একটি চটের থলে ছিল।

রেবেকা তাঁকে দেখে বিছানা থেকে পা নামিয়ে বসে। ফয়েজুদ্দিন চেয়ারে বসে থলেটি দুপায়ের ফাঁকে রেখে বলেন, টিভি-র সাউন্ড কমিয়ে দে।

ওটা কী?

এক রাজপুত্তুর।

টিভি-র শব্দ কমিয়ে রেবেকা ভুরু কুঁচকে বলে, রাজপুত্তুর মানে?

তুই সেই গল্পটা ভুলে গেছিস? ক্লাশ সেভেনে উঠলি যেবার, তোর জন্য একটা রূপকথার বই এনেছিলাম। 'দেশবিদেশের রূপকথা'। বইটা আছে, না কাউকে দিয়েছিলি?

রেবেকা স্মরণের চেষ্টা করে। আর এইসময় রোকেয়া সামিরুনকে ডেকে নিয়ে রান্নাঘরে যান। রেবেকার মনে পড়ে না। একটু পরে সে বলে, খুঁজে দেখতে হবে।

তোর একটা গল্প খুব ভালো লেগেছিল। সেই মায়াবিনী রাক্ষুসির গল্প—যে সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে দেশ-দেশান্তর থেকে মায়াবলে রাজপুত্তুরদের ডেকে আনত। আর মন্তর পড়ে তাদের চাঁপাফুলের গাছ করে দিত। বাগান সাজাত। মনে পড়ছে এবার?

রেবেকা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে শুনছিল। মুখ নামিয়ে আস্তে বলে, মনে পড়ছে।

তুই বলেছিলি, 'মামুজি! আমি যদি হতাম সেই মায়াবিনী রাক্ষুসি!' ফয়েজুদ্দিন গোঁফে তা দিতে দিতে ভাগ্নিকে দেখছিলেন। দ্রুত বলেন, লে হালুয়া! তোর চোখ ভিজে যাচ্ছে কেন? একটা সুখবর নিয়ে এলাম তোর জন্য। শুনবি, না কী?

আত্মসম্বরণ করে রেবেকা বলে, আমার কোনও সুখবর নেই।

ফয়েজুদ্দিন আস্তে বলেন, ফজল মীর সানুকে ভোগাচ্ছে। শেষ হেস্তনেস্ত

করতে এসেছে। টাউনশিপে ওর বন্ধুর বাড়িতে দেখা হল। চব্বিশ পরগনার বনগাঁ এরিয়ায় একটা স্কুলে মাস্টারি পেয়ে গেছে। না—বিনি ডোনেশনে। মোরশেদের কারবারি লাইন খারাপ হতেই পারে। কিন্তু সে এই সৎকর্মটা করেছে। ওর এক হিন্দু বন্ধু পলিটিসিয়্যান। বনগাঁ এরিয়ায় একটা স্কুলের সেক্রেটারি। আফটার অল, টিচার হিসেবে সানু তো অসাধারণ। একদফা ক্লাসে পড়ানো দেখেই ভদ্রলোক মুগ্ধ। এখনও দেশে কিছু ভালো মানুষ আছেন, রুবি! হয়তো চিরকালই এটা নিয়ম। নাইনটি নাইন পারসেন্ট্ বজ্জাতের মধ্যে একজন সৎমানুষ থাকেন। তাই দুনিয়া বাসযোগ্য থেকে গেছে। তো সানু আমাকে দেখেই পায়ে কদমবুসির তাল করল। সে আবার 'সার' হতে পেরেছে। তো প্রথম মাইনে পেয়েই কাকে কী প্রেজেন্ট করবে সেই নিয়ে চিন্তা। ফয়েজুদ্দিন তাঁর অট্টহাসি হাসেন। তাজ্জব! ওর বন্ধু আর বন্ধুর বউ বাদ গেল। আমিও বাদ গেলাম। শুধু তোর জন্য এই—

ফয়েজুদ্দিন চটের থলে থেকে চারা বসানো একটা ছোট্ট টব বের করে অসম্পূর্ণ বাক্যটি সম্পূর্ণ করেন। শুধু তোর জন্য এই আজব গিফ্‌ট্।

রেবেকা চমকে উঠেছিল। আস্তে বলে, কী?

আর কী! এক রাজপুত্তুর। ফয়েজুদ্দিন মিটিমিটি হাসেন। তুই সত্যিই এক মায়াবিনী রাক্ষুসি রে!

রোকেয়া এসে দরজার বাইরে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে বলেন, তা সানু নিজে আসতে পারল না?

ফয়েজুদ্দিন আড়চোখে ভাগনিকে দেখছিলেন। রেবেকা চারাটির দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। বোনের দিকে ঘুরে তিনি বলেন, সময় হলেই আসবে। এত তাড়া কিসের? আবার সার হতে পেরেছে সানু। গুছিয়ে বসবে। তারপর আসবে। ও রুবি! ওঠ্। মামা-ভাগনি মিলে এই হারামজাদা রাজপুত্তুরকে উঠোনে খোলামেলায় রেখে আসি।

রেবেকার হাতে স্বর্ণচাঁপার টবটি জোর করে তুলে দিয়ে ফয়েজুদ্দিন তাড়া দেন। মুখে বোবা ধরে গেল রে! তুই নিজের মুখে একদিন তোর সারকে স্বর্ণচাঁপার চারা চেয়েছিলি। গোড়ায় বাঁধা চিরকুটটা দেখতে পাচ্ছিস?

রেবেকা দেখছিল। ছাপা হরফের মতো নিটোল একটি কথা, 'স্নেহের রেবেকাকে।' আর এই কথাটি তাকে চারদিক থেকে কিছুক্ষণ ঘিরে রেখেছিল। অবশেষে সে চাপা শ্বাস ছাড়ে। তা হলে এতদিন পরে তার প্রার্থিত স্বর্ণচাঁপা তার কাছে মাটি চাইতে এসেছে। সে কোন মুখে একে ফিরিয়ে দেবে?…